কবিতার কথা
ও
অন্যান্য বিবেচনা

সৈয়দ আলী আহসান

কবিতার কথা

এক

কবিতা-সম্পর্কে সাধারণভাবে মতবিরোধ যথেষ্ট তীব্র, মতবাদও বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্নপথবাহী, তবুও যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন মতবাদের পরস্পর বিরোধিতাই কবিতার স্থায়ী মূল্যের চরম সাক্ষ্য। অনেকের চিন্তায় কবিতা শিল্প নয়—নিছক অনুপ্রেরণা। অনেকে কাব্য-সৃষ্টিকে প্রার্থনা-মুহূর্তের নিবেদিতচিত্ততার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কীট্‌স্ বলেছেন, "আমি ক্ষণকালও কবিতা ছাড়া বাঁচতে পারি না—অর্ধদিনও নয়, সম্পূর্ণ দিন তো নয়ই।" এসব কথা সুন্দর, কিন্তু স্বপ্নের মতো অস্বচ্ছ। কবিতার প্রকাশ-রূপ শিল্পায়ত্ত শব্দের বিশেষ বিন্যাস মাত্র; যদিও সৃষ্টির আবেদনের পশ্চাতে ব্যক্তিমানসের রহস্যতত্ত্ব বর্তমান। মানুষ সভ্যতার যে-স্তর বা বর্বরতার যে-পর্যায়ে বাস করেছে, যে-দেশ বা যুগেই তা হোক না কেন, সে শব্দে বা রেখায়, বর্ণে বা ধ্বনিতে এমন কিছু সর্বদাই সৃষ্টি করেছে, পার্থিব হিতবাদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করে যার ব্যাখা করা চলে না। একথা সত্য যে, মানুষ সৌধ নির্মাণ করেছে বসবাসের প্রয়োজনে। কিন্তু সঙ্গীত, কাব্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং নৃত্যের সঙ্গে পার্থিব হিতসাধনের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, এগুলোর কোনো কোনোটার উৎসে অভিচার বা ধর্মাচারের স্থিতি আছে, কিন্তু সৃষ্টি-প্রেরণার হেতু-নির্ণয়ের জন্য এ ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অভিচার বা ধর্মাচারের নৈমিত্তিকতার বিলোপের পরও সৃষ্টির আবেগ পূর্ণভাবেই সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ এক কথায়, সৃষ্টি-প্রেরণার নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয়—এ প্রেরণা চিরদিনই রহস্য সংসক্ত, স্বপ্নের মতো অনির্ণীত ও অস্পষ্ট, ব্যক্তি-মনীষার অসাধারণ উল্লাস। ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা চলে শুধু সৃষ্টির প্রকাশরূপকে। কবিতার পক্ষে একথা আরো বেশী সত্য। কবিতার মাধ্যম শব্দ। কবিতার মধ্যে আমরা শব্দের আশ্চর্য সম্ভাবনা ও বিকাশ লক্ষ করি।

ভাস্কর্যের সাধন যেমন প্রস্তর, চিত্রকলার উপায় যেমন বর্ণ, সঙ্গীতের বাহন যেমন ধ্বনি, কবিতার উপাদান তেমনি শব্দ।

প্রস্তরখণ্ড পরীক্ষা করে শিলামূর্তি বিচার করা চলে না, কিন্তু চিত্রকলা-বিচারের ক্ষেত্রে বর্ণজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বরগ্রাম-সংক্রান্ত বোধ অপরিহার্য। দেখতে পাচ্ছি যে, এ তিনটি শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্প-সাধন-বস্তু ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব পেয়েছে। কবিতার ক্ষেত্রে উপাদানের এ-গুরুত্ব আরও গভীর ও ব্যাপক।

সমস্ত শিল্পই বস্তুনির্ভর উপাদানের মাধ্যমে প্রকাশিত বোধের সামগ্রী মাত্র। কবিতার ক্ষেত্রে তার মাধ্যম যে-শব্দ, তা বোধ বা ধারণার প্রতীক। ভাস্কর্যের প্রস্তরখণ্ড বা চিত্রের বর্ণ-উপাদান বা সঙ্গীতের ধ্বনি এ অর্থে বোধের প্রতীক নয়।

কবিতায় আমরা বিশেষ ভাষার পরিচয় পাই না, বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে, সেখানে আমরা সমস্ত প্রাণবস্ত ভাষার আভাস পাই। ক্রোচে এ-কথার সত্যতা প্রকাশ করেছেন এভাবে, "মানুষ প্রতিমুহূর্তে কবির মতো কথা বলে, কেননা, কবির মতোই সে আপন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করতে তৎপর। সাধারণ বাগ্‌ধারায় বা পরিচিত স্বরে সে কথা বলছে কিনা সে বিচারের কোনই প্রয়োজন করে না, কেননা প্রকৃত প্রস্তাবে গদ্য, গদ্য-কাব্য, কাহিনী কাব্য, মহাকাব্য, নাটক, গীতিকাব্য বা সঙ্গীত—এগুলোর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য নেই। সাধারণ মানুষ আপন মানবীয় বোধেই কবির সমধর্মী, কবিও ব্যক্তি-সাধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ সংযোগ আছে বলেই আমরা সংকীর্ণ ও প্রসারিত উভয় ভাবেই মানব-মনের উপর কবিতার সক্রিয় প্রভাবকে ব্যাখ্যা করতে পারি। যদি কবিতা বিশেষ ধরনের ভাষা হত, যাকে বলা যেতে পারে দেব-দুর্লভ বাণী, তাহলে সে ভাষার বক্তব্য মানুষের বোধের আয়ত্তে আসত না।"

সমস্ত শিল্পই ভাব-ব্যঞ্জনা, অতএব তাকে আমরা বিশেষ প্রকারের ভাষা বলে আখ্যাত করতে পারি। ভাব-প্রকাশের অন্যান্য যে-সব উপাদান আছে, তারা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ বাণীর অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা বহন করে। গানের সুরে সুরে যে-সব কথা বলা হয়, সাধারণ কথায় তো তা ধরা পড়ে না। কিন্তু গানের সুরে কি কথা ব্যক্ত হয়, তা যদি বুঝতে চাই,

তবেই আবার মানব-ভাষার শব্দ ও বাক্যকে অবলম্বন করতে হবে। সুতরাং আমাদের বক্তব্য প্রকাশের একমাত্র যথাযথ উপায় ভাষা। কবিতাও এ-অর্থে শব্দ বা ভাষাগত বোধের শিল্প।

দর্শনের নির্দেশে আমরা ভাষার দ্বৈত-কৃত্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। ভাষা আমাদের মনকে আবেগে উদ্বুদ্ধ করে আবার বস্তুনির্দেশ করে। বিজ্ঞানে বস্তু-নির্দেশের প্রয়োজন প্রাথমিক এবং প্রধান, সুতরাং বিজ্ঞানের ভাষা আবেগরহিত, যুক্তি-নির্ভর এবং স্পষ্ট। কবিতার ভাষা সংবেদনশীল, অর্থের দিক থেকে সম্প্রসারণশীল—হৃদয়ের আবেগকে উদ্বুদ্ধ করে। আবেগ বা মনোভাবকে জাগ্রত করবার যে-ক্ষমতা ভাষার আয়ত্ত, সে ক্ষমতাতেই ভাষা কাব্য-ভাষা হয়, যাকে ল্যাটিনে বলা হয় Vox Poetica। এ-ভাষা শুধু আবেগকেই প্রকাশ করে না, অপরোক্ষ বোধকেও স্পষ্ট করে। শব্দের কিছু অর্থ ধারণালব্ধ, আবার কিছু অর্থ অন্তর্জ্ঞানোপলব্ধ। ভাষার ভিত্তিগত উপাদান যেমন বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ—এরা বস্তু-নির্দেশও করে, হৃদয়বৃত্তি প্রকাশেরও সহায়তা করে। কবিতার ভাষা, ভাষার এই দ্বিতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির প্রসার ও বিকাশের ক্ষেত্রেই সক্রিয়। আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করছি—"শত ফোয়ারায় উছসিল যেন পরিহাস রাশি রাশি", "সারাদিন অশান্ত বাতাস ফেলিতেছে মর্মর নিশ্বাস", "শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে তপ্ত সমীরণ", "লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি প্রশান্ত সূর্যাস্তপানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি", "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ চুনি উঠল রাঙা হ'য়ে।" এ-সমস্ত বাক্যে বিশেষ বিশেষ কথাই স্পষ্ট হয়েছে। চিত্তবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরা হৃদয়ের আবেগকে উচ্ছ্বসিত করেছে, প্রাণবন্ত বাস্তবকে প্রতিভাসিত করেছে। বস্তুর "জীবন" প্রকাশের ভঙ্গীতে ধরা পড়েছে। অনুভূতি ও আবেগের এই যে সত্যদীপ্তি, একেই আমরা কাব্য-প্রকাশ বলবো। কবিতার ভাষায় বস্তুর বাঙ্‌ময় মূর্তি গঠিত হয়, এই মূর্তি বোধের উপায় মাত্র। বলা যেতে পারে যে, কবিতার ক্ষেত্রে এই বোধ বা অনুভূতি কল্পনার সঙ্গে বিজড়িত। কবিতায় আমরা প্রয়োজনবোধে রূপক বা উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করে থাকি। এই প্রয়োজন হচ্ছে বস্তুকে ভাষায় জীবন্ত ও বাস্তব করে তোলা।

বস্তুকে জীবন্ত করতে হলেই কবিতায় ব্যবহৃত শব্দে, বাক্যাংশে বা চরণে

নাটকীয় আবেগ বা গতি আনবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কবিতায় ভাষার সকল প্রকার প্রয়োগের মধ্যেই নাটকীয় বোধের পরিচয় স্পষ্ট হয়। আমরা যে-কথাই বলি না কেন—প্রকৃতির কথা, প্রাত্যহিক জীবনের কথা, অনুভবের বস্তু বা আদর্শের বস্তুর কথা, কাব্যভাবেই তা বলতে চাই। এভাবে বলতে গেলেই কাব্য-ভাষা নাটকীয় আবেগ ও গতি পায়। "হাহা করে প্রতিধ্বনি নদীর তীরে তীরে", "তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পল্লীর কাছে রে", "আঁধারের তারা যত অবাক হ'য়ে রয় চেয়ে", "কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবস শর্বরী", "বনের বুকের আন্দোলনে কাঁপিতেছে পল্লব অঞ্চল"—সবকটি কথাই গতির আবেগে চঞ্চল ও শিহরণশীল। নিছক বস্তু-প্রকৃতির ক্ষেত্রেই নয়, মানস-লোকের পরিচয় প্রকাশের ক্ষেত্রেও গতি-দীপ্ত ভাষার প্রয়োজন। যেমন: "পর্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ", "নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি, শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া", "সময় বহিয়া যায় নিস্তরঙ্গ স্রোত সম", "আশ্চর্য দিনগুলি অজানার পথ এলো ভুলি"। সব কটি উদাহরণই অন্তর্লোকের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভাষার এই কর্মচঞ্চল স্বরূপ মানব-প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ।

সহজ স্তব্ধ শব্দ দ্বারা অর্থাৎ যে-শব্দে শিহরণ নেই বা কম্পমান অবস্থা নেই, মানব-জীবনে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ বহন করা চলে না। শুধুমাত্র মানব-জীবনই নয়, অজৈব বস্তুর রূপ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও গতি-দীপ্ত ভাষার প্রয়োজন অশেষ। কবির কর্তব্য হচ্ছে নৈমিত্তিক ক্ষেত্র থেকে, সাধারণ বাস্তবতা থেকে জীবনকে উদ্ধার করে এনে শব্দের জগতে তাকে প্রাণবন্ত ও চঞ্চল করা। অবশ্য প্রশ্ন জাগতে পারে যে, শব্দের জগতে প্রাণবন্ত করার অর্থ কি বস্তুজগৎ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা? অথবা জীবনকে শব্দক্ষেত্রে জীবন্ত ও বাস্তব করে বস্তুজগৎকে আরো বেশী সত্যমূল্য দেওয়া? এ কথার উত্তর হচ্ছে, জীবনের জন্য নতুন যে-শব্দের পরিমণ্ডল গড়ে উঠছে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে একমাত্র এ-পরিমণ্ডলেই বাস্তব জীবন আমাদের বোধায়ত্ত।

শব্দের বোধ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন প্রকারের। আমাদের অর্থজ্ঞাপক কথোপকথনের ভাষার সর্বাপেক্ষা সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপাদান যে-শব্দগুলি নিয়ে, সেগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন ভাবের জাগৃতির সহায়তা করতে পারে। যে যতটা নিবিড়ভাবে কোনো বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তার

মনে সেবস্তুর আবেদন ততটাই গভীর। এআবেদন বস্তু-সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। 'কোলাহল' শব্দটি সাধারণ মানুষের কাছে স্তব্ধতার বিরুদ্ধঅর্থ-জ্ঞাপক। এই কোলাহল শব্দের সঙ্গে জনতার সম্পর্ক আছে। তাই কোলাহল শব্দ বললেই অনেক মানুষের জটলার কথা আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু শিল্পীর হাতে এ সাধারণ শব্দের আবেদনও-যে কত গভীর ও ব্যাপক হতে পারে, তার পরিচয় দিয়েছেন সঞ্জীবচন্দ্র নৃত্যরতা নিরাবরণ নারী-দেহের কোলাহলের কথা বলে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, শব্দের একটি সাধারণ অর্থ সর্বদাই অভিধানগত, কিন্তু অন্য একটি অর্থ ব্যাপকতর ইঙ্গিতময়। আমরা সাধারণ একটি শব্দের সহায়তায়ই বস্তুর বিশেষ পরিচয়কে অতিক্রম করে তার অনুভূতি বা আবেগ বা বোধের পরিসরে উপনীত হই।

কবিতার জন্য যখন নতুন কোনো শব্দ সৃষ্ট হচ্ছে না, তখন প্রচলিত শব্দেই কবি নতুন ব্যঞ্জনা আনবেন একথা আমরা বলতে পারি। গদ্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত শব্দের অর্থ হচ্ছে সাধারণের বোধগম্য, নৈমিত্তিক প্রয়োজনের শব্দপুঞ্জ। অনাধুনিক শব্দের প্রয়োগে গদ্য রচনা অস্বচ্ছ হতে বাধ্য। ভাষা-সৃষ্টির ইতিহাসে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের সাধনার দান অসাধারণ; কিন্তু বর্তমানের গদ্য সে-দিনকার গদ্যের গঠনপ্রকৃতিকে আদর্শ হিসেবে অবলম্বন করতে পারে না।

কবিতার ক্ষেত্রে প্রচলিত শব্দের অর্থ এতটা সঙ্কীর্ণ ও স্পষ্ট নয়। শব্দ এখানে কবির মানস-বিকাশ ও সমৃদ্ধির প্রতিনিধি। কবিতার শব্দ, বাক্যাংশে বা চরণে বিন্যস্ত হয়ে নতুন নতুন অর্থের আবেদন আনে। ইংরাজ কবি ব্লেইকের কথা কাব্য-শিল্পের তাৎপর্য-সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য—

"বালুকা-কণায় একটি পৃথিবী দেখা
এবং একটি স্বর্গ বন্য-ফুলে;
সীমাহীন কিছু হাতের মুঠোয় ভরা
নিরবধিকাল এক প্রহরের মূলে।"

"To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower,

Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour."

অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতায় আছে—

"ক্ষুদ্র বনফুল বাসে
সারাটা বসন্ত ভাসে;
ক্ষুদ্র ঊর্মি-মূলে বুলে প্রলয় প্লাবন;
ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে
চির ঊষা জেগে আছে;
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন।"

গদ্য-রচনায় যে-সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয় তা এতটা নির্ধারিত যে, অর্থের অস্পষ্টতার সম্ভাবনা সেখানে কম, একটি শব্দ একটি সময়ে একটি অর্থই বহন করে। সে-কারণে গদ্য সর্বমুহূর্তেই সংবাদ পরিবেশনের ভাষা। একটি সময়ের সঙ্গে জড়িত থেকে গদ্যকে অগ্রসর হতে হয়, তাই গদ্য চিরকাল শব্দধারণের ক্ষমতায় সমসাময়িক। প্রাচীন গদ্য আমরা ব্যবহার করিনা, আধুনিক গদ্যই সর্বমুহূর্তে আমাদের অবলম্বন। বিষয় অস্বীকৃত না হলেও পুরোনো ভাষার অব্যবহারের কারণে, প্রাচীন গদ্য সচল পাঠক্রমের মধ্যে কখনও আসে না। গদ্যকে সমসাময়িক হতে হয় এবং এ সাময়িকতার মধ্যেই তাকে বিশিষ্ট হতে হয়। কোনো লেখকের রচনাশৈলীতে এ-বিশিষ্টতা তখনই অবধারিত হয় যখন তিনি ঘটনা বা কর্মের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একটি রসাশ্রিত চিত্র উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ বেদনা ও তীব্র দাহনের পরিচয় যে-রচনায় থাকে, তা সহজে প্রাচীন হয় না, কেননা সেখানে সর্বসময়ের একটি চৈতন্যের প্রশ্রয় থাকে। এ চৈতন্যই হচ্ছে শিল্পীর অহমিকা, যাকে আমরা স্টাইল আখ্যা দিতে পারি।

সাধারণ শব্দের একক এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থার অর্থ কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কবিতায় আমরা শব্দের রহস্য পাই, নিদ্রাভঙ্গে ঊষার প্রথম আলোর সঙ্গে সচকিত পরিচয়ের মতো নতুন জীবনের সঙ্গে পরিচিত হই। শব্দগুলো সাধারণভাবে বস্তুর নাম বা স্বরূপ ব্যাখ্যাই করে না, তার মধ্যে

একটি আশ্চর্য আবেগও আনে। কতকগুলো উদাহরণ দিয়েই কথাটি বুঝবার চেষ্টা করবো—

১. দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যায়।
মেঘের বরণ কন্যার গায়েতে লুটায়॥
এমন সুন্দর কন্যা না দেখি কখন।
কার ঘরের উজল বাতি চুরি করল মন॥

। মৈমনসিংহ গীতিকা।

২. সহজে রূপের ভারে, আপনি চলিতে নারে,
নবীন যৌবন তাহে ভার॥
রূপের মুরারি বালি, ক্ষেণে মধ্যে পড়ে ঢলি,
কেমনে বহিবে অলঙ্কার॥
চন্দ্রের জিনিয়া রূপ, সূর্যের যেমন ধূপ
আভরণে কিবা প্রয়োজন॥
এয়োরাও অন্যে যত, দেশের চলন মত;
আনিল কিঞ্চিৎ আভরণ॥

। সৈয়দ হামজা।

৩. বসন্তের উষা আসি রঞ্জি দিল যুগল কপোলে;
তাইত ফুলের বাস ফুল-হাসি আননে প্রিয়ার!
নিদাঘের রৌদ্র আসি বিলসিল ললাট নিটোলে;
তাইগো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা ছটার।
ঘন-ঘোর বর্ষারাত্রি বিহরিল অলক নিচোলে;
তাইগো প্রিয়ার পিঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার!
নাচিল শরৎ-শশী রূপ-হ্রদে হিল্লোলে হিল্লোলে;
তাইগো প্রিয়ার দেহ ফুলে ফুলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার।

। দেবেন্দ্রনাথ সেন।

৪. আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ-দীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম;
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন এ কালো নয়ন মম।

এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই, ফুটেছে মর্মতলে,
নির্বাণহীন অঙ্গারসম নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হ'তে তারে উপাড়িয়া লও জ্বালাময় দুটো চোখ,
তোমার লাগিয়া তিয়াস যাহার সে আঁখি তোমার হোক্॥

। রবীন্দ্রনাথ।

৫. আগে ওকে বারবার দেখেছি
লাল রঙের শাড়িতে
দালিম ফুলের মত রাঙা;
আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়,
আঁচল তুলেছে মাথায়
দোলন-চাঁপার মতো চিকনগৌর মুখখানি ঘিরে।
মনে হ'ল, কালো রঙে একটা গভীর দূরত্ব
ঘনিয়ে নিয়েছে,
নিজের চারদিকে,
যে দূরত্ব শর্ষেক্ষেতের শেষ সীমানায়
শালবনের নীলাঞ্জনে।

। রবীন্দ্রনাথ।

৬. এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,
আপাততঃ এটা দেরাজে দিলেম রেখে।
পার যদি এসো শব্দবিহীন পায়:
চোখ টিপে ধোর হঠাৎ পিছন থেকে।
আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি,
এনো সচকিত কাঁকনের রিনিরিন্,
আনিয়ো মধুর স্বপ্নসঘন রাতি,
আনিয়ো গভীর আলস্যঘন দিন।
তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা—
স্থির আনন্দে, মৌন মাধুরী ধারা,

মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা,
তব করতল মোর করতলে হারা ॥

। রবীন্দ্রনাথ ।

৭. আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা,
ব্যথার পরশে হয়েছে তোমার সকল অঙ্গ সোনা।
মাটির দেবীরে পরায় ভূষণ
সোনার সোনায় কিবা প্রয়োজন ?
দেহ-কূল ছাড়ি নেমেছে মনের অকূল নিরঞ্জনা।
বেদনা আজিকে রূপেরে তোমার করিতেছে বন্দনা।

। নজরুল ইস্‌লাম ।

৮. বুকে ক'রে ছিনু তারে—সারা নিশি নিদ্রাহীন,
স্পর্শসুখে মুগ্ধ অচেতন,
আমারি স্বপনে তার নিমীলিত আঁখিপুট
বারবার দিয়েছিনু ভরি',
জ্যোৎস্না-পাণ্ডু যামিনীর গণ্ডে যথা উল্কা-চিহ্ন—
মুখে তার আঁকিনু চুম্বন
আপনার অগ্নিবেগে—সে সোহাগে সখী মোর
সচকিয়া উঠেনি শিহরি ?

। মোহিতলাল মজুমদার ।

৯. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ;
অতি দূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে
দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ;
বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'

পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে
নাটোরের বনলতা সেন।
। জীবনানন্দ দাশ।

১০. কাকে চাই তা জানি যখন দেখি তোমার মুখ,
যখন তোমার গলার আওয়াজ শুনি—তোমাকে চাই—
ভরে যখন তোমায় ছুঁয়ে সমস্ত বুক,
কানায় কানায় হাওয়া লাগে বাসন্তী ফাল্গুনী—
। অমিয় চক্রবর্তী।

উদাহরণ এ-পর্যন্তই। ইচ্ছে করেই প্রেমের কবিতার উদাহরণ দিলাম; কেননা, প্রেমের কথা বলতে যেয়ে কবিরা যে-ভাষা ব্যবহার করেন সে ভাষা জাগর-স্বপ্নের ভাষা, আপন অস্তিত্বকে নিঃশেষ করবার ভাষা, তাই সেখানকার শব্দের ধ্বনিতে মগ্ন-চৈতন্যের চাঞ্চল্য পাই, ঘাসের পাতায় শিশিরপাতের মতো প্রথম পুলকের কম্পন পাই। অর্থাৎ এক কথায়, শব্দ তার নিজের অর্থ আর বহন করে না, বিশেষ বিন্যাসে সে নতুন কথার কোলাহল তোলে। প্রাকৃত পৈঙ্গলের ভাষায় এ-যেন "কেঅলি ধূলি সব্ব দিস পসরিঅ পীঅর সব্বউ ভাসে"—কেয়াফুলের চূর্ণ পরাগ সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ে সব কিছু ছুপিয়ে দেওয়ার মতো। শুধু যে শব্দই নতুন অর্থ বহন করে, তাই নয়, উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষায় নতুন বোধের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। উপরের উদাহরণগুলিতে দেখতে পাচ্ছি যে, শব্দের দ্বারা বস্তুর অনুকৃতি ঘটে নি কিন্তু তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। শব্দ যেখানে নিছক অনুকৃতি, সেখানে শব্দের অথবা বলতে পারি, কথার দৃষ্টিগোচর চিহ্ন এবং বর্ণিত বস্তুর মধ্যে যথার্থ কোনো পার্থক্য নেই। শব্দই বস্তুর একমাত্র নির্দেশক। কবিতায় এ-অবস্থাকে অতিক্রম করবার চেষ্টা থাকে। কবিতার ক্ষেত্রে শব্দ-চিহ্নের পরিবর্তনের প্রয়োজন অর্থাৎ শব্দ রূপান্তরিত হবে, দৃষ্টিগোচর আকার বা শ্রুতিগোচর ধ্বনির দিক থেকে নয়, কিন্তু বক্তব্য-প্রকাশের দিকে থেকে। এ-কারণেই কবিতায় উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োজন করে। একেই ইংরাজিতে বলা হয় **transfer of signs.** আমাদের প্রথম উদ্ধৃতিতে গ্রাম্যকবির ভাষায় একপ্রকার স্নিগ্ধতা, সহজতা ও স্বচ্ছতার আভাস পাচ্ছি। কন্যার দেহে

মেঘের বরণ যেন লুটিয়ে পড়েছে—এ-উপমায় মেঘের পরিচয় নেই, কিন্তু প্রকৃতির নিশ্চিন্ত পরিবেশে শ্যামল মেয়ের সজীবতাকে চাক্ষুষ করছি। মনোহরণের জটিল সংবাদ নেই, কিন্তু সত্যিকার মনোহরণের পরিচয় আছে। সুন্দরী কন্যাকে ঘরের উজল বাতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই 'কন্যা' শব্দটি গ্রামের কবিতার এক আশ্চর্য সম্পদ। কন্যা অর্থ এখানে আত্মজা কখনই নয়, কিন্তু প্রয়োগে ক্রমান্বয়ে এর ঐতিহ্যগত অর্থ হয়েছে কোমলা, সচকিতা, সজীবা কিন্তু নাগরিক বিলোল-কটাক্ষ-বিহীনা কুমারী। এ নারী সবারই আকাঙ্ক্ষিতা। দ্বিতীয় উদাহরণে মধুমালতীর রূপের কথা বলতে যেয়ে সৈয়দ হাম্‌জা 'ভার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন—রূপের ভারে কন্যা নুয়ে পড়েছে। নতুন বিন্যাসে শব্দটি আশ্চর্য প্রভা পেয়েছে—এখানে ভার অর্থ ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য ও পরিপূর্ণতা। নবীন যৌবন কালে দেহ যখন কানায় কানায় ভরে উঠে, তখন লাবণ্যবতীকে মনে হয় মনোহারিতার প্রাচুর্যে ব্রীড়ানতা। এ প্রাচুর্যকে প্রকাশ করবার জন্য 'ভার' শব্দটিরই যেন একান্ত প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় উদ্ধৃতি সংস্কৃত কাব্যবোধ ও ঐতিহ্যের উদাহরণ বহন করছে। বদ্ধধ্বনি ও পরস্পর কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনির একনিষ্ঠ সংলগ্নতায় মার্জিত শিল্পবোধের পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতকাব্যে যেখানে উপমা অলঙ্কারের অতিরিক্ত পরিচর্যায় আভরণের ঐশ্বর্য পাই, এখানে সে-সঙ্গে মনঃসংযোগের আভাস আছে। ভোজরাজার সুসজ্জিত পুত্তলিকার ছবি নয়, কিন্তু প্রেমাস্পদের দৃষ্টিতে দয়িতার দেহের সৌকুমার্য চিত্রিত হয়েছে। চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস এখানে প্রবল, তাই সচেতনতার স্পষ্ট পরিচয় আছে। এ সচেতনতা আবার কবিকে রক্ষাও করেছে। বর্ণনার প্রয়োজনে শব্দ যেখানেই অনুপ্রাস ও ধ্বনিমাহাত্ম্যে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে, সেখানেই সহজ কথায় তাতে স্নিগ্ধতাপ এনেছে। প্রথম চরণের 'বসন্ত', 'ঊষা,' 'যুগল,' 'কপোল' এ শব্দগুলি পরের চরণেও 'ফুল,' 'বাস', 'ফুল-হাসি' শব্দগুলির সমপর্যায়ের নয়। পরিপূর্ণ হৃদয়-সংযোগে শব্দ যে-অসাধারণ অর্থে শিহরিত হয়ে ওঠে তার পরিচয় মিলবে মধুসূদনের নিম্নোদ্ধৃত চরণে—

"যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যেদিন হেরিল

আঁখি তব চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে !—
যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে !
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে ;
বিনাইনু যত্নে বেণী ; তুলি ফুলরাজি
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে !
চির পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু
তাহায়। চাহিনু, কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে !
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে !
হায় রে অবোধ আমি ! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু ! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী !—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি !”

এ সেই চরমমুহূর্তের কথা—কামনা-উন্মুখ দেহ যখন অগ্নিশিখার মতো লেলিহান হয়ে উঠছে। ন্যায়-অন্যায়কে বিসর্জন দিয়ে, লালসা-নিপীড়িত কামিনী সর্বনাশকে নিশ্চিন্তে যাচ্ঞা করেছে। এও একপ্রকার আত্মাহুতি। নিশ্চিন্ত পুষ্পোদ্‌গমের মতো দেহ-কুমুদিনীও তার দল বিছিয়ে দেয়, তার প্রকাশকে রোধ করা যায় না। এ কথাকেই আধুনিক কবি প্রকাশ করেছেন এই বলে—

‘কানায় কানায় হাওয়ায় লাগে বাসন্তী ফাল্গুনী।’

মধুসূদনের শব্দ-ব্যবহার লক্ষ করবার মতো। কয়েকটি বিশেষ্য পদের পরস্পর সংলগ্নতায় যে-আশ্চর্য ধ্বনি কলরব করে উঠেছে—সেখানেই আমরা অলঙ্কারের ঝঙ্কার শুনেছি, পরিচিত্রিত দেহের শোভা দেখেছি। শেষ দিক্‌কার

মধুর শব্দটি অপূর্বরসাশ্রিত। একই সঙ্গে বসন্তের আবেশ ও উন্মুখ হৃদয়ের হর্ষোচ্ছলতা শব্দটিতে ধরা পড়েছে।

সুরদাসের প্রার্থনায় রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষা ব্যবহার করেছেন তা সুসংস্কৃত ও পরিমার্জিত এবং প্রকাশমান আবেগের মধ্যে শালীনতার পরিচয় আছে। প্রভাত-রশ্মির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তীক্ষ্ণ ছুরিকাকে আর বলা হয়েছে আঁখির তৃষ্ণার কথা। শব্দের এ প্রয়োগ সুন্দর কিন্তু অসাধারণ নয়। সমস্ত কিছুই অশরীরী মায়ার মতো সন্ধ্যাবেলার লাল আলোয় সূর্যের সর্ববর্ণের পরিচর্যা যেমন নেই, এখানে তেমনি প্রেমাকুল মানব-চিত্তের সর্ব-আবেদনের প্রশ্রয় নেই। মোহিতলাল মজুমদারের উদাহরণটিও শব্দের সুসংস্কৃত প্রয়োগের পরিচয় বহন করে, কিন্তু আশ্চর্য প্রয়োগের নয়। কবির সজাগ মন দেহবিলাসের উপলব্ধিজনিত হর্ষ ও বেদনাকে মূর্ত করতে তৎপর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অন্য দুটি উদাহরণে শব্দের অসাধারণ প্রসার ও সম্ভাবনা ধরা পড়েছে। একক্ষেত্রে কবি প্রিয়তমাকে জেগে উঠতে বলছেন স্বপ্নে আর "আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি, এনো সচকিত কাঁকনের রিনিরিনি।" প্রেম-সচকিত হৃদয়ের এ আশ্চর্য উপলব্ধির তুলনা নেই। এ উক্তির প্রতিটি শব্দের সাধারণ অর্থ আমরা জানি, কিন্তু বিশেষ বিন্যাসে সব কটি শব্দই, একমাত্র ক্রিয়াপদ ব্যতিরেকে, নতুন রহস্যের আবেগ এনেছে। নজরুল ইস্‌লামের উদাহরণের একটি চরণ 'ব্যথার পরশে হয়েছে তোমার সকল অঙ্গ সোনা' অতুলনীয় তাৎপর্যের। 'সূর্যের সোনা,' 'সোনার আগুন,' 'সোনা রং দিন' এ-ধরনের প্রয়োগে কারুকার্য আছে, কিন্তু বেদনার স্পর্শে আভরণহীনার অঙ্গ সোনা হয়ে যাওয়ার কথা নিকষে সোনার রেখার মতো আশ্চর্য দ্যুতিমান। প্রতি-দিবসের কথার শব্দকেও যে অশেষ অর্থে ভরে তোলা যায়, তার প্রমাণ এখানে পাই। আধুনিক কবির বনলতা সেন অতীতের বর্তমানতায় জেগে উঠেছে; তার জেগে ওঠায় বিদিশার অন্ধকারকে পেয়েছি, শ্রাবস্তীর সমৃদ্ধিকে দেখেছি। যে অতীত স্থাবর হয়ে আছে তাকে নয়, কিন্তু সময়ের প্রসারিত ধারায় চিরজাগ্রত মহাকালকে। এ ঐতিহ্য শব্দবোধের কল্যাণ-শ্রীর সঙ্গে জড়িত।

দুই

কবিতার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন—নীহারিকার মতো পরস্পর সংলগ্ন অনেকগুলো অনুভূতি। কবির উপলব্ধি এমন প্রগাঢ় হবে যে, তিনি তার প্রতিরূপ আবিষ্কার করবেন শব্দে। আবিষ্কার করবেন না বলে বলা যায় যে, স্বতঃসিদ্ধান্তে তিনি একটি বক্তব্যে উপনীত হবেন। আমি অনেক সময় সকালবেলায় জানলা খুলে আকাশের দিকে তাকাই, তখন হয়তো কুয়াশার অস্পষ্টতায় পাখি দেখি, মেঘ দেখি, এলোমেলো ছেঁড়া কাগজের টুকরো উড়ে যেতে দেখি, হয়তো গানের শব্দ কানে আসে, অনেক পুরোনো ঘটনা সহসা মনে সাড়া জাগায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার বুদ্ধি ও অধীত বিদ্যার তাৎপর্য অকস্মাৎ আবিষ্কার করি। তখন এ সমস্ত সত্যকে শব্দে অথবা উপমায় একটি কবিতার বাণীরূপের মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করি। একটি উপলব্ধির পরিপূর্ণতায় এভাবেই কবির প্রথম পদক্ষেপ ঘটে। এ পরিপূর্ণতার পথে অন্তরঙ্গ ধ্যান এবং চিন্তায় শব্দগুলো আবেগ ও বিশ্বাসের উষ্ণতায় হৃদয়কে উন্মোচিত করে। সমস্ত ঘটনা এবং চিন্তা তখন শব্দ হিসেবে বিকশিত হয়।

শব্দ হচ্ছে দাবাখেলার খুঁটি। একটি বিশেষ মুহূর্তে জাতির স্মৃতিতে যতগুলো শব্দ আছে তা নিয়েই তার বহু বিচিত্র কথার খেলা। নতুন শব্দ যোগ করা চলে না, পুরাতন শব্দকে অস্বীকার করা যায় না। আয়ত্ত শব্দের সামগ্রীকে অনবরত নব নব বিন্যাসে নতুন নতুন উপলব্ধির স্মারক করে তুলি।

কোনও একটা বস্তুর নাম যখন আমাদের মনে জাগে তখন সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বিশেষণ নিয়ে নামটি উদ্ভাসিত হয়। এভাবে শব্দের ব্যাপ্তি এবং পরিমাপ সংবেদনশীল মনের কাছে সর্বমুহূর্তেই ধরা পড়েছে। এ ব্যাপ্তি এবং পরিমাপের মধ্যে দুটি বিপরীতধর্মী বিশেষণ অর্থ-প্রসারের দুই প্রান্ত নির্ধারিত করে। যখন আমি 'রমণী' শব্দটি উচ্চারণ করি তখন সে নামটিকে অনেক বিশেষণে তাৎপর্যপূর্ণ করি। শব্দের কৌশল নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা বলেন যে, প্রতিটি বিশেষণের ক্ষেত্রে সাতটি পর্যায়ক্রম আছে। যেমন—অত্যন্ত সুন্দরী রমণী, সুন্দরীও নয়—অসুন্দরীও

নয় এমন রমণী, কুৎসিত রমণী, আংশিকভাবে কুৎসিত রমণী, অত্যন্ত কুৎসিত রমণী। এভাবে অন্যান্য বিশেষণ দিয়েও মোটামুটি সাতটি পর্যায়ক্রমের মধ্যে নামটিকে আলোকিত করা যায়।

সমাজ হচ্ছে শব্দবৈচিত্র্যের লীলাভূমি। মানুষের অনবরত সংলাপ, জিজ্ঞাসা, ইচ্ছা, অহমিকা, বেদনা প্রতিদিন উচ্চারিত ধ্বনিকে ইঙ্গিতবহ করছে। আমরা যদি কখনও আমাদের কর্মে ও ইচ্ছায় সমাজ-বিমুখ হই, তা'হলেও সমাজ আমাদেরে অনুসরণ করবে ভাষা হয়ে কখনও জাগরণে, কখনও স্বপ্নে। শব্দ চিরকাল সমাজ ও সভ্যতার স্মৃতিকে ধারণ করে আছে, শব্দ হচ্ছে একটি জাতির ইতিহাস ও বিবেকের সাড়া। যিনি চিরকাল আকাশে স্বপ্ন ছড়াতে চান, তিনিও তাঁর শব্দকে মানব সমাজের চেতনার আড়ালে নিতে পারেন না। প্রতিদিনের গতিবিধিতে যতটা অঞ্চল আমরা পরিক্রমণ করি, শব্দরূপে আমাদের ইচ্ছাগুলো তার চেয়েও অধিক অঞ্চল পরিক্রমণ করে; কিন্তু যেহেতু তা শব্দরূপে এবং যেহেতু শব্দ সকল মুহূর্তেই সমাজের অনুভূতির উত্তাপ, তাই আমাদের সকল ইচ্ছা, কল্পনা ও স্বপ্ন আমাদের সমাজ এবং সভ্যতার উৎপ্রেক্ষা মাত্র।

"All we learn from experience is the way from simplicity back to simplicity."

: Patrick Karanagh.

কবিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে যে-সরলতা থাকে তা জীবন-সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য, কিন্তু সর্বশেষের সরলতা অভিজ্ঞতার প্রগাঢ়তার জন্য। আমরা প্রথমে ভাষাকে পাই, কিন্তু অবশেষে তাকে আবিষ্কার করি শাসনের মধ্যে এবং অস্তিত্বের বিচিত্র খেলায়। রুদ্ধবাক্ থেকে মুক্তবাক্ এবং অবশেষে সর্ব সঞ্চয়ের অভিজ্ঞতায় স্বল্পবাক্—যে-কোনও প্রধান কবির কাব্য-জীবনের ক্ষেত্রে-এ উক্তি চরমভাবে সত্য। যাকে ইংরেজিতে বলে **Crystallization** অর্থাৎ স্ফটিক-বন্ধন, আমাদের অভিজ্ঞতা যখন স্ফটিকের নিশ্চিত স্বচ্ছতায় পরিণত হবে, তখন অনেক কথা বলার প্রয়োজন করবে না। অতি অল্প কথায় আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে বাঙ্ময় করবো। আমরা প্রতিদিন জীবনের অলিন্দে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞতার নিশ্বাস গ্রহণ করছি।

আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে জীবনের যে-সঞ্চয়, অভিজ্ঞতার আহরণ নিয়ে একজন কবির জীবনে তা যেমন সত্য, অন্য কারো জীবনে তেমন নয়।

পাঠকের বুদ্ধিকে দীপিত করা এবং আবেগকে পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব কবির। শব্দের বিন্যাসের মধ্যে নতুন ধ্বনি-ব্যঞ্জনা দান করে, বক্তব্যকে এই সঙ্গে চিন্তা ও আবেগের মধ্যে শিহরিত করে পাঠকের আপন বোধের রাজ্যে কবি আপন সত্তাবোধকে কম্পিত দেখবেন। প্রতিদিনের কথা একটি তীব্র স্বাভাবিকতায় অথচ এ মুহূর্তের সীমাকে অতিক্রম করে একটি জীবনের স্মরণ-চিহ্ন হবে। জ্ঞানের পরিধি বর্তমানে অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা যা জানি তা আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনের অনেক বেশী অর্থাৎ যতটা আমাদের ব্যবহারে লাগবে তার চেয়ে অনেক বেশী। একজন কবিকে এ জানার অসম্ভব প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে বাস করতে হয়। পাঠক যেখানে বাস করেন ব্যবহারের এবং প্রয়োজনের পৃথিবীতে, কবি সেখানে বাস করেন জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান ভবিষ্যতের অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে। তাই কবি পাঠকের জন্য সকল সময় লিখতে পারছেন না। বহু বিপর্যয় সহ্য করে পাঠককে কবির কাছে পৌঁছুতে হচ্ছে। সেজন্যই আধুনিক কবিতার জন্য পাঠকের কাছ থেকে অনবরত প্রতিবাদ আসে। অনেক কথাই তো উচ্চারিত হ'ল, কিন্তু সবই যেন আমার জ্ঞানের বাইরে, তা'হলে আমি পেলাম কি? এ প্রশ্ন সর্বকালের পাঠকের। উপকার হবে যদি আমাদের পাঠক এভাবে চিন্তা করেন যে, কবি কি বলছেন তা তিনি এ মুহূর্তেই জানতে চান না, কি বিন্যাসে এবং কৌশলে বলছেন পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তা উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত দেখতে চান। যদি কবির বলার কৌশল পাঠকের মনঃপূত হয় তা হলে ক্রমশঃ একটি চতুর দৃষ্টিপাতের মতো বলার তাৎপর্যও স্পষ্ট হবে। হয়তো এখন নয় কিন্তু কিছুদিন পরে অবশ্যই। এ ভাবেই পাঠক ক্রমান্বয়ে কবির নিকটে আসবেন এবং আধুনিক কবিতা বর্তমান কালের সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোত হবে, আপন সত্যে স্বয়ম্প্রভ হবে।

চিরকাল ধরে আমাদের পাঠক কবিতার জন্য ছন্দকে, অনুপ্রাসকে, কোনও কোনও শব্দের পুনরাবর্তকে অপরিহার্য ভেবেছে। দীর্ঘ অনেক শতাব্দীর পাঠক্রমের স্বাভাবিকতায় এ অপরিহার্যতার চিন্তা তাদের মনে বদ্ধমূল। যে-কোনও ভাষার কবিতার জন্য এ-কথা সত্য। কবিতায় শব্দগুলো ধ্বনি-

সাম্যে তরঙ্গিত হবে, আবৃত্তির সময় সামান্য অভিনয়কে অবলম্বন করে আমাদের প্রতিমুহূর্তের কথা-বলাকে হারিয়ে শব্দগুলো নতুন ভাব-চেতনার দ্যোতনায় উচ্চারিত হবে। কবিতার পাঠক চিরকাল এ-ভাবেই চিন্তা করছেন। সর্বকালের অভ্যাস এবং পাঠের আনন্দে কবিতার একটি অবয়ব এমনভাবে নির্মিত হয়েছে যে, তাকে ভেঙে-চুরে একাকার করলে পাঠকের পক্ষে মর্মগ্রহণে অসুবিধা হয়। ভাঙা-চোরাও যে ভাঙা নয়, তার মধ্যেও যে ধ্বনির বিচিত্র কৌশল আছে এবং অনুশীলিত কণ্ঠস্বরের ছন্দ আছে, পাঠককে তা আবিষ্কার করতে দিতে হবে। পাঠক আপন জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিবেককে ব্যবহার করে নতুন কবিতায় আপন স্বভাবের সত্যকে যেমন পাবেন, তেমনি কবির নিজস্ব বোধের রাজ্যে উপনীত হয়ে একটি বিস্ময়ের সম্মুখীন হবেন, যে-বিস্ময়কে সহজে গ্রহণ করা যাবে না অথচ অস্বীকার করাও যাবে না। পাঠক এবং কবির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার উপায় হচ্ছে ধ্বনি এবং ছন্দের কারুকার্যকে অবহেলা না করে নতুন নতুন বিশ্বাসকে অনবরত অনবগুণ্ঠিত করা। পাঠক যেন ক্রমশঃ বিরুদ্ধতা এবং অবহেলাকে হারিয়ে ফেলে, সে চেষ্টা পাঠককে যেমন করতে হবে, কবিকেও তেমান করতে হবে।

অনেক সময় কবিতাকে নিছক আবরণের মতো মনে হয়, যেন তা বর্ণিত একটি বিষয়ের আচ্ছাদন, কিন্তু আচ্ছাদনও দেহকে সুষম মাধুর্যে উদ্ঘাটিত করে, আচ্ছাদনেরও বর্ণ-বৈচিত্র্য আছে এবং আচ্ছাদনও দেহকে স্বীকার করেই মূল্যবান। কবিকে লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে আবরণের চাপে পড়ে বিষয়টি বিকৃত না হয় অর্থাৎ আবরণ যেন বিষয় বা দেহের সত্যকে বহন করে। আবরণ আকর্ষণ করবে, আমন্ত্রণ জানাবে একটি আবেগের চর্চায়। যে-ভাবে নববধূ সুসজ্জিতা হয়ে একটি স্পর্শের অপেক্ষায় থাকে, তেমনি কবিতা তার ছন্দ এবং ধ্বনির আচ্ছাদন নিয়ে পাঠকের বিশ্বাস ও আনন্দের স্পর্শ-কামনায় আকুল থাকে। ছন্দ ও ধ্বনিকে অগ্রাহ্য করে শুধু গদ্যের ব্যথায় কবিতা সাধারণত কথা বলে না, কেননা সংবাদের গাণিতিক হিসেবে তো কবিতায় মুখরতা আসে না। তাই আবরণ নিয়ে, অলঙ্কার নিয়ে, ভূষণ-সম্ভারে আলোকিত হয়ে কবিতা চিত্তগ্রাহী হয়।

ধ্বনির দৃশ্যমান প্রতীকরূপে যে-অক্ষরগুলো আমরা পেয়েছি, সেগুলো

তাদের অন্তর্নিহিত ধ্বনি নিয়ে সর্বমুহূর্তে আমাদের ব্যবহারে আসছে, কিন্তু এদের প্রত্যেকটিরই সম্পর্কগত একটি ব্যঞ্জনাও আছে অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিতে, অনুপ্রাসে অসাধারণ বিচিত্রতায় অনবরত ধ্বনি-সমন্বয় নির্মিত হচ্ছে। 'ক', 'খ', 'ন', 'স'—এককভাবে এ সমস্ত ধ্বনির নিজস্ব ব্যক্তিস্বরূপ আছে, কিন্তু অন্যান্য ধ্বনির সম্পর্কে এসে এরাই সুরঝংকার এবং ছন্দমাত্রার ভিত্তি হয়। কবিকে উচ্চারিত ধ্বনির সময়গত পরিমাপ গণনা করতে হয়, ধ্বনির পুনরাগমের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হয়, অর্থাৎ, এক কথায়, কবিতায় ব্যবহৃত শব্দে ধ্বনির তাৎপর্যকে আবিষ্কার করতে হয়। অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ধ্বনি-বৈচিত্র্য কবিতার শরীর গঠন করে। ছন্দ এবং ধ্বনি কবিতার বক্তব্যকে শিল্পরূপ দান করে। যিনি কবি, তাঁকে প্রচলিত ছন্দের কৌশল জানতে হবে, ধ্বনির মর্যাদাকে আবিষ্কার করতে হবে—এ সবকিছুর চর্চা হারিয়ে কবিতা লিখতে যাওয়া বাতাসে আঙুল দিয়ে রেখা টানার মতো অর্থহীন।

যা কিছু আমি চোখে দেখেছি এবং দেখেছি বলেই যেগুলোর একটি চিত্রকল্প আমার স্মৃতিতে নির্মিত রয়েছে, কবিতা লিখবার সময় বিশেষ উপলব্ধি ব্যাখ্যার জন্য দৃশ্যগোচর তাৎপর্য নিয়ে শব্দ তখন স্মৃতি-পটগুলো উন্মোচিত করে। যদি লিখি "তার চোখ বিস্তারিত আকাশের নীল" অথবা "আমার পূর্ব বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল" তা'হলে আমি শব্দে দৃশ্যগোচর তাৎপর্যের স্বাক্ষর রাখলাম। প্রথম উপমায় 'চোখ', 'বিস্তার', 'আকাশ' এবং 'নীল' সব ক'টি শব্দই আমাদের প্রতি-মুহূর্তের দৃষ্টির দ্বারা চিহ্নিত। 'চোখ' এখানে পরিচিত কোনও রমণীর চোখ, হঠাৎ কোনও মুহূর্তে যা আমার ভালো লেগেছে। এ-ভালো লাগাকে আমার উপলব্ধিতে উজ্জীবিত রাখতে চেয়েছি বলেই আমি নদীর বিস্তার অথবা প্রান্তরের বিস্তারের কথা বলেছি যা' আমার দৃষ্টির সীমায় ধরা পড়েছে এবং দৃষ্টিকে সৌভাগ্য দিয়েছে। আকাশের কথা লিখেছি সীমাহীন অতলতার প্রশান্তি যার মধ্যে, এবং নীল বর্ণের কথা লিখেছি—যার মধ্যে প্রগাঢ়তা এবং স্নিগ্ধ সম্মোহন আছে। এভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখবো যে, সম্পূর্ণ চরণটি একটি বর্ণনাকে উপস্থিত করে নি কিন্তু একটি হৃদয়ের নিভৃত উপলব্ধিকে উপস্থিত করেছে। ঠিক এভাবেই "আমার পূর্ব-বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের

তমাল" একটি বিশেষ চিত্রকল্পের স্মারক কিন্তু তার মধ্যে মধ্যযুগের কাব্যের আনন্দ মিশ্রিত হয়েছে।

শব্দের অর্থ কবিরা নির্মাণ করেন না, আবিষ্কার করেন। ভাষাকে আমি আমার জাতির চৈতন্যোদয়ের কুশলসম্ভাষণ বলে মনে করি। যেমন আমাদের দেহের ত্বক শরীরের সঙ্গে স্বাস্থ্য, জীবন ও স্পর্শের অনুভূতি নিয়ে সংলগ্ন, তেমনি আমাদের ভাষা আমাদের জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে বিজড়িত। জার্মান ভাষায় বলা হ'ল **wire einem der Schnabel gewachsen ist**—তার চঞ্চুর মধ্যে যেভাবে গড়ে উঠেছে। ভাষা সে-ভাবেই জাতির ওষ্ঠ-লালিত জীবনের কাকলী। শব্দ তার শিকড় নিয়ে, পারিপার্শ্বিক পরিচয় নিয়ে এবং সর্বযুগের ব্যবহারের স্মৃতি নিয়ে একজন কবির কাছে অনবরত আবিষ্কৃত হতে থাকে। এভাবে ব্যাখ্যাসূত্র ধরে অগ্রসর হলে এজরা পাউণ্ডের উক্তির তাৎপর্য বুঝতে পারবো—

"Great literature is simply language charged with meaning to the utmost degree." (***How to Read***).

তিন

কোনও কবির কাব্যগত ঐতিহ্য-সম্পর্কে অবহিত হতে হলে, তাঁর কাব্যের শব্দরূপ এবং বাণীমূর্তির দিকে আমাদের লক্ষ্য দিতে হবে, কেননা, শব্দ এবং ধ্বনির প্রশ্রয়েই কবিতার অর্থ ধরা পড়ে। কবির বক্তব্য কাব্যের শব্দমূর্তির সঙ্গে বিজড়িত, অনেকটা অঙ্গাঙ্গী সংযোগের মতো। কাব্য রহস্য সৃষ্টি করতে পারে, মানবমনে অনুপ্রেরণা আনতে পারে, সাধারণের উপভোগের অতিরিক্ত একটা আনন্দবোধ জাগাতে পারে, কিন্তু কবিতা প্রধানতঃ এবং মূলতঃ ভাষার সম্ভাবনা নির্ণয় করে থাকে। এভাবে ভাষার সম্ভাবনা নির্ণয়ের মধ্যেই কবিতার ঐতিহ্য নিহিত থাকে। একটি উদাহরণ দিলেই কথাটি স্পষ্ট হবে। "মরমী" কবিতায় নজরুল লিখেছেন :

"কোন্ মরমীর মরম ব্যথা আমার বুকে বেদনা হানে
জানি গো, সেও জানেই জানে।
আমি কাঁদি তাইতে সে তার ডাগর চোখে অশ্রু আনে
বুঝেছি তা প্রাণের টানে।"

এ-উদ্ধৃতির প্রতিটি শব্দের মূল্য অভিধানগত অর্থের উপর নির্ভরশীল, তাই এখানকার ঐতিহ্য নতুন কিছু নয়—সাধারণ বাংলা গানের চিরাচরিত ভাবরূপ মাত্র। কিন্তু "নিকটে" কবিতায় কবি যখন বলেন:

"বাদলা কালো স্নিগ্ধা আমার কান্তা এলো রিম্‌ঝিমিয়ে
বৃষ্টিতে তার বাজলো নূপুর পাঁয়জোরেরই শিঞ্জিনী যে
ফুট্‌লো ঊষার মুখটি অরুণ, আইল বাদল তাম্বু ধরায়
জম্‌লো আসর বর্ষা বাসর, লাও সাকী লাও ভর পিয়ালায়॥"

তখন কোনো শব্দই সাধারণ অভিধানগত অর্থ ব্যক্ত করে না। প্রাচীন ইরাণী কাব্যধারার সঙ্গে আমরা মুহূর্তেই সম্পর্কিত হই, অর্থাৎ কবি তাঁর শব্দ-প্রয়োগ এবং বিন্যাসের বিশিষ্টতায় একটি বিশেষ ঐতিহ্যের রস-রূপে সঞ্জীবিত হন। বৃষ্টিধৌত সুস্নিগ্ধ ঊষায় যে-বাসনার রসাবেশ কবির মনকে আচ্ছন্ন করেছে, ঘটনার দিক দিয়ে তা কোন প্রাচীন ব্যাপার নয়—কিন্তু তাতে অতীতের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার একটি আধুনিক স্থিতি ঘটেছে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে এহেন রূপকল্পকেই আমরা কাব্যগত ঐতিহ্য আখ্যা দিয়ে থাকি।

নজরুল ইসলামের কাব্য থেকে কিছু উদাহরণ দিয়ে এ-ঐতিহ্যের পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

নজরুল-কাব্যে এ ঐতিহ্য বিচিত্ররূপা। সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে কখনও তা হিন্দু পৌরাণিক বোধকে জাগ্রত করেছে, আবার কখনও পারসিক ঐশ্বর্য-বিলাস ও আনন্দের কথা স্মরণ করেছে। কিন্তু ভক্তিভাবের ক্ষেত্রে পৌরাণিক বোধটাই বেশী প্রবল।

"ঝড়ের" বর্ণনায় নজরুল ইসলাম কখনও কখনও যে-রূপকের কল্পনা করেছেন, তা অনিবার্যভাবে প্রতীক-ধর্মী পৌরাণিক জীবনের একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

"হেরিলাম সেবারত মহীয়সী মহালক্ষ্মী প্রকৃতির রূপ।
সহসা সে ভুলিয়াছে সেবা, আগমন ভয়ে মোর,
প্রস্তর শিখার সম নিশ্চল নিশ্চুপ!
অনুমানি' যেন কোন্ সর্বনাশা অমঙ্গল ভয়।
জাগি' আছে শিশুর শিয়র পাশে ধ্যানমগ্ন মাতা
শ্বাস নাহি বয়।
মনে হল এই বুঝি হারা মাতা মোর!
মৌনা ঐ জননীর শুভ্র শান্ত কোলে।
প্রহ্লাদ কুলের আমি কাল দৈত্য শিশু—
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম, 'মা' আমার বলে।
নাহি জানি কোন্ ফণীমনসার হলাহললোকে
কোন বিষদীপ-জ্বালা সবুজ আলোকে—
নাগমাতা কদ্রু-গর্ভে জন্মেছি সহস্র ফণা-নাগ
ভীষণ-তক্ষক শিশু!
কোথা হয় নাগনাশী জন্মেজয় যাগ—
উচ্চারিছে আকর্ষণমন্ত্র কোন্ গুণী—
জন্মান্তর পার হতে ছুটে চলি আমি সেই মৃত্যু-ডাক শুনি।
মন্ত্র তেজে পাংশু হয়ে ওঠে মোর হিংসা-বিষ-ক্রোধ-কৃষ্ণ-প্রাণ
আমার তুরীয় গতি সে যে ঐ অনাদি উদয় হতে
হিংসা-সর্প-যজ্ঞ-মন্ত্র টান!"

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-কিম্বদন্তীর ঐতিহ্য অপূর্বভাবে নজরুল ইস্‌লামের কল্পনায় প্রবাহিত হয়েছে। আপন মজ্জায় তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের চাঞ্চল্য অনুভব করেছেন। এ ঐতিহ্য এতটা তীক্ষ্ণভাবে মর্মানুবিদ্ধ হয়েছে যে, রসূলের আবির্ভাবের কথা বলতে যেয়ে, "কমলবিহারী" ও "বিশ্বপ্রণব-ওঙ্কার ধ্বনির" স্বপ্ন দেখেছেন:

"শাস্ত্র-আচার জগদ্দল শিলা বক্ষে নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায়
খোঁজে প্রাণ বিদ্রোহী কোথায়?
খুঁজিছে মুখের মৃণালে রক্ত-শতদল শত শত ব্যথায়,
কমলবিহারী তুমি কোথায়!

আদি ও অন্ত যুগযুগান্ত দাঁড়ায়ে তোমার প্রতীক্ষায়,
চির সুন্দর তুমি কোথায় !
বিশ্ব-প্রণব-ওঙ্কার-ধ্বনি অবিশ্রান্ত গাহিয়া যায়,
তুমি কোথায় তুমি কোথায় !"

প্রশংসিত মানবের আবির্ভাবের জন্য যে-পরিবেশের কল্পনা তিনি করেছেন, তার ঐতিহাসিক-বোধ অসার্থক এবং ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু "ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম্" কবিতায় যে-ঐতিহ্য তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা উন্মেষ-যুগের ইসলামের স্বপ্ন বহন করে এনেছে। এ-কবিতা পাঠে আমরা বুঝতে পারি যে, যথার্থ শিল্পীর হাতে উপমা, রূপক, শব্দ ও ধ্বনির অশেষ সম্ভাবনার পরিচয় বহন করে। কবিতাটির আরম্ভ এ-ভাবে :

"নাই তাজ—
তাই লাজ ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ !
করে তসলিম হর কুর্নিশে শোর আওয়াজ
শোন্ কোন্ মুঝ্‌দা সে উচ্চারে হেরা আজ
ধরা মাঝ।
উর্‌জ্‌ য়্যামেন নজ্‌দ্ হেজাজ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান তিহারাণ স্মরি কাহার বিরাট নাম—
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম !
চলে আঞ্জাম্
দোলে তাঞ্জাম,
খোলে হুর-পরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম
টলে কাঁখের কলসে কওসর ভর
হাতে আব্ জম্ জম্ জাম
শোন্ দামাম্ কামান্ তামাম,
সালাম—
নির্ঘোষি কার নাম
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।"

এখানে কবি, ইস্‌লামের ঐতিহ্যের উন্মেষ ও কর্মধারার পরিচয় বহন করেছেন শব্দের অপূর্ব হিল্লোল, ধ্বনিতরঙ্গ এবং অর্থ-গভীরতায়। শুধুমাত্র স্থানবাচক বিশেষ্যের পরস্পর অবস্থিতিতেই যে-ইতিহাসের সম্পদ এবং ক্রমধারার পরিচয় বহন করা চলে, তার পরিচয় আছে উপরের উদ্ধৃতির সপ্তম-অষ্টম-নবম চরণে। এ কবিতাতেই অন্যত্র শব্দের বাণীবিন্যাস ও ধ্বনিতরঙ্গের অন্তরালে নীল ও সবুজ বর্ণের প্রলেপ লেগেছে। লোহিত সাগরের নীলায় মিশেছে মরুভূমির মরূদ্যানের শ্যামল বর্ণ—

"দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুশীতে সে
বাগে বাগ,
পশ্চিমে নীলা লোহিতের খুন্ জোশীতেরে
লাগে আগ,
মরু সাহারা গোবীতে সবুজার জাগে দাগ।"

অথবা—

"ঝুরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরাণী তুরানী তুর্কীর।"

এখানকার সুর্খির রক্তিমাভা স্পর্শ-সঞ্চারী ও ক্রমবিস্তৃত। নজরুল ইস্‌লাম যৌবনের উল্লাসকে নিরীক্ষণ করেছেন ইরাণী ঐশ্বর্যের রশ্মিরেখায়। শব্দের মোহনীয়তাই এখানে সবকিছু। গভীরতার ব্যঞ্জনায় জীবনের মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা নেই। হঠাৎ হাওয়ায় গাছের পাতা যেমন কেঁপে উঠে, তেমনি যৌবনাবেগে সমস্ত জীবনেই যেন শিহরণ জেগেছে :

"সাধ করে আজ বর্‌বাদ্ করে দিল্ সবাই—
নিম্‌খুন কেউ কেউ জবাই।
নিক্‌পিক্ করে ক্ষীণ কাঁকাল,
পেশোয়াজ কাঁপে টালমাটাল,
গুরু উরুভারে তনু নাকাল—
টলমল আঁখি জল-বোঝাই!
হাফিজ উমর সিরাজ পালায়ে লেখে
রুবাই!
নিম্‌খুন কেউ কেউ জবাই!"

কখনও কখনও রূপকে হিন্দু-মুসলমান উভয় ঐতিহ্যেরই মিশ্রণ দেখতে পাই। একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

"আমি ছিনু পথ-ভিখারিণী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
মুসাফিরখানা ভুলায়ে আনিলে কোন্ এই মঞ্জিলে ?
মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তস্‌বীর,
'তস্‌বী'তে জপি যত নাম তার তত ঝরে আঁখিনীর !
'তশবীহি' রূপ এই যদি তাঁর 'তন্‌জিহি' কিবা হয়,
নামে যাঁর এত মধু ঝরে, তাঁর রূপ কত মধুময় !
কোটি তারকার কীলক-রুদ্ধ অম্বর-দ্বার খুলে'
মনে হয় তাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি জলে উঠে কুতূহলে।"

এখানে সূফী তাসাওয়াফ পরিণত হ'য়েছে বৈষ্ণব রূপানুরাগ তত্ত্বে। কবিতাটির নাম "আর কতদিন"। কবি সূফী সাধনার আত্মবিলোপন ও বিখুদী তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণলীলার রূপককে তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। ইস্‌লাম ধর্মের ঐতিহ্যকে তিনি গ্রহণ করেছেন কিন্তু বৈষ্ণব তত্ত্বরূপে তাঁর কল্পনা সিঞ্চিত হয়েছে, তাই অতীতের ঘটনার উল্লেখের ক্ষেত্রে (allusiveness-এর ক্ষেত্রে) ইস্‌লামী ইতিহাসের প্রয়োজন থাকলেও, রূপকল্পনা, বিশেষণ ও আবেগের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কাব্যধারাই সক্রিয়। যেমন :

"দূর গিরি হ'তে কে ডাকে, ওকি মোর কোহ্-ই-তুর ধারী ?
আমারি মত কি ওরি ডাকে মুসা হ'ল মরুপথচারী ?
উহারি পরম রূপ দে'খে ঈসা হ'ল নাকি সংসারী ?
মদিনা-মোহন আহমদ ওরি লাগি কি চির-ভিখারী ?
লাখো আউলিয়া দেউলিয়া হ'ল যাহার কাবা দেউলে,
কত রূপবতী যুবতী যাহার লাগি কালি দিল কুলে,
কেন সেই বহু বিলাসীর প্রেমে সাকী মোরে মজাইলি,
প্রেম-নহরের কওসর ব'লে আমারে জহর দিলি ?"

এ উদ্ধৃতিতে 'মদিনা-মোহন' বিশেষণ এবং কত রূপবতী যুবতীর কুলে কালি দেওয়ার রূপকটি বৃন্দাবনে রাসলীলার কাহিনীকেই স্পষ্ট করে।

অনেকগুলি উপমা ও রূপকালঙ্কার বাংলা কাব্যক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের নিজস্ব সৃষ্টি। ইংরাজী কাব্যধারায় তাদের ঐতিহ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ণয় করা চলে হয়তো, কিন্তু বাংলার কাব্যে তারা নতুন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে। যেমন:

'এসো তুফান যেমন আসে,
সুমুখে যা পাবে দ'লে চ'লে যাবে অকারণ উল্লাসে।
আনো অনন্ত-বিস্তৃত প্রাণ বিপুল প্রবাহ গতি,
কূলের আবর্জনা ভেসে গেলে হবে না কাহারও ক্ষতি।"

অথবা

"খোলো অর্গল পাষাণের, খুশী বহুল অনর্গল,
ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে যেমন ওড়ে পারাবত দল।
সাগরে ঝাঁপায়ে পড় অকারণে, ওঠ দূর গিরিচূড়ে
বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে!"

অথবা

"বণিকের দুটো জাহাজ ডুবিবে, তা ব'লে সিন্ধু ঢেউ
শান্ত হইয়া ঘুমায়ে রহিবে—শুনিয়াছ কভু কেউ?
ঐরাবত কি চলিবে না, পথে পিপীলিকা মরে ব'লে?
ঘর পুড়ে ব'লে প্রবল বহ্নি-শিখা উঠিবে না জ্বলে?
অঙ্ক কষে না, হিসাব করে না, বেহিসাবী যৌবন,
ভাঙা চাল দে'খে নামিবে না কিরে শ্রাবণের বর্ষণ?"

অথবা

"তরু ভেঙে পড়ে তাই বলে ঝড় আসিবে না বৈশাখী?
ভীরু মেষশিশু ভয় পায় ব'লে রবে না ঈগল পাখী?"

অথবা

"যাচিয়া সে যারে চাহে বরি নিতে, হানিতে সে হেলা কভু পারে?
বিরাট সাগরে পায় কি ঝর্ণা? মহানদী মেশে পরপারে!
যৌবন? সে ত ক্ষণিক স্বপন, ছুঁইতে স্বপন টুটিয়া যায়
প্রেম সেথা চির মেঘ-আবৃত তনু সেথা ভোলে তনু মায়ায়।"

অথবা

"চক্ষে ইহার পলক-বিহীন দৃষ্টি গভীর নিতল নীল"

অথবা

"অস্ত আকাশ অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি
কাঁদিতেছে চাঁদ, মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকী!
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায় তন্দ্রায় ঢুলু ঢুলু,
ফিরে ফিরে চায়, দু'হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল!"

একটি কথা এখানে বলে রাখা ভাল যে, নজরুল ইস্‌লাম আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর আপন কবি-সত্তার বিকাশের প্রয়োজনে, ধর্মবোধের প্রবণতায় নয়। আলোচ্য বিষয়ের সত্যকে উজ্জ্বল করবার জন্য এবং ধ্বনি ও সুরের সম্মোহ বিস্তারের জন্য—এ সব শব্দ নজরুল ইস্‌লামের কবিতায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী হয়েছে। কিন্তু নজরুল ইস্‌লামের হয়েছে বলেই যে, সকলেরই হবে এমন কোনও কথা নেই। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত হলে কবিতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, যেমন ঘটেছিল সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ইস্‌লাম এবং মোহিতলালের কাব্যে। সাধারণভাবে অন্য ভাষার শব্দ সহসাই বাংলা শব্দের ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত হবে না। মানুষের ব্যক্তিত্বের মতো শব্দেরও নিজস্ব সত্তা আছে, সে-কারণে এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় স্বাভাবিক ব্যবহারে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কবিতার মঙ্গল সূচনা করবে না। তা'ছাড়া কবিতা যেখানে অনুভূতির উৎসাহ এবং কবির আত্ম-আবিষ্কারের সাধনা, সেখানে সমাজের সংলাপে এবং দৈনন্দিন কর্মের প্রবর্তনায় যে-সমস্ত শব্দ ব্যবহার হয়, তা' সব সময় কবিতায় ধরা পড়ে না। নাটকে উপন্যাসে কোনও বিধান ব্যতিরেকেই এসব শব্দ আসে, কিন্তু যেহেতু কবিতা একই সঙ্গে হৃদয় এবং বুদ্ধির অনুশাসন মানে, তাই বিদেশী শব্দ কবিতায় নির্বিবাদে আসে না। কখনও কখনও ধ্বনি-সাম্য বা ধ্বনি-তরঙ্গের প্রয়োজনে বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন নজরুল ইসলামের কবিতায় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বলেই তা গ্রাহ্য হবে, প্রতিদিনের রীতি হিসেবে নয়। কবিতার রূপকল্পে বিদেশী শব্দের ব্যবহার অর্থাৎ সে-

সমস্ত শব্দের ব্যবহার যা আমাদের স্বাভাবিক শব্দ-সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত নয়, কবিতাকে কান্তিহীন করবে। আমি লক্ষ করেছি, যাঁরা বিদেশী শব্দ ব্যবহারের কথা বলেন, তাঁরা কোনও শব্দব্যবহারই জানেন না। কবিতার রাজ্যে তাঁদের বক্তব্য একটি বিতৃষ্ণার মতো।

চার

কবিতার 'রূপ' বা 'আঙ্গিকে'র কথা কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে প্রায়ই শোনা যায়, কিন্তু এর অর্থ অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। বহুভাবে আঙ্গিক শব্দটির প্রয়োগ হচ্ছে এবং প্রয়োগের এই বৈলক্ষণ্য অনেকক্ষেত্রে বিপরীত-প্রকার অর্থও নির্দেশ করে।

আঙ্গিকের সাধারণ অর্থ কবিতার ছন্দগত এবং শব্দবিন্যাসগত গঠন। আমরা ধারণা করতে পারি যে, একজন কবি একটি বিশেষ আবেগ মনে লালন করছেন কিন্তু এখনও ঠিক করে উঠ্‌তে পারেন নি যে, আবেগটিকে সনেটের কাঠামোতে প্রকাশ করবেন, না, পয়ারে কয়েকটি স্তবকে প্রকাশ করবেন। এখানে সাধারণ পাঠকের বিচারে কবিতার ধরনটি অর্থাৎ সনেট বা পয়ারে দ্বিপদী-ত্রিপদীই হচ্ছে 'আঙ্গিক' এবং যে-সব শব্দ কবিতার অর্থ বহন করছে, তা' হচ্ছে কবিতার প্রকৃতি বা বিষয়। দেবেন্দ্রনাথের "হে অশোক কোন্ রাঙ্গা চরণ-চুম্বনে" সনেটটি বিষয়ের দিক থেকে "ফেলিয়া দিয়াছি বাসি মালতীর মালা" সনেট থেকে পৃথক।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর বিষয়বস্তু কি, কার সঙ্গে তার রূপের পার্থক্য বা বিচ্ছিন্নতা নির্দেশ করা যায়? সাধারণ পাঠক উত্তর দেবেন যে, রামায়ণের সীতাহরণের অধ্যায় থেকে লঙ্কাধিপতি রাবণের সঙ্গে রামের সংগ্রাম এবং রাবণের ক্রম-বিপর্যয় হচ্ছে এ-কাব্যের বিষয়বস্তু। এ বিষয়বস্তুকে অন্য অনেক ভাবেও বর্ণনা করা যায়। এখানে বিষয়বস্তু হচ্ছে কবির অবলম্বিত কাহিনী বা তথ্য।

'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের হাতে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ যে-প্রকাশের মধ্যে রামায়ণের তথ্যের বিবৃতি নেই কিন্তু মধুসূদনের নিজস্ব কাব্য-বোধ ও অনুভূতির প্রশ্রয় আছে, সে প্রশ্রয়কে আমরা উক্ত কাব্যের রূপ বল্‌বো। অর্থাৎ মেঘনাদবধ কাব্যের আখ্যানটি হচ্ছে তার বিষয় এবং মধুসূদনের বলবার ভঙ্গীটি হচ্ছে তার রূপ। কবি যেভাবে আখ্যানটি শব্দ ও ধ্বনির সাহায্যে বর্ণনা করেছেন, সে বর্ণনার মধ্যেই কাব্যের রূপ বা অঙ্গ-সৌষ্ঠব স্পষ্ট হয়েছে। একটি উদাহরণ দিলেই কথাটি স্পষ্ট হবে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গে অশোককাননে সীতার বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি বলছেন :

"একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।"

অমিত্রাক্ষরের দৃঢ়-সংবদ্ধ নিগড়ের মধ্যে একটি অবাঞ্ছিত অসহায় অবস্থার চিত্র কবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। পয়ারের সাধারণ যতি-বিন্যাসের ব্যত্যয় ঘটে নি, তদুপরি অর্থগত বিরতি-চিহ্নও বর্তমান। অশোক-কাননে একাকিনী সীতার অবস্থিতি দুরন্ত চেড়ীদের কাছে একপ্রকার নিশ্চিন্ত অবস্থাই বটে। ছন্দের চালেও অসহায় করুণ মন্থরগতির পরিচয় পাওয়া যায়। "হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী"—এ উদাহরণে আ-কার ও ঈ-কারের প্রাচুর্যে একপ্রকার গম্ভীর মন্থরতার সৃষ্টি হয়েছে। এ-ছয়টি চরণের বিশেষ প্রকাশের মধ্যেই কবির বক্তব্য বা আবেদন মূর্ত হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, কাব্যের প্রকাশ-রূপ এবং কাব্যের বিষয় একই সঙ্গে বিকাশ পেয়ে থাকে। উক্ত ছয়টি চরণকে অন্যভাবে ভিন্ন ছন্দের সৌষ্ঠবে প্রকাশ করলে মধুসূদনকে পাওয়া যাবে না। রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তুর পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। যেমন :

"অশোক-কাননে কাঁদিছেন একাকিনী
শোকাকুল-প্রাণা রাঘব-বাঞ্ছা যিনি

আঁধার কুটীরে নীরবে আপন মনে !
দুরন্ত চেড়ী সতীরে ছাড়িয়া সবে
ফেরে দূরে দূরে কৌতুক-উৎসবে
হরিণীরে রাখি বাঘিনী যেমন
নিশ্চিন্তে ফেরে নির্ভয়ে দূর বনে।”

মধুসূদনের বলিষ্ঠ অমিত্রাক্ষরের আশ্রয়ে বন্দিনী সীতার বেদনার পরিচয় যে-ভাবে স্পষ্ট হয়েছে, উক্ত পরিবর্তিত ভঙ্গীতে তার আভাসমাত্র নেই। মাত্রাবৃত্তের সাধারণ ছয় মাত্রার নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপে কেমন একপ্রকার অলস বিরামের ভাব এসেছে—বেদনার সে তীব্রতা আর নেই।

কবিতার ভাব এবং ভাষা-যে একত্রে উদ্ভাসিত হয়, বিচ্ছিন্নভাবে যে তাদের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ সম্ভব নয়, অন্য একটি উদাহরণ দিয়ে তা' আবার বুঝবার চেষ্টা করছি। রবীন্দ্রনাথের 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থটি তাঁর শেষ-জীবনের লেখা। কঠিন পীড়া থেকে আরোগ্যলাভ করবার পর প্রথম প্রথম তিনি যে-কবিতাগুলো রচনা করেন, এ-গ্রন্থে তা' নিবদ্ধ হয়েছে। তিনি জীবন-সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছেন বলে সেঁজুতি বা সন্ধ্যা-দীপ জ্বেলেছেন। এ-গ্রন্থের মূল সুরটি অত্যন্ত করুণ। মৃত্যুকে বরণ করবার যে বলিষ্ঠতা এক সময়ে তাঁর ছিল, এখন আর যেন তা' আত্মপ্রকাশ করতে চায় না। পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে এ-অনুভূতিটিই কবির মনে অশেষ বেদনার সৃষ্টি করেছে, কেননা, তিনি যে পৃথিবীকে ভালোবেসেছিলেন মর্মান্তিক তীব্রতার সঙ্গে। এ-সময়কার একটি কথায় বেদনা ও ভালোবাসার এ-অনুভূতিটি অত্যন্ত স্পষ্ট, “আমি যে বেঁচে আছি, তা' কেবল এই পৃথিবীকে ভালোবেসেছি ব'লেই। এত ভালো-বেসেছি যে, বলতে পারিনে।...যাবার সময় এই কথাই ব'লে যাব যে, ভালো লেগেছিল, ভালোবেসেছিলুম পৃথিবীকে, এমন ভালো কেউ কোনো-দিন বাসতে পারে না।” (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—রাণী চন্দ, পৃঃ ৩৫, ৩৬)। 'সেঁজুতি'র 'স্মরণ' কবিতাটির প্রতি অঙ্গে যেন এ বেদনা জড়িয়ে আছে, শব্দ ও ছন্দের প্রকাশে যেন দীর্ঘশ্বাস উৎসারিত হচ্ছে। কবিতার প্রথম বারোটি চরণ উদ্ধৃত করছি—

"যখন রবো না আমি মর্ত্যকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন,
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।
হেথায় যে মঞ্জরী দোলে শাখে শাখে
পুচ্ছ নাচায়ে যত পাখী গায়,
ওরা মোর নাম ধ'রে কভু নাহি ডাকে
মনে নাহি করে বসি নিরালায়।
কত যাওয়া কত আসা এই ছায়াতলে
আনমনে নেয় ওরা সহজেই,
মিলায় নিমেষে কত প্রতি পলে পলে
হিসাব কোথাও তার কিছু নেই।"

এখানে মাত্রাবৃত্তের আট মাত্রার চাল এবং প্রতি চরণের শেষে একটি খণ্ডপর্বের স্থিতি কবিতাটিতে একটি সকরুণ মন্থরতা ও বিলম্বিত লয়ের আভাস এসেছে। সন্ধ্যাকালে প্রকৃতিতে যেমন একপ্রকার স্তব্ধতা বা বিষাদময় নিশ্চলতার ভাব আসে, এখানকার শব্দ ও ধ্বনিতে সে-ভাবটি খুবই স্পষ্ট। শব্দের এবং ছন্দের কাঠামোর কিছু পরিবর্তন করে অবিকল এ-ভাবটি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেমন :

"মর্ত্যকায়ায় যখন রবো না আমি
স্মরিতে তখন যদি হয় তব মন,
নিভৃত এখানে গোপন ছায়ায় এসো
যেখানে জেগেছে চৈত্রের শালবন।
এখানে যে ফুল দোলে ঘন শাখে শাখে
পুচ্ছ নাচায়ে পাখি যত গান গায়,
মোর নাম ধ'রে ডাকে না তাহারা কভু
আমারে স্মরে না বসি কভু নিরালায়।
এই ছায়াতলে যাওয়া আসা কতবার
আনমনে নেয় ওরা সবে সহজেই,

প্রতি পলে পলে মিলায় নিমেষ কত
হিসাব তাহার কোথাও তো কিছু নেই।"

এখানে প্রতি চরণে ছয় মাত্রার চাল—তিন মাত্রার ক্ষিপ্রগতিও অনুভব করা যায়, এবং চরণের শেষে দু'মাত্রার খণ্ডপর্ব। রবীন্দ্রনাথের বেদনা-ঘন আবেগের পরিচয় এখানে নেই। মনে হয়, কেউ যেন কিছুটা নির্লিপ্তভাবে একটি মানসিক অবস্থার পরিচয় ফুটিয়ে তুলছে। মিনতির আবেশ আছে কিন্তু পূর্বের মতো তা' সকরুণ নয়। আবার অন্যভাবেও কবিতাটির রূপান্তর ঘটিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। যেমন :

"যবে এই পৃথ্বীতলে রহিব না আমি
স্মরিতে তখন মোরে যদি ইচ্ছা হয়,
নিভৃত ছায়ায় তুমি সংগোপনে এসো
শালবনে যেথা বহে চৈত্রের মলয়।
হেথাকার যে-মঞ্জরী দোলে শাখে শাখে
নাচায়ে পুচ্ছটি কত পাখি গান গায়,
আপন বলিয়া তারা ডাকিল না মোরে
স্মরে না আমারে তারা বসি নিরালায়।
ছায়াতলে কতবার গমনাগমন
অন্যমনে ওরা সব নেয় সহজেই,
প্রতিক্ষণে অন্তর্হিত ছায়ার মতন
হিসাব তাহার জানি কোথাও তো নেই।"

পয়ারের নিশ্চিন্ত গতি এবং সংযুক্ত বর্ণের বহুলতায় এখানে দ্বিধাহীন নিশ্চিন্ত আত্মপ্রকাশের ভাবটাই প্রবল। বেদনা, করুণতা ও মিনতির কোনো পরিচয় এখানে স্পষ্ট নয়। গদ্যে সাজালে কবির বক্তব্যটা দাঁড়ায় এ-রকম :

'আমি যখন এ-পৃথিবীতে থাকব না, তখন যদি আমাকে স্মরণ করতে ইচ্ছে হয়, তবে তুমি এখানে চৈত্রের শালবনের নিভৃত ছায়ায় এসো। এখানে শাখায় শাখায় যে-মঞ্জরী দুলছে এবং যে-সব পাখি পুচ্ছ নাচিয়ে গান করছে, তারা আমার নাম ধরে কখনো ডাকে না—নিরালায় বসে স্মরণও

করে না। এখানকার ছায়াতলের যাওয়া-আসাকে ওরা অন্যমনে সহজভাবেই নেয়, দণ্ডে দণ্ডে এ আনাগোনা কোথায় যে মিলিয়ে যায়, তার কোনো হিসাব নেই।"

এ-গদ্য বক্তব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সকরুণ আবেদন, সহজ মিনতি এবং পৃথিবীর প্রতি মর্মান্তিক ভালোবাসার কোনো পরিচয় নেই। ছন্দের ব্যঞ্জনা, বিভিন্ন শব্দের পারস্পরিক সংযোগ ও স্থিতি এবং সর্বোপরি সম্পূর্ণ কবিতাটির গঠনটিকে কবির জীবনাবেগ বা অনুভূতির প্রকাশ হিসেবেই পাচ্ছি। অর্থাৎ কবিতাটির বিশেষ বিন্যাসের মধ্যেই কবির আবেদন এবং আবেগ দানা বেঁধেছে।

প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্যের জন্যই যে-কোনও দু'টি কবিতার আবেদন কখনই এক প্রকারের হতে পারে না। গদ্যে বিশ্লেষণ করলে হয়তো উভয় ক্ষেত্রে একই তত্ত্ব পেতে পারি কিন্তু তত্ত্বই যদি আমার অবলম্বন হত, তবে কাব্যপাঠের প্রয়োজন আমার হতো না। কিন্তু প্রয়োজন যে হচ্ছে, তাতেই প্রমাণিত হয় যে, আমি কবিতা পাঠ করি কবির হৃদয় ও অনুভূতির সংবাদ পাবার জন্য, অর্থাৎ জীবনের একটা চৈতন্যের আভাস পাবার জন্য। এ চৈতন্য ধরা পড়ে কবিতার শব্দে ও ছন্দে; এক কথায়, তার প্রকাশ-রূপে। কবিতার তত্ত্বকে আমি বিচ্ছিন্নভাবে কখনই পাই না। যদি একান্তই পাই, তবে শব্দ ও তার বিশেষ পরিচর্যার মধ্যেই তা পেয়ে থাকি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' কাব্যগ্রন্থের "দুঃখশোক পরিপূর্ণ" কবিতাটিতে এবং কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থের "সুখ" কবিতাটিতে যা বলা হয়েছে, নিছক তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করতে গেলে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কাব্য পাঠকের কাছে উভয় কবিতার পার্থক্য সুস্পষ্ট। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাটি এই—

"দুঃখশোক-পরিপূর্ণ এই ধরাতল।
আসে নরগণ হেথা কাঁদিতে কেবল।
প্রতিপদে দুঃখরাশি, আবরে জীবন আসি,
—রোদনের জন্মভূমি এ মহীমণ্ডল।

আজি মৃত পিতা কার আজি কার মাতা,
আজি কার প্রিয় ভগ্নী আজি কার ভ্রাতা,
এইরূপ হাহাকারে, উঠিছে সদা এ সংসারে,
মানব জীবনময় আঁধার কেবল।
দুখশোক-পরিপূর্ণ এই ধরাতল।
না উঠিতে সুখ-ভানু জীবন আঁধারে
অমনি নিবিড় মেঘে আবরে তাহারে।
না উঠিতে তৃণচয়, চরণে দলিত হয়,
না ফুটিতে শুকায় রে সুখ-শতদল।
রহে না একটি ফুল এ কণ্টকবনে;
ভাসে না একটি তারা আঁধার গগনে ;
কাঁদিতে জনম লব, কাঁদিয়া চলিয়া যাব,
অশ্রুবারি মানবের জীবন-সম্বল।
দুঃখশোক-পরিপূর্ণ এই ধরাতল।"

এখানে কবির দৃষ্টিভঙ্গী নিরঙ্কুশ। জীবনের হাহাকার, বেদনা ও অশান্তির কথা এখানে নিশ্চিত সুস্পষ্টতার সঙ্গে বলা হয়েছে। পৃথিবীতে সত্যিকার-যে কোনো আশ্রয় নেই, অন্ধকারে নিরাশ্রয় অবস্থায় জীবনের-যে বিলোপ ঘটছে, সে-সব কথা বলে কবি অনেকটা তত্ত্বজ্ঞানীর মতোই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তত্ত্বই-যে এর সম্বল নয়, তার প্রমাণ এই যে, জীবনে দুঃখবাদকে প্রশ্রয় না দিলেও এ-কবিতার আবেদনকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলছে না। তার কারণ হচ্ছে, এখানে এমন একটা বোধ আমরা নিশ্চয়ই পাচ্ছি, যা ঠিক তত্ত্ব বা দুঃখবাদের সঙ্গে স্থূলভাবে জড়িত নয়। বিশেষ করে এ-কয়টি চরণে—

"না উঠিতে তৃণচয়
চরণে দলিত হয়,
না ফুটিতে শুকায় রে সুখ-শতদল।"

একটি রূপকের ব্যঞ্জনায় যে-কাব্যবোধ স্পষ্ট হয়েছে, তাতে তত্ত্বের আভাস নেই।

কামিনী রায়ের "সুখ" কবিতায় আমরা অন্য একটা জীবন-চৈতন্যের ক্ষেত্রে উপনীত হচ্ছি। কবিতাটির শেষের ছয়টি স্তবক হচ্ছে এই—

"না বুঝিয়া হায় পশিনু সংসারে,
ভীষণ-দর্শন হেরিনু সব,
কল্পনার সম সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত
হইল শ্মশান, পিশাচ রব।
হেরিনু সংসার মরীচিকাময়ী
মরুভূমি কত রয়েছে পড়ে,
বাসনা পিয়াসে উন্মত্ত মানব
আশার ছলনে মরিছে পুড়ে'!
লক্ষ তারা ভূমে খসিয়া পড়িল,
আঁধারে আলোক ডুবিয়া গেল,
তমস হেরিতে ফুটিল নয়ন,
ভাঙ্গিয়ে হৃদয় শতধা হল।
সেই হৃদয়ের এই পরিণাম,
সে আশার ফল ফলিল এই!
সেই জীবনের কি কাজ জীবনে?—
তিলমাত্র সুখ জীবনে নেই।
যাক্ যাক্ প্রাণ, নিবুক এ জ্বালা,
বাক্‌ভাঙ্গা বীণে আবার গাই—
যাতনা—যাতনা—যাতনাই সার,
নর ভাগ্যে সুখ কখনো নাই।
বিষাদ, বিষাদ, সর্বত্র বিষাদ,
নরভাগ্যে সুখ লিখিত নাই,
কাঁদিবার তরে মানব-জীবন,
যত দিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই।"

এখানে সত্যিকারের বেদনার আশ্রয়ে লালিত একটি কবি-মনের পরিচয় আছে। পৃথিবীর অবস্থা বা মানব-ভাগ্য সম্বন্ধে তিনি কোনো চরম দার্শনিক

মন্তব্য করেন নি। এখানকার তত্ত্ববোধ কবির ব্যক্তিগত আবেগের সঙ্গে সংযুক্ত। আবেদনের দিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার সঙ্গে কামিনী রায়ের কবিতার পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। কামিনী রায়ের কবিতায় জীবন-সম্বন্ধে যে-মন্তব্য করা হয়েছে, তাতে একটি সকরুণ মূর্ছনার পরিচয় পাই। তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং হতাশ্বাস যে-দীর্ঘনিশ্বাস বহন করে এনেছে, তার মধ্যে যে-গভীর বেদনাবোধ ও আন্তরিকতার পরিচয় পাই, তা একান্ত ভাবে এ-কবিতাটির শব্দ, রূপক, উপমা, চরণ ও স্তবক-বিন্যাস এবং ভাব-ব্যঞ্জনার সঙ্গে জড়িত।

কবি কোনো একটি বিশেষ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন এবং সে তত্ত্বটি যথেষ্ট মূল্যবান—কবিতাবিচারের ক্ষেত্রে এমন ধরনের উক্তির মূল্য নেই। কেননা, কবিতার মধ্যে আমরা অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিরই সন্ধান করে থাকি. আমরা তার মধ্যে যথার্থ জীবনবোধের স্ফূর্তি আশা করে থাকি। শুধুমাত্র এ-কারণেই দু'টি কবিতার মধ্যে দুই বিরুদ্ধ তত্ত্ব স্পষ্ট হলেও রসোপভোগের ক্ষেত্রে উভয় কবিতাই আমাদের কাছে হয়তো প্রিয় হতে পারে। সুতরাং রসোপলব্ধিই হচ্ছে পাঠকের কাছে কবিতা গ্রহণ বা বর্জনের মাপকাঠি, তত্ত্বকে স্বীকার করে কবিতার মূল্য যাচাই করা হয় না।

এখানে আমি অক্ষয়কুমারের "এষা" কাব্যের "সান্ত্বনা" অধ্যায় থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় কামিনী রায় ও অক্ষয়কুমার উভয় কবিই অসহ্য মানসিক অশান্তিতে পীড়িত। কিন্তু উভয়ের উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য আছে। অক্ষয়কুমারের কাব্যে চরম হাহাকারের মধ্যেও স্বস্তিলাভের প্রয়াস আছে। মৃত্যু অমোঘ, তাই তার আবির্ভাবকে তিনি বৃহত্তর উপলব্ধির সোপান-স্বরূপ ভাবছেন। অক্ষয়কুমারের উপলব্ধির রূপ হচ্ছে এই—

"হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিধান!
তোমারে হেরি নি, প্রভু
বিশ্বাস করি হে তবু,—
সর্ব্ব-জীবে সর্ব্ব-কালে দাও পদে স্থান।
তোমারি এ বিশ্ব-সৃষ্টি
আলো-অন্ধকার—বৃষ্টি

জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক তোমারি প্রদান।
ভাঙ্গিতে গড় নি প্রেম, ওহে প্রেমময়!
মরণে নহি ত ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয়!
শোকে ধূধূ হৃদি-মরু,
আছে তার কল্পতরু!
নেত্র-নীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয়!

*　　　*　　　*

মজিয়া আপন জ্ঞানে আপনা বাখানি;
রোগে-শোকে ভাবি ডরে
জন্মি নাই মৃত্যু তরে—
যদিও এ জন্ম-মৃত্যু কেন নাহি জানি!
জানি,—মনঃ প্রাণ দেহ
নহে আপনার কেহ—
তোমারে তোমারি দান দিতে অভিমানী!
দাও প্রেম—আরো প্রেম, চির-প্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়!
জীবন-মরণ-পানে
বহে যাক্ সুরে গানে,
হোক্ প্রেমামৃত পানে অমর হৃদয়!"

এখানে যে-চিন্তার পরিচর্যা রয়েছে, তা কবির অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। "নেত্র-নীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয়"—এখানে অলঙ্করণ নেই, সত্যিকারের অনুভূতিলব্ধ সৌন্দর্যের পরিবেশন আছে। মৃত্যুতে অস্তিত্বের যে-বিলোপ ঘটে, তাকে তিনি ব্যাখ্যা করছেন এভাবে—'তোমারে তোমারি দান দিতে অভিমানী'। কবিতার পাঠক এ-কবিতাকে যেমন আনন্দের

সঙ্গে গ্রহণ করছেন, কামিনী রায়ের কবিতাকেও তেমনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছেন। যদিও অক্ষয়কুমারে আছে স্বস্তিকামনা ও আত্মজয়-শক্তির সাধনা এবং কামিনী রায়ে আছে জীবনে অস্বস্তি ও হাহাকার-বোধ এবং জীবনের মূল্যহীনতার জন্য আক্ষেপ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কবিতার সৌন্দর্য সর্বদাই তত্ত্বনিরপেক্ষ।

যেখানে কাব্যের রস-নিবেদন জীবনের পরিচয় বা প্রকাশের সঙ্গে জড়িত নয়, সেখানে তা মধুর বা সাধারণ সমালোচনার ভাষায় অনবদ্য হতে পারে কিন্তু সত্য কখনও হবে না। কেননা, সেখানে কবির অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির পরিচয় থাকবে না। একান্তভাবে কল্পনার জীবন জাগ্রত করতে হলেও সে কল্পনার বাস্তব স্থিতির প্রয়োজন অর্থাৎ তা সত্যিকার হৃদয়ানুভূতি বা বোধকে অবলম্বন করে প্রকাশ পাবে। উদাহরণ-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে, জাগ্রত জীবন-বোধকে গ্রহণ করেই-যে কবিতার স্ফূর্তি তা বোঝাবার চেষ্টা করবো। কবিতার নাম 'পসারিণী'। কবি এখানে বাস্তব-জীবনের দুর্ভরতা, কর্মচাঞ্চল্য এবং শ্রান্তি পরিহার করে স্নিগ্ধ আশ্রয়, নিভৃত গৃহকোণ এবং নিবিড় শান্তি কামনা করেছেন। রুদ্র মধ্যাহ্নের দাহনকে অস্বীকার এবং কর্মপরিহারের চেষ্টায় একটি আন্তরিকতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে; কেননা, যে-স্নিগ্ধ পরিমণ্ডলের কল্পনা কবি করেছেন, আমাদের পরিচিত জীবন ও উপলব্ধির সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। কবিতাটির প্রথম স্তবক এই—

"ওগো পসারিণী, দেখি আয়
কি রয়েছে তব পসরায়।
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি,
কোমল করুণ ক্লান্ত কায়।
কোথা কোন্ রাজপুরে যাবে আরো কত দূরে,
কিসের দুরূহ দুরাশায়।
সম্মুখে দেখো তো চাহি পথের যে সীমা নাহি,
তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে।
পসারিণি, কথা রাখো, দূর পথে যেয়ো নাকো,
ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে।"

এ-স্তবকটি সাধারণ একটি প্রস্তাবনার মতো। বাস্তব জীবন নয়—নিছক একটি কল্পনার প্রসারের আভাস আছে। দুরূহ দুরাশায় বহুদূরে রাজপুরে যাবার কথা আছে, কিন্তু একমাত্র 'রাজপুর' শব্দটি ছাড়া মহার্ঘতা, ঐশ্বর্য ও অতুলনীয়তার পরিচয় বহন করবার মতো কোনো শব্দ-উপমা-রূপক এখানে নেই। দ্বিতীয় স্তবক দেখলেই আমরা বুঝতে পারব যে, পরিচিত পৃথিবীর সীমারেখার মধ্যেই কবি স্নিগ্ধ নিভৃত আবেশের পরিচয় দিয়েছেন। এ পরিচয়ের মধ্যে আশ্চর্য সজীবতা আছে—

> "হেথা দেখো শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল ;
> কূলে কূলে ভরা দিঘি, কাকচক্ষু জল।
> ঢালু পাড়ি চারি পাশে কচি কচি কাঁচা ঘাসে
> ঘনশ্যাম চিকণ-কোমল।
> পাষাণের ঘাটখানি, কেহ নাই জনপ্রাণী,
> আম্রবন নিবিড় শীতল।
> থাক তব বিকিকিনি, ওগো শ্রান্ত পসারিণি,
> এইখানে বিছাও অঞ্চল।"

বাংলার গ্রাম্য পরিবেশের প্রশান্তি, সজীবতা, মনোরম শ্যামলতা এবং নিশ্চিন্ত বিশ্রামের পরিচয় এখানে স্পষ্ট হয়েছে। আমরা যে-জীবনকে জানি, সে জীবনের আকাশ এবং আলোককে গ্রহণ করেই কবি তাঁর স্বপ্ন ও কল্পনাকে সজীব এবং সত্য করেছেন। উপরের উদ্ধৃতির কয়েকটি বিশেষণ ও শব্দ-ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ করবার। "শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল," "কূলে কূলে ভরা দিঘি," "কাকচক্ষু জল", "চিকন-কোমল", "কচি কচি কাঁচা ঘাস"—একটি কোমল নয়নাভিরাম গ্রাম্য-প্রকৃতির নির্জনতাকে জাগ্রত করেছে। "বিকিকিনি" শব্দটির মধ্যেও স্নিগ্ধ ও কোমলতার আবেশ আছে। একটি গ্রাম্য গানের চরণে 'বিকিকিনি' শব্দটি মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়েছে। চরণটি এই—

> "দধি দুগ্ধ নট হ'ল বিকি ব'য়ে যায়—"

একদিকে নিকটের আকর্ষণ, অন্যদিকে অবহেলায় প্রাত্যহিক জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হবার ভয়—সাধারণ একটি জীবনের দীনতম আকাঙ্ক্ষা মহৎ

সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে। জীবনের সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে বলেই একে কবিতা বলে গ্রহণ করছি। রবীন্দ্রনাথের "পসারিণী" কবিতাটিও অলঙ্কারের লীলা-ঝঙ্কারে সুন্দর নয় কিন্তু জীবনকে গ্রহণ করেই সুন্দর। এ-সূত্রে ইয়েট্স্-এর **The Lake Isle of Innisfree** কবিতাটির উল্লেখ করবো—

"I will arise and go now, and
go to Innisfree,
And a small cabin build there,
of clay and wattles made ;
Nine bean rows will I have there,
a hive for the honey bee,
And live alone in the bee-loud glade.
And I shall have some peace there,
for peace comes dropping slow,
Dropping from the veils of the morning
to where the cricket sings ;
There the midnight's all a-glimmer,
and noon a purple glow,
And evening full of linnet's wings.
I will arise and go now,
for always night and day
I hear lake water lapping with low
sounds by the shore ;
While I stand on the roadway,
or on the pavements grey,
I hear it in the deep heart's core."

জীবনের কোলাহলকে ভুলে কবি শান্তি ও নিভৃত আশ্রয় খুঁজতে চান লোকালয়ের অন্তরালে নির্জন হ্রদের তীরে। কবির এ আকাঙ্ক্ষা ছোট্ট একটি মাটির ঘর ও ন'সারি সিম-লতার বাগানের ছবি এঁকে পরিতৃপ্তি খুঁজেছে। উদাহরণের মধ্যে জীবনের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষার এ প্রকার

প্রতীকগত ব্যঞ্জনা না থাকলে আমরা একে গভীর, আন্তরিক ও সত্য বলে গ্রহণ করতাম না। এভাবে উপমা-রূপক এবং সাধারণ বিশেষ্য-বিশেষণ উপলব্ধি এবং হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ হিসেবে মূর্ত হলেই সত্য হয় এবং এ সত্য হওয়ার উপরেই তাদের কাব্যশ্রীর মূল্য নির্ভর করে।

কিন্তু যেখানে কবিতা জীবন-নির্ভর নয় অর্থাৎ কবি যেখানে শব্দও উপমা-রূপক প্রয়োগের মধ্যে জীবনের ব্যঞ্জনা আনেন নি, সেখানে কবিতা অলঙ্কারে সুষমামণ্ডিত ও মহার্ঘ হতে পারে কিন্তু সে সুষমা নিছক আভরণের, হৃদয়-দীপ্তির নয়। দেবেন্দ্রনাথ সেনের অনেক কবিতায় এ প্রকার নিশ্চিন্ত কল্পনা-বিলাসের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

"কপালে কঙ্কন হানি মুক্ত করি চুল
বাসন্তী যামিনী আহা কাঁদিয়া আকুল!
স্বামী তার চৈত্রমাস অনঙ্গের মত,
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি জানু করি নত,
কার তপ ভাঙ্গিবারে করিছে প্রয়াস?
রুদ্রের মূরতি ও যে!—একি সর্বনাশ!

ললাটে অনল হের ধক্ ধক্ জ্বলে!
সর্বাঙ্গে বিভূতি-ভস্ম মাখি কুতূহলে
তপে মগ্ন—চিনিলে না বৈশাখ দেবেরে!
হে চৈত্র! এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে,
হারাইলে প্রাণ আহা!—নাশিতে জীবন
রোষান্ধ বৈশাখ ওই মেলিল নয়ন।

দিগঙ্গনা হাঁকি ডাকে—"কি কর কি কর"!
নব-উষা বলে "ক্রোধ সম্বর সম্বর!"
কোকিল ডাকিল কুহু করিয়া মিনতি,
সম্ভ্রমে অশোক-পুষ্প করিল প্রণতি!
বৃথা! বৃথা! বৈশাখের দু'চক্ষু হইতে
নিঃসরিল অগ্নিকণা, বেগে আচম্বিতে!

ভস্ম হ'ল চৈত্রমাস! হয়ে অনাথিনী
মুছিল সিন্দুর-বিন্দু বাসন্তী যামিনী!
শাল্মলীর পুষ্পরাশি পড়িল খসিয়া,
পাপিয়া বসন্ত-রাজ্যে গেল পলাইয়া।
প্রজাপতি লুকাইল কবরীর শিরে,
ভিজিল শিরীষপুষ্প নয়নের নীরে!

সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে দেবেন্দ্রনাথ সেনের কল্পনার উন্মুক্ত প্রসার লক্ষ করি—একপ্রকার নিরুদ্দেশ গতির উল্লাসের মতো। জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন এই-যে স্বপ্নসঞ্চয়ের আনন্দ, একে কাব্যবিলাস আখ্যা দিতে পারি, কিন্তু কখনই সত্য বলে গ্রহণ করবো না। কিন্তু সাক্ষাৎ জীবন-পরিচয় এবং বস্তু-পরিচয় থেকে উৎসারিত হয়ে কীট্‌স্‌-এর সৌন্দর্যকল্পনা অনাবিল ও স্নিগ্ধ হয়েছে এবং তাতে আমরা উপলব্ধির প্রগাঢ়তা লক্ষ করি—

"I cannot see what flowers are at my feet,
Nor what soft incense hangs
upon the boughs,
But, in embalmed darkness,
guess each sweet,
Wherewith the seasonable
month endows
The grass, the thicket, and the
fruit-tree wild;
White hawthorn, and the
pastoral eglantine;
Fast-fading violets cover'd up in leaves;
And mid-May's eldest child,
The coming musk-rose full of dewy wine,
The murmurous haunt of flies
on summer eves."

সৌন্দর্য এখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যে-আবেশ কবি সৃষ্টি করেছেন, তা উপলব্ধির।

বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত রাখার উপায় হচ্ছে—প্রতিদিনকার জীবন এবং পরিচিত পৃথিবী থেকে উপমা-রূপক আহরণ করা। কবিতায় যে-সব শব্দ সত্যিকারের অর্থ জ্ঞাপন করবে অর্থাৎ যে-সব শব্দের মূল্য বাক্যের ব্যাকরণ-সঙ্গত বিন্যাসের জন্য নয় কিন্তু আবেগ, উপলব্ধি, অনুভূতি ও বিশ্বাসের প্রকাশের জন্য, সে সব শব্দের চয়ন এবং প্রয়োগের উপরই কবির বিশিষ্টতা নির্ভর করে। এ আবেগ,' উপলব্ধি, অনুভূতি ও বিশ্বাস জীবনকে গ্রহণ করেই বিকশিত হয়, তাই সার্থক কাব্য জীবনগত উপমা-রূপক নিয়েই অনন্য এবং সুন্দর। কথা যখন হৃদয় থেকে আসে অর্থাৎ মানুষের বিশ্বাস, উপলব্ধি, উল্লাস ও ব্যথা থেকে যখন কথা আসে, তখনই সে কথার মধ্যে আমরা প্রাণের স্পন্দন পাই এবং তখনই সে কথা কবিতার কথা। আবেগ যখন হৃদয়ের সামগ্রী হয় না, তখনই কথায় কারুকার্যের নিপুণতা থাকতে পারে, কিন্তু তা কৃত্রিমতার নিপুণতা। সমগ্র হৃদয় দিয়ে অনুভব করা হয় নি বলেই তা সত্য নয়। দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে অক্ষয়কুমার বড়ালের তুলনা করলেই কথাটি স্পষ্ট হবে। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় কাব্যবিলাস আছে, কথাকে নানাভাবে অলঙ্কারের প্রাচুর্যে সাজানো আছে। জীবনরহিত এমন অপূর্ব বর্ণবৈচিত্র্য খুব কমই দেখা যায়। তাঁর কীর্তি সুন্দর কিন্তু জীবনের আলোতে দীপ্যমান নয়। 'ডায়মনকাটা মল' বলে একটি কবিতা আছে, সেখানে সুন্দর নৃত্যলীলায় কথা ছুটে চলেছে। নৃত্যের বিচিত্র তালে তিনি মেতে রয়েছেন কিন্তু হৃদয় সে সঙ্গে কথা বলে ওঠে নি। অল্প একটু উদ্ধৃত করছি—

ঝমর ঝমাৎ ঝম, ঝমর ঝমাৎ ঝম, বাজে ওই মল।
উঠিছে পড়িছে কি রে, নামিছে উঠিছে কি রে,
রূপ-হর্ম্যে সঞ্চারিণী রাগিণী তরল?
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে, কোকিল কি ঝঙ্কারিছে,
নিশুতির শান্ত গৃহে খুলিয়ে অর্গল?
সুন্দরীর উচ্চ হাসি পেয়ে প্রাণ অবিনাশী,
অবিরল ছুটে কিরে আনন্দে চঞ্চল?

ঝমর ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্,
কেন আজি প্রতিধ্বনি হরষে বিহ্বল ?
মল বলে,—"আমি যার 'বধূ' সে গো নহে আর,
মাতৃভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল।"
বড় বধূ ওই আসে, শিশুরা পলায় ত্রাসে ;
চঞ্চলচরণ দাসী সহসা নিশ্চল !
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে ? কোকিল কি ঝঙ্কারিছে ?
মুখর বিরহ বলে, "চল্ চল্ চল্"—
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্ ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্,
বাজে ওই মল !"

এখানে উপলব্ধি বা হৃদয়াবেগের কথা নেই, ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সুর-বৈচিত্র্যের কৃত্রিমতার মধ্যেই কবিতাটির প্রাণ। এ কবিতা কবির কল্পনাগত কৌশল থেকে উৎসারিত, হৃদয়ের উপলব্ধি দ্বারা উজ্জীবিত নয়।

একটি উদাহরণ থেকে কবির কল্পনাগত কৌশলের পরিচয় পাওয়া যাবে—

"Full gently now she
takes him by the hand,
A lily prison'd in a gaol of snow
Or ivory in an alabaster band,
So white a friend engirts so white a foe."
(*Venus aud Adonis*—Shakespeare)

এখানের বর্ণনার মহার্ঘতা আছে। এডোনিসের ও ভিনাসের হাতকে লিলিফুলের সঙ্গে ও তুষারের শুভ্রতার তুলনা করা হয়েছে কিন্তু এ তুলনায় এডোনিস ও ভিনাসের জীবন স্পষ্ট হয় নি। কোনক্রমেই বলা চলে না যে, এখানে আমরা উভয়ের আকুলতা, আকাঙ্ক্ষা এবং তৃপ্তির পরিচয় পাচ্ছি। অথচ একই কবিতার অন্যত্র পাচ্ছি—

"My smooth most hand,
were it with thy hand felt,
Would in thy palm dissolve,
or seem to melt."

এখানে হৃদয়ের অনুভূতি হাতের স্পর্শের মধ্যে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখানে কল্পনার প্রতিষ্ঠা জীবনের উপর, এবং সে প্রতিষ্ঠা প্রশস্ত। জীবনের রস যেখানে নিঃসংশয় ভরসার সঙ্গে কাব্য-কথায় প্রকাশ পায়, সেখানেই তা কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করে। কল্পনা যেখানে লীলার সামগ্রী মাত্র নয় কিন্তু জীবনেরও সামগ্রী, সেখানেই কল্পনার মর্যাদা এবং সত্যতা। নিরঙ্কুশ কল্পনার নিদর্শন স্বরূপ কিছু কাব্যাংশ উদ্ধৃত করছি—

ক. কালো-ডানার শ্বেত-মরালী! স্নানের ঘরে হাম্মামে
ছড়িয়ে পড়ে চুলের পালক শুভ্র তনুর ডান্-বামে!
গোলাব ফুলের তাজটি মাথায় জাফরাণী রং পায়জামা—
যুবতী নয়, বালক-কিশোর বস্‌ল এসে তাঞ্জামে!

॥ মোহিতলাল ॥

খ. তুমি আমার বকুল যুঁথি—মাটির তারা-ফুল,
ঈদের প্রথম চাঁদ গো তোমার কানের পার্সি দুল।
কুসুমী রাঙা শাড়িখানি
চৈতী সাঁজে পরবে রানী,
আকাশ গাঙে জাগবে জোয়ার রঙের রাঙা চান,
তোরণ দ্বারে জাগবে করুণ বারোয়াঁ মুলতান।

॥ নজরুল ॥

গ. কর্পূর ফাগ ক'রে জোৎস্নাতে চাঁদ হোলি খেল্‌ছে!
কর্পূরি কুঙ্কুম ফুলে ফুল ফেল্‌ছে।
হিল্লোলি' উল্লাসে মাতি অনুভব রাসে
মল্লিকা হাসি হেনে হেল্‌ছে!
উবে যাওয়া রূপ কত তারা-ফুলে অবিরত
হীরার লাবণি—মণি মেলছে!

॥ সত্যেন্দ্রনাথ ॥

ঘ. গড়েছে রজত রেখা রক্তিম অধরে,
মরমের ভাষা যেন হয়েছে বিকাশ।

জ্যোছনার স্নেহ যেন গোলাপের পরে
ফুটায়ে দিতেছে তার সুষমা সুবাস।
কোন্ শুভ দিবসের চুম্বনের স্মৃতি
অধরের রাঙিমায় হয়েছে বিলীন
কোন্ সুখ রজনীর চাঁদের কিরণ
অধর পরশে এসে আপনা বিহীন।

॥ বলেন্দ্রনাথ ॥

কাব্যের মধ্যে জীবনের স্পর্শের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক সময় লিখেছিলেন—"সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে, সেখানেই সাহিত্যের অমরাবতী। কিন্তু জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে। সে বিশেষ করে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি জীবনের স্বাক্ষর না পায়, যদি সে বিশেষ কালের বিশেষত্বমাত্র রচনাকৌশলে পরিচয় দিতে থাকে, তাহলে সাহিত্যের সেই রসের সঞ্চয় বিকৃত হয় বা শুষ্ক হয়ে মারা যায়। সে রসের পরিবেশনে অকৃত্রিম আস্বাদনের দান থাকে, সে রসের ভোজে নিমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে না। 'চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে' এই লাইনের মধ্যে বাক্‌চাতুরী আছে, কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। অপর পক্ষে—

তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রঙ আছে উজ্জ্বলি
সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচুলি—

এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।"

॥ সাহিত্যের স্বরূপ, পৃঃ ৫৩ ॥

কবিতায় অনেক সময় বিশেষণ, উপমা, রূপক বা উৎপ্রেক্ষা নিছক বাক্‌-চাতুরী হয়ে পড়ে। বাংলা কবিতায়, বিশেষ করে, এ সমস্ত অলঙ্কার যেখানে মাত্র সৌন্দর্যহেতু, সেখানেই অপ্রাকৃত এবং অসত্যবোধের লালন লক্ষ করা যায়। এর কারণ হচ্ছে, সৌন্দর্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা দেহ বা দেহা-বরণকেই প্রাধান্য দিয়েছি কিন্তু সে ক্ষেত্রে হৃদয়ের পরিচর্যা ঘটে নি। মধ্য-যুগের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এ কথা সাধারণভাবেই সত্য। রবীন্দ্রকাব্যে

এর প্রভাব লঘু হলেও, এর অসমর্থন নেই। রবীন্দ্র-পরবর্তী অনেকের কাব্যে বিশেষ করে মোহিতলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্র বাগচী এবং কালিদাস রায়ের কাব্যে, কাব্যের অলঙ্কার মধ্যযুগের সৌন্দর্যবোধেরই পরিচয় বহন করে। পার্থক্য শুধু এই, যেখানে মধ্যযুগের কাব্যে, সৌন্দর্যনিরীক্ষণ অংশ-বিচার করে সম্পূর্ণ বস্তুতে আসবার চেষ্টা, এদের কাব্যে অনেকটা প্রহেলিকা এবং অস্পষ্টতার মধ্যে প্রথমেই বস্তুর সম্পূর্ণ পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়। মধ্য-যুগের এহেন অংশ-বিচার প্রথম থেকেই অস্বচ্ছ এবং অবাস্তব এবং এ বিচারে প্রতিটি অংশ মূল বস্তু থেকে শেষপর্যন্ত বিচ্ছিন্ন থাকে। কবিকঙ্কন চণ্ডী থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কবি খুল্লনার রূপ-বর্ণনা করছেন—

"খুল্লনা বাড়য়ে দিনে দিনে।
হইল বৎসর ছয়, বরণ বর্ণন নয়,
শোভা করে অলঙ্কার বিনে॥
সফল মানস মানি, আনি ভৃঙ্গারের পানী,
মলা দূর করে চম্পাবতী।
যতনে বুঝায়ে তায়, আভরণ দিল গায়,
রূপের মঞ্জরী কলাবতী॥
চাঁচর চিকুর ছান্দে, কবরী টানিয়া বান্ধে,
বেড়ি নব মালতীর ফুল।
সরস কানন ছাড়ি, প্রলয়ে কবরী বেড়ী,
মধু-লোভে ভুলে অলিকুল॥
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দূর-ফোঁটা,
অধর জিনিল জবাফুলে।
ভুরুযুগ ধনুবর, তাহার কটাক্ষ শর,
রবি-শশি শোভে তার কোলে॥

রূপের এ বর্ণনা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত। এখানে কন্‌ভেন্‌শনাল বা তথাকথিত যুগ-প্রয়োগ-সিদ্ধ কতগুলো বিশেষণ, উপমা, রূপক এবং উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার হয়েছে, অর্থাৎ এখানে রচনা-কৌশল আছে কিন্তু জীবনের স্বাক্ষর নেই। জীবনের স্বাক্ষর নেই এ অর্থে যে, এ বর্ণনায়

খুল্লনার 'পরিচয়' নেই—তার জীবন-যাপন, আশা-আকাঙ্ক্ষা এখানে স্পষ্ট হয় নি। উপরন্তু কবি যে-জীবনকে আস্বাদন করেছেন, তার পরিচয়ও এ উদ্ধৃতিতে নেই। মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় মধ্যযুগের এ-অলঙ্কার-সচেতনতাকেই পাই। আমার কথাটিকে পরিষ্কার করবার জন্য আমি কয়েকটি উদাহরণ দেব—

১. চুড়ী কয়গাছি ক্ষণে ক্ষণে বাজে, ঝম্ ঝম্ বাজে মল
আধ-মুকুলিত উরস পরশি হার করে ঝল্‌মল্।
জোড়াভুরু আর অলকার মাঝে পঞ্চমী চাঁদ পাতা,
ডাগর চোখের সরল চাহনি অশ্রু-হাসিতে গাঁথা।
ফুল জিনি' নাসা পেলব নিখুঁত—নিশ্বাসে কেঁপে উঠে,
অতি পবিত্র চিবুক-ভঙ্গি, কি ভাষা ওষ্ঠপুটে!

॥ কিশোরী—স্বপন-পসারী ॥

এই উদাহরণটির সঙ্গে কবিকঙ্কনের উদাহরণটির কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই, সুতরাং মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। "উরু যুগ জিনি রামকলা" আর "ফুল জিনি নাসা" ক্ষেত্রভেদে একই অবাস্তবতার চিত্র।

২. মুকুতার সিঁথি খুলে রাখ, আজ বাঁধিও না কুন্তল,
কাজ নাই সখি, আঁখির কিনারে কুহকের কজ্জল।
সম্বরি বেশ বক্ষের বাস,
ঘুচাও মনের মহা মোহ-পাশ—
আজ রাখ সখি, মুকুলে মুদিয়া কমলের শতদল,
ত্যজ মঞ্জীর, মেখলা নীচের—মৃগমদ, কজ্জল।

॥ শেষ আরতি—স্মর-গরল ॥

এখানে গতানুগতিক শব্দ-প্রয়োগ অনুপ্রাসের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে একটি অস্পষ্ট, অসুস্থ বোধের পরিচয় এনেছে। বাস্তব সজীব-বোধরহিত কল্পনার ক্ষেত্রে কবি এক অসার্থক প্রেমাকুলতার চিত্র এঁকেছেন। কোনো চিত্রের সঙ্গেই কোনো চিত্রের সম্পর্ক নেই। বিচ্ছিন্নভাবে চুল বাঁধা, চোখে কুহকের কাজল দেওয়া, বক্ষবাস সম্বরণ করা এ সব কয়েকটি ছবি আছে, কিন্তু সবকিছু মিলে একটি বিশেষ কোনো উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না।

৩. বধূরে আমার দেখি নি এখনো, শুনেছি তার—
অপরূপ রূপ, চোখের চাহনি চমৎকার !
কাজলের রেখা আঁকা আঁখিপাতে,
'কাজল-লতা'টি ধ'রে আছে হাতে,
করমূলে বাঁধা লাল সূতা সেই—অলঙ্কার !
শুনেছি সে রূপ চমৎকার !
পরেছে বসন—বুঝি লাল চেলী, ডালিম-ফুলী ?
দুরু দুরু হিয়া—মণি-হার তায় উঠিছে দুলি'।
এয়োরা যখন শঙ্খ বাজায়
বধূ চমকিয়া ইতি-উতি চায়,
আকুল কবরী, রুখু-ভুখু চুল পড়িছে খুলি'—
হিয়া দুরু-দুরু উঠিছে দুলি'।
॥ মিলনোৎকণ্ঠা—স্মর-গরল ॥

কবি এখানে উৎকণ্ঠার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এর জন্য যে-আবেগ সৃষ্টির প্রয়োজন তা এখানে নেই। প্রিয়তমার সুসজ্জিত চিত্রের কল্পনাতেই উৎকণ্ঠার পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে চিত্র 'অপরূপ', 'চমৎকার' ইত্যাদি বিশেষণের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে আবেগের দিক থেকে সম্পর্কও নেই।

বার্নস্‌-এর একটি গান এখানে উদ্ধৃত করবো, যেখানে কল্পনার অতিরেকও একটি পূর্ণাঙ্গ-বোধের জন্য প্রয়োজন হয়েছে। একটি মধুর সুরঝংকার শিশিরে ভেজা নতুন ঘাসের মতো পেলবতা ও সজীবতার আভাস এনেছে। কোনো চিত্রই এখানে বিচ্ছিন্ন নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ উপলব্ধির প্রতীক, কেননা এখানে কবি-মন চেষ্টা করছে—'to realize itself in knowing itself'। গানটি এই—

O' my Luve's like a red rose,
That's newly sprung in June,
O' my Luve's like a melodie
That's sweetly play'd in tune.

As fair art thou my bonie lass
So deep in luve am I ;
And I will luv thee still my Dear,
Till a' the seas gang dry
Till a' the seas gang dry, my Dear ;
And the rocks melt wi' the sun ;
I will love thee still, my Dear,
While the sands o' life shall run ;
And fare thee weel, my only Luve !
And fare thee weel, a while !
And I will come again, my Luve,
Tho' it were ten thousand mile !

মহৎ কবিতা এটা নয় কিন্তু একে সুন্দর বলতে পারি, কেননা এখানে একটি স্নিগ্ধ উপলব্ধির পরিচয় আছে এবং সে পরিচয়টা সম্পূর্ণ। বর্ণনাটা বাক্‌চাতুরী নয়, কিন্তু কবির সরল বিশ্বাস ও আনন্দ থেকে উৎসারিত।

নজরুল ইস্‌লামের একটি গানেও এ-প্রকারের কল্পনার অমিতাচার আছে। কিন্তু সত্যিকারের আনন্দ এবং খেয়াল-খুশি থেকেই এ অমিতাচার জেগেছে। একে আমরা বাস্তবমুক্তি বলতে পারি। গানটি এই—

"মোর প্রিয়া হবে, এস রাণী
দেব খোঁপায় তারার ফুল।
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির
চৈতী চাঁদের দুল॥
কণ্ঠে তোমার পরাব বালিকা
হংস-সারির ঝুলানো মালিকা
বিজ্‌লি-জরীন্ ফিতায় বাঁধিব
মেঘ-রং এলোচুল॥
জ্যোৎস্নার সাথে চন্দন দিয়ে
মাখব তোমার গায়,

রামধনু হ'তে লাল রং ছানি
আল্‌তা পরাব পায়।
আমার গানের সাত সুর দিয়া,
তোমার বাসর রচিব গো প্রিয়া,
তোমারে ঘিরিয়া গাহিবে আমার
কবিতার বুল্‌বুল্‌ ॥”

এখানকার কল্পনা এবং আবেগ রোমান্টিক স্বপ্ন-সঞ্চয়ের মতো—নিষ্ফল এবং অসার্থক। কিন্তু এ নিষ্ফলতা এবং অসার্থকতাই এর সৌন্দর্য। সত্যিকারের সার্থক কবিতার নিদর্শন হিসেবে এর উল্লেখ আমি করি নি, কিন্তু কল্পনার অতিরেকেও-যে একটি পরিপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হতে পারে, সে কথাই বলছি। কবি-মনের একটি নিম্নগ্রামের বিশেষ চৈতন্যের ক্ষেত্রে এ-চিত্র বেশ স্পষ্ট এবং সে-কারণেই তা সত্য। আবেশ অথবা উপলব্ধির একটা সম্পূর্ণতা অথবা অভিজ্ঞতার সার্থক প্রকাশই আমরা কবিতায় আশা করি। এখানে অতিচারী কল্পনার একটা সম্পূর্ণতাবোধ বিদ্যমান। এ ধরনেরই আরও একটি নিদর্শন হিসেবে রবীন্দ্রনাথের একটি অতি পরিচিত গানের উল্লেখ করা চলে—

“চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে,
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো ॥
নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে, ধরায় শশী ছড়াও কি এ
ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণী বাসরপ্রদীপ জ্বালো।”

এ গানের মধ্যে জীবনের পরিচয় নেই, উপলব্ধির সার্থকত বলব না, কিন্তু কবিতা হিসেবে একে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা এখানে প্রকৃতির উপর ব্যক্তি-স্বরূপ আরোপ করে এবং রূপক-ব্যঞ্জনা এনে কবি যে-আনন্দের হিল্লোল এনেছেন, অবাস্তবতার

তার মুক্তি। এ আনন্দের হিল্লোল কতটা সম্পূর্ণ, তা বিচার করেই এ গানের মূল্য নিরূপণ করবো। বোধের এ সম্পূর্ণতা না থাকলে কবিতা-যে শব্দচাতুর্য মাত্র হয়ে পড়ে, তার নিদর্শন আমরা দেখিয়েছি।

একই ঘটনা বা চিত্র, পরিচর্যার পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির হতে বাধ্য। যেখানে বোধের সমগ্রতা আছে, সেখানে কল্পনা অতিচারী হয়েও মূল্যহীন হয় না; কিন্তু উপলব্ধি যেখানে বিক্ষিপ্ত এবং পূর্ণতার পরিকল্পনা যেখানে অংশ বা শাখা বিচার করে, সেখানকার বাস্তব প্রবৃত্তিও অসার্থক। মোহিতলাল মজুমদারের 'নারী স্তোত্র' কবিতাটি তত্ত্বগত কাব্যবোধের একটি চমৎকার নিদর্শন। দার্শনিক ব্যাখ্যার মতো এখানকার চিন্তা যুক্তিনির্ভর, তাই যুক্তির সফলতায় বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্তভাবে উজ্জ্বল হয়েছে, কিন্তু আনন্দের বোধ কোথাও সম্পূর্ণ নয়। একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি—

> "হের, ওই চলিয়াছে পথে নারী যৌবন-উন্মনা—
> অপাঙ্গে লালসা-লোল, স্মিত হাসি স্ফুরিছে অধরে;
> অধীর মঞ্জীর, তবু শ্রোণীভারে অলস-গমনা,
> বসনের তলে দুটি স্তনচূড়া এখনো শিহরে।
> কাংসঘটে গঙ্গাজল—সদ্যস্নাতা ফিরে যায় ঘরে,
> তপ্ততনু স্নিগ্ধ এবে, গেছে ক্লান্তি গত যামিনীর,
> নাই লজ্জা, নাই খেদ; মুগ্ধচিত মৃদু লীলাভরে
> যায় চলি—শুভ্র পক্ষ মরালী সে;—ত্যজি পঙ্ক নীর।
> অকুণ্ঠিত আনন্দের নির্ভয় মূরতি ও যে ভ্রষ্টা কামিনীর।"

এখানে একটি বিশেষ অবস্থার সংবাদ পাচ্ছি। নিশীথে যে-রমণী পুরুষের উপভোগ্যা ছিল তারই ঊষাকালীন মূর্তি কবি অঙ্কন করতে চেয়েছেন। কিন্তু মূর্তিটির পশ্চাদ্‌ভূমি নেই, গতির কথা আছে কিন্তু পরিচয় নেই—অনেকটা স্টিল লাইফের (still life) মতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ অবস্থারই পরিচয় দিয়েছেন এ ভাবে—

> "আজি নির্মলবায় শান্ত ঊষায় নির্জন নদীতীরে,
> স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে।

তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী বাঁশিতে উঠিছে বাজি
এই নির্মলবায় শান্ত উষায় জাহ্নবীতীরে আজি।
দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুররেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখা।
একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছ দেখা!"

এখানে সংবাদ নয়—পরিপূর্ণ উপলব্ধির পরিচয় আছে। এখানকার পশ্চাদভূমি শুধু উষার আবেশ নয় কিন্তু বাঙ্গালী জীবনের শান্তি এবং সৌভাগ্যও। মঙ্গল এবং শান্তির চিত্র এখানে সজীব এবং সার্থক হয়েছে উষার স্নিগ্ধভাবের পরিচয়ে এবং বাঙ্গালী রমণীর নির্মল জীবনের পরিচর্যায়। আমাদের জীবনে যে-সৌন্দর্য মুক্তির এবং আবিষ্কারের অপেক্ষায় থাকে, কবিতায় তার পরিচয়ই পাই। এদিক দিয়ে কবিতাও এক প্রকার আবিষ্কার কিন্তু এ আবিষ্কার হচ্ছে কবির আপন সংবেদন এবং অনুভূতির। যুক্তি-নির্ভর চিন্তা তত্ত্বে পরিণত হয়, কিন্তু কবিতা ব্যক্তি-হৃদয়ের আনন্দ বা বেদনাবোধের সঙ্গে জড়িত থাকে। মোহিতলালের উদাহরণটিতে এ আবিষ্কারের পরিচয় নেই—অনেকটা সৌন্দর্য-বিশ্লেষণগত তথ্য-পরিবেশনের পরিচয় আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উদাহরণটিতে সৌন্দর্য আবিষ্কৃত হয়েছে। মহৎ কবিতার ক্ষেত্রে এ আবিষ্কার কর্তেজের প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কারের মতো—

"...Like stout Cortez when with eagle eyes
He star'd at the Pacific—and all his men
Look'd at each other with a wild surmise—
Silent, upon a peak in Darien". (Keats)

পাঁচ

কাব্যের মহত্ত্ব নির্ণয় করবার পন্থা কি? কাব্য-পাঠকের স্মৃতির সমৃদ্ধ সঞ্চয় হচ্ছে কবিতার কোনো একটি চরণ বা বাক্যাংশ। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অনেক চরণ অসাবধান পাঠকের কাছেও স্মরণীয় হয়ে আছে লক্ষ করেছি। যেমন, "বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে," "সিন্দুর বিন্দু শোভিল গোধূলি-ললাটে, আহা। তারা-রত্ন যথা।" "ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?" এগুলোকেই অনেকে বলেন কবিতার অক্ষয় সম্পদ।

শুধুমাত্র ছন্দ বা ধ্বনির বিন্যাস বা শব্দের যাদুকরী কুহকের জন্যই-যে এগুলোর মাধুর্য, তা বলা চলে না। বিষয়বস্তু বা তত্ত্বের জন্যও নয়, কেননা অনেক ক্ষেত্রে তত্ত্বটি হয়তো খুবই সাধারণ। এ মাধুর্যের রহস্য হচ্ছে যে, প্রতিটি চরণে বা বাক্যাংশে আমরা দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন আবেগের সমন্বয় পাচ্ছি। যেমন—

ক. সিন্দুর-বিন্দু—গোধূলি-ললাটে…তারা-রত্ন

খ. ফুলদল দিয়া—শাল্মলী তরুবরে

প্রতিটি বাক্যাংশে গভীর উপলব্ধির প্রকাশ আছে, এবং দুইটি ভিন্ন বোধ বা আবেগের সংহতি আছে।

ঠিক এ ভাবে বিচার করলেই আমরা যে-কোনো সার্থক সনেটের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নিরূপণ করতে পারবো। সনেটের অষ্টকে বিভিন্ন সমান্তরাল আবেগের সমন্বয় থাকে—যে-সমস্ত আবেগ বর্ণে ও সুরে একাত্মক। ষট্‌ক অনুপূরক আবেগ এবং হয়তো বিরুদ্ধ আবেগকেও বহন করে। অষ্টক এবং ষট্‌কের অভিজ্ঞতার দুই বিরুদ্ধ বিভাব যে-পর্যন্ত না একটি পূর্ণাঙ্গ মানসিকতায় পরিণত হয়, সে পর্যন্ত সনেট সার্থক হয় না। এ পূর্ণাঙ্গ মানসিকতার সৃষ্টি সনেটের জন্য একান্ত প্রয়োজন। সনেটে এভাবেই আমরা একটি সুশৃঙ্খল সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতাকে পাই। সার্থক সনেটের নিদর্শন হিসেবে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের **Evening on Calais Beach** উল্লেখ করা চলে:

It is a beauteous evening, calm and free
The holy time is quiet as a Nun
Breathless with adoration ; the broad sun
Is sinking down in its tranquility ;

The gentleness of heaven is on the sea ;
Listen ! The mighty Being is awake,
And doth with his eternal motion make
A sound like thunder everlastingly.

Dear Child ! dear Girl ! that walkest with me here,
If thou appear untouch'd by solemn thought,
Thy nature is not therefore less divine :
Thou liest in Abraham's bosom all the year ;
And worship'st at the Temple's inner shrine.
God being with thee when we know it not.

অষ্টকে যে মাহাত্ম্য এবং গাম্ভীর্যের ভাব আছে, ষট্‌কের ভাবটি তার বিপরীত। ষট্‌কে একটি শ্লেষের পরিচয় আছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সম্পূর্ণ সনেটে কোনো ভাবদ্বৈত নেই। চিন্তাহীন সরল বালিকাটিও অষ্টকের ভাব এবং পরিকল্পনার গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। অভিজ্ঞতার নতুনত্ব এবং বিভিন্ন বিরুদ্ধ আবেগের আশ্চর্য সুকুমার সংহতি সনেটটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।

এ প্রকারের আশ্চর্য সমন্বয়ের পরিচয় কীট্‌স্‌-এর একটি সনেটে আছে— **Last Sonnet**। অষ্টকে প্রকৃতির নিত্যপরিবর্তনশীল রূপের উপর আকাশের স্থির তারকার নির্ণিমেষ দৃষ্টিকে অবলম্বন করে কবি যে-মানস-কল্পনা করেছেন, ষট্‌কে তার বিপরীত একটি সাধারণ আবেগ অবলম্বিত হয়েছে। ষট্‌কে জনৈকা নারীর প্রতি একজন বেপথু ম্রিয়মাণ পুরুষের ভালোবাসার পরিচয় এবং সেই সঙ্গে তার বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। যে-কোনো লোকের হাতে ষট্‌কের আবেগটি অকিঞ্চিৎকর উচ্ছ্বাসে পরিণত হতো, এবং প্রথম মহান আবেশের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশের ইন্দ্রিয়-অনুভূত প্রণয়ের সমন্বয়

হতো না। এখানে তা সম্ভব হয়েছে তার কারণ, উপরের আকাশের তারা এবং পায়ের তলার পৃথিবী কবির অনুভূতির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সব কিছু তাঁর অভিজ্ঞতার বুনটের মধ্যে মিশে গিয়েছে—

Bright star ! would I were steadfast as thou art—
Not in lone splendour hung aloft the night,
And watching with eternal lids apart
Like Nature's patient sleepless Eremite,
The moving waters at their priestlike task
Of pure ablution round earth's human shores,
Or gazing on the new soft fallen mask
Of snow upon the mountains and the moors.

No—yet still steadfast still unchangeable,
Pillow'd upon my fair love's ripening breast,
To feel for ever its fall and swell,
Awake for ever in a sweet unrest,
Still, still to hear her tender-taken breath,
And so life ever—or else swoon to death.

এভাবে বিভিন্ন বিরোধী আবেগের সমন্বয়েই কবিতা শ্রেষ্ঠ বা মহৎ হয়। শেলী অনেকটা আচ্ছন্ন ভাষায়, একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ আবেগের সংস্থিতিকে কবি-কল্পনা নামে আখ্যাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "এ ক্ষমতা উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে আনন্দোচ্ছ্বাস এবং সংশয়কে, বেদনা এবং তৃপ্তিকে, অনন্ত এবং পরিবর্তনকে।" (It marries exultation and horror, grief and pleasure, eternity and change, it subdues to union under its light yoke, all irreconcilable things)। কোলরিজ এ ক্ষমতাকে স্পষ্টতর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সাহিত্য-চরিতাখ্যান গ্রন্থে (Biographia Literaria)—

"The poet, described in ideal perfection brings the whole soul of man into activity with the subordination of its

faculties to each other according to worth and dignity. He diffuses a tone and spirit of unity that blends and (as it were) fuses, each into each, by synthetic and magical power, to which I would exclusively appropriate the name of Imagination. This power, first put in action by the will and understanding and retained under their irremissible, though gentle and unnoticed, control, reveals itself in the balance or reconcilement of opposite or discordant qualities of sameness with difference; of the general with the concrete; the idea with the image; the individual with the representative; the sense of novelty and freshness with old and familiar objects; a more than usual order; judgment ever awake and steady self-possession with enthusiasm and feeling profound or vehement; and while it blends and harmonizes the natural and the artificial, still subordinates art to nature; the manner to the matter; and our admiration of the poet to our sympathy with the poetry."

মনে রাখা দরকার যে অনেক সময় বিভিন্ন বিরোধী ভাবের সমন্বয়ে নিছক বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পায় মাত্র। শুধুমাত্র সমন্বয় সাধিত হলেই কবিতা মহৎ বা শ্রেষ্ঠ হয় না। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে নতুনত্ব থাকতে পারে, কল্পনার প্রশ্রয়ও থাকতে পারে, কিন্তু তা কবিতাকে মহৎ করে না। এ সমস্ত কবিতায় চাতুর্যও থাকে, স্মরণযোগ্যও হয়। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র কবিতাগুলো এ ধরনের। যেমন—

"অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম আমি,
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি॥"

শেষ চরণের আকস্মিকতা অনেকটা চকিত দীপ্তির মতো। একে অপরূপ বলবো, কিন্তু মহৎ বলবো না। এ অপরূপত্ব সাধিত হয়েছে

আকস্মিকতার জন্য। কিন্তু বাগ্‌বৈদগ্ধ্যই এর প্রাণ। এর মধ্যে অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির সঞ্চয় নেই। এর সঙ্গে 'স্ফুলিঙ্গ'-এর একটি কবিতার তুলনা করছি—

"বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি, বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু॥"

এখানকার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য (wit) আমাদের আনন্দ দেয় তার একান্ত অনিবার্যতার জন্যই নয়, কিন্তু বিভিন্ন ভাবের মিতালীতে আবেগের-যে একটি ঐক্য সাধিত হয়েছে সেজন্য। অনেক ক্ষেত্রে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য কবিতায় জড়তা সৃষ্টি করে। অভিজ্ঞতার উপাদানগুলি বিচ্ছিন্ন থাকে, এবং সেগুলি একটি সম্পূর্ণ বোধের পরিচয় বহন করে না। নজরুল ইসলামের 'অ-নামিকা' কবিতাটি বিভিন্ন অস্ফুট আবেগের পরস্পর সমান্তরাল অবস্থিতির একটি সুন্দর নিদর্শন।

আবার কোন কবিতা, সকল কবিতা-পাঠকের কাছে প্রিয় হলেই-যে শ্রেষ্ঠ হবে, এমন কথা বলা চলে না। হয়তো তার সুর অন্তরঙ্গ, যা যে-কোনো কাব্য-সমালোচককে নিরস্ত করতে পারে, কিন্তু এ অন্তরঙ্গতাই-যে তার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হবে, এ-ও কোনো কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের "ফাঁকি" কবিতাটির উল্লেখ এ উপলক্ষে করতে চাই। কবিতাটিতে একটি করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পভাগ অত্যন্ত সাধারণ। একটি মেয়ে স্বামীর সঙ্গে চলেছে হাওয়া-বদল করতে। বিলাসপুর স্টেশনে তাদের গাড়ি থেকে নামতে হল। কিছু পরে অন্য গাড়িতে উঠতে হবে। এ সময়টায় একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে বিনুর কাছে টাকা-পঁচিশেক সাহায্য চাইল। বিনু তার স্বামীকে অনুরোধ করল এ টাকাটা দিয়ে দিতে। স্বামী প্রতিশ্রুত হয়েও

শেষপর্যন্ত মাত্র দু'টি টাকা দিয়ে কুলি মেয়েটিকে বিদায় দিল। এর পরের অবস্থাটি এই—

"জীবন-দেউল আঁধার করে নিবলো হঠাৎ আলো।
ফিরে এলেম দুমাস যেই ফুরালো।
বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি,
একলা আমি,
শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধূলি
বিনু আমায় বলেছিল, 'এ জীবনের যা-কিছু আর ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথির 'পরে নিত্য সিঁদুর-সম
এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে,
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।'

ওগো অন্তর্যামি,
বিনুরে আজ জানাতে চাই আমি,
সেই দু'মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি—
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।
দিই যদি রুক্মিনিরে লক্ষ টাকা
তবুও তো ভরবে না সেই ফাঁকা।
বিনু যে সেই দু'মাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে—
জানল না তা ফাঁকিশুদ্ধ দিলেম তারই হাতে॥

বিলাসপুরে নেমে আমি শুধাই সবার কাছে,
'রুক্মিনি সে কোথায় আছে।'
প্রশ্ন শুনে অবাক মানে—
রুক্মিনি কে তাই বা ক'জন জানে।
অনেক ভেবে 'ঝামরু কুলির বউ' বললেম যেই—
বললে সবে, 'এখন তারা এখানে কেউ নেই।'
শুধাই আমি, 'কোথায় পাব তাকে?'
ইষ্টেশনের বড়োবাবু রেগে বলেন, 'সে খবর কে রাখে।'

টিকিটবাবু বললে হেসে, 'তারা মাসেক আগে
গেছে চলে দার্জিলিঙে কিংবা খসরুবাগে,
কিংবা আরাকানে।'
শুধাই যত, ঠিকানা তার কেউ কি জানে?
তারা কেবল বিরক্ত হয়, তার ঠিকানায় কার আছে কোন্ কাজ।
কেমন করে বোঝাই আমি—ওগো, আমার আজ
সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন,
ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন।
'এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে'
বিনুর মুখের শেষ কথা সেই বইব কেমন করে।
রয়ে গেলাম দায়ী
মিথ্যা আমার হল চিরস্থায়ী॥"

কবিতাটি করুণ। অভিজ্ঞতার যে-সমস্ত উপাদানে এ করুণতা সৃষ্টি হয়েছে, তার গভীর কোনো আবেদন নেই। করুণা এবং সহানুভূতির একটি সহজ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেকটা সেন্টিমেন্টাল। নিরঙ্কুশ কবি-কল্পনার চরমোৎকর্ষ এখানে সম্ভব নয়, কেননা এখানকার হৃদয়াবেগের উপাদানঃ সব মুহূর্তেই সব জায়গায় পাওয়া যাবে। উপরন্তু মানুষের সমস্ত অন্তরাত্মা এখানে সজীব এবং চঞ্চল হয়ে ওঠে নি।

সমস্ত অন্তরাত্মাকে কর্মচঞ্চল এবং সজীব করা শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ। একক এবং সাধারণ আনন্দের দিঙ্‌মণ্ডলে এর পরিক্রমা নয় অথবা মানস-লোকের সীমাবদ্ধ লঘু চাঞ্চল্য নিয়েও এর জাগরণ নয়। মানুষের প্রতিদিন-কার অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার চাইতেও, যে-অভিজ্ঞতা শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপাদান, তার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা অসাধারণ। মহৎ কবিতার অভিপ্রায় বা প্রত্যয় অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠত্বের জন্যই মূল্যবান।

মহৎ কবিতায় মানবজীবনের মাত্র কোনো একটা বিশেষ দিকের পরিচর্যা থাকে না। সেখানে মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কর্মচঞ্চল রূপ পাই। এ-পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা বুঝি চিৎপ্রকর্ষের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা, মনন, সংবেদন এবং অনুভূতির সম্মিলিত সজাগ বিকাশ।

কবিতার তত্ত্ব বা মূল ভাব বা বক্তব্য অভিজ্ঞতাকে রূপ দেবে না,

কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকেই তা উৎসারিত হবে। এ বক্তব্য বিশিষ্ট হবে কিন্তু মানসিক দক্ষতার সম্পূর্ণ প্রয়োগ থেকেই যে-বিশিষ্টতা নির্ণীত হয়, তা আমাদের মনে রাখা দরকার। যৌক্তিক বিন্যাসের জন্যই কোনো কবিতা শ্রেষ্ঠ হয় না। কবিতার যৌক্তিকতা জীবনের জন্য, এবং এ জীবনের পরিচয় কোনো বিশিষ্ট মনের, বা বলা যেতে পারে মহৎ মনের নিঃসংশয় উপলব্ধিতে। কবিতার মূল ভাব কোনো নির্ণয়-যোগ্য বস্তু নয়, যাকে কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধিই হচ্ছে কবিতার মূলীভূত তত্ত্ব, তাই কবির অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত করেই কাব্য-ব্যাখ্যা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের 'দায়মোচন' (মহুয়া) কবিতাটির অর্থগত সুন্দর পারম্পর্য এবং যৌক্তিক বিন্যাস আছে। আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না যে, এখানে তত্ত্বকে কাব্যভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ; কবিতাটি গভীর কোনো উপলব্ধির প্রকাশ নয়। জীবনের ছন্দ এবং ধ্বনি থেকে বক্তব্য উৎসারিত হয় নি। বিশেষ একটি তত্ত্বের সম্প্রসারণ এবং ব্যাখ্যা ব্যপদেশে কবিতাটি সুকৌশলে নির্মিত হয়েছে বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ শেষ স্তবকটি উদ্ধৃত করছি—

"দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
বরমাল্যের অপমানে,
যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার,
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে।
প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি—
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাইনি বড়ো সেই নয়,
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়॥"

কিন্তু 'উদ্বৃত্ত' (সানাই) কবিতাটি একটি উপলব্ধিকে ব্যক্ত করছে। এখানকার তত্ত্বের প্রতি নির্দেশ করা যায় না—জীবনযাপনের মধ্যে এবং অভিজ্ঞতার মধ্যেই এ তত্ত্বের স্ফূর্তি। কবিতাটি এই—

"তব দক্ষিণ হাতের পরশ
কর নি সমর্পণ।
লেখে আর মোছে আলোছায়া তব
ভাবনার প্রাঙ্গণে
খনে খনে আলিপন ॥
বৈশাখে কৃশ নদী
পূর্ণ স্রোতের প্রসাদ না দিল যদি,
শুধু কুণ্ঠিত বিশীর্ণ ধারা
তীরের প্রান্তে
জাগালো পিয়াসী মন ॥
যতটুকু পাই ভীরু বাসনার
অঞ্জলিতে
নাই বা উচ্ছলিল,
সারা দিবসের দৈন্যের শেষে
সঞ্চয় সে যে
সারা রজনীর স্বপ্নের আয়োজন ॥"

আরও উন্নত পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কাব্যের নিদর্শন হিসেবে 'কিং লিয়র'-এর উল্লেখ করছি। লিয়র বেদনা ও বিতৃষ্ণায় পাষাণ পৃথিবীর বিরুদ্ধে আক্ষেপ এবং অভিযোগ প্রকাশ করছে। অভিযোগ এজন্য যে, দুর্বৃত্ত এখানে সামর্থ্যবান হচ্ছে, এবং ন্যায়নিষ্ঠার পরাভব ঘটছে। এ কাব্যের ভাবসম্পদ মহান, কেননা এখানকার অভিজ্ঞতা গভীর; এবং অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির গভীরতা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্যই এ কাব্যটি পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্যাদা পেয়েছে। দুর্দশা ও লাঞ্ছনায় যে অশক্ত হয়েছে,—চরম বিপর্যয়ের মুখে সে বিধাতার বিরুদ্ধে আক্রোশ প্রকাশ করেছে। তার বিরুদ্ধতার ভাষা গভীর উপলব্ধির ধ্বনিমাহাত্ম্যে কম্পমান। আমরা এখানে কোনো যুক্তিকে অনুসরণ করি না, কিন্তু বেদনা-লাঞ্ছিত হৃদয়ের চরম আক্ষেপ ও হতাশ্বাসকে অনুসরণ করি। লিয়র তার অভিযোগকে উপস্থিত করছে—

"Howl, howl, howl, howl ! Oh ye are men of stone :
Had I your tongues and eyes, I'd use them so
That heaven's vaults should crack".

অথবা—

"No, no, no life !
Why should a dog, a horse, rat have life
And thou no breath at all ? Thou'lt come no more,
Never, never, never, never, never !"

এখানে বিতৃষ্ণা, হাহাকার এবং অভিযোগ মহৎ কাব্যসৃষ্টির উপায় হয়েছে। এখানে নির্বিবাদে ভাগ্যকে এবং জীবনের স্বপ্ন-ভঙ্গকে মেনে-নেওয়া নেই—এখানে আবেগময় বিরুদ্ধতা এবং প্রতিবাদ রাত্রির ঝড়জলের উদ্দামতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সে অভিজ্ঞতাই অসাধারণ, যা নিশ্চিন্তে গ্রহণ করে না, স্বীকার করে না, এবং সর্বনাশকে বিনা বিরুদ্ধতায় সহ্য করে না। 'কিং লিয়র'-এর মধ্যে সে অভিজ্ঞতার স্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। তাই 'কিং লিয়র' মহৎ কাব্য। যিনি বাইবেলে জব (Job) নামে খ্যাত, অসামান্য বেদনা, অপরিসীম লাঞ্ছনার মধ্যে দুর্দশাকে ভূষণ করেই তাঁর জাগরণ এবং মুক্তি। যে-বিধাতাকে তিনি ভেবেছিলেন অন্তরঙ্গ, সীমাতীত নির্যাতন এসেছে তাঁর কাছ থেকেই। প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই তাঁর সান্নিধ্যে তিনি এলেন যুবরাজের মতো—

"Lo, here in my signature, let the Almighty answer me ;
And that I had the indictment which
mine adversary hath written,
Surely I would carry it upon my shoulder ;
I would bind it unto me as a crown !
I would declare unto him the number of any steps ;
As a prince would I go near him."

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ আমাদের অন্তরাত্মা নতুন সৃষ্টির উন্মেষ অনুভব করে, কর্মচঞ্চল প্রাণময়তায় হৃদয় জেগে উঠে। এখানে আমরা মানব-

জীবনের বিশিষ্ট কোনো দিকের পরিচর্যা পাই না। কিন্তু তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে কর্ম-চঞ্চল অবস্থায় দেখি। ব্যক্তিত্বের এ সম্পূর্ণতা বুদ্ধি, ইচ্ছা, অনুভূতি এবং আবেগকে অবলম্বন করেই—মানুষের কোনো একক প্রয়োজন সাধনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণতা ঘটে না। একটা বিশেষ কোনো সমর্থন নিয়ে কাব্যটি বিকশিত হয়েছে বলা চলে না। সে প্রকারের কোনো সমর্থনই এখানে নেই। এখানে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে সম্পূর্ণ জীবনের। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' বা নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'-এর মধ্যে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস, নৈমিত্তিক আচার এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর আবেগ-নির্ভর জাতীয়তাবোধের সমর্থন আছে। সমর্থনটাই সে-সব ক্ষেত্রে প্রবল এবং প্রাথমিক। এ-কয়টি কাব্যে আমরা তাই সম্পূর্ণ জীবনকে পাওয়া তো দূরের কথা, জীবনের অংশবিশেষকেও পাই না। পাই, সীমাবদ্ধ জগতে স্থূল আদর্শের গুরুত্ব নির্ধারণ। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে, কবির জীবনোপলব্ধির পরিপূর্ণতা। গোটে ফাউস্ট সম্পর্কে বলেছিলেন যে, ফাউস্ট নাটকে তাঁর বেদনার বাণী, অপরিচিত ক্ষেত্র থেকে প্রশংসা এনেছে; এবং এ প্রশংসা তাঁকে ভীতি-বিহ্বল করেছে। তাঁর স্নায়ুতে কম্পন জেগেছে এবং তিনি ক্রন্দন করেছেন। নতুন প্রাণোন্মাদনায় মাইকেলের স্নায়ুতে কি কম্পন জাগে নি? জীবনের জটিলতা তাঁকে জীবনের বিস্তৃতির এবং বলিষ্ঠতার পরিচয় দেবার সুযোগ দিয়েছে। বিতৃষ্ণা, বেদনা, অশেষ আশা, লাঞ্ছনা, নিষ্ফলতা, সংশয় এবং দ্বন্দ্ব এ কাব্যকে মহিমামণ্ডিত করেছে। গীতিকাব্যের সংক্ষিপ্ত আকুলতা এবং সৌকুমার্য মধুর এবং সুন্দর! কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর ঔজ্জ্বল্য, ব্যাপ্তি এবং নিঃসংশয় জীবন-প্রতিষ্ঠা অসাধারণ এবং অতুলনীয়।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর বিভিন্ন অধ্যায়ে মহৎ কাব্যের লক্ষণ পরিস্ফুট। প্রথম সর্গে সমুদ্রকে লক্ষ করে বীরকুলোদ্ভব রাবণ অভিমান এবং আক্ষেপ প্রকাশের মধ্যে জীবনের ক্ষণকালীন বৈকল্যের পরিচয় যেমন দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পরিহাস ও ব্যঙ্গোক্তি এবং অপবাদ দূরীকরণার্থে আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেদনের মধ্যে জীবনের পূর্ণতার পরিচয়ও তেমন দিচ্ছে। যে-সমস্ত উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে এ পূর্ণতার পরিচয় পাচ্ছি, তাদের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য, গতি এবং বলিষ্ঠতা মূর্ত হয়েছে। একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে—

"অধম ভালুকে—
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?"

রাবণের উক্তির আরম্ভে আমরা পাচ্ছি—"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ।" এখানে 'সুন্দর' শব্দটি সাধারণ বিশেষণ মাত্র নয়। রাবণের তৎকালীন মানসিক অবস্থার পরিচয়, সে অবস্থার বৈপরীত্য-বোধের মাধ্যমে, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম সর্গের অন্যত্র বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদে রাবণের খেদোক্তি মহৎ কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। শক্তিধর নায়ক আপন সর্বনাশকে প্রত্যক্ষ করছে কিন্তু সর্বনাশকে রোধ করবার সামর্থ্য তার নেই। সম্ভাব্য প্রলয়ের সম্মুখীন হয়েও সে অকম্পিত পদে মৃত্তিকার উপর দণ্ডায়মান থাকতে চায়। রাবণের আত্ম-বিশ্লেষণের মধ্যে ভাগ্যের নির্মমতা ও তার অসংশয় প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই—

"কুসুমদামসজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী।"

চিত্রাঙ্গদার কাছে রাবণ স্পষ্টভাবেই বলছে—"বিধি প্রসারিছে বাহু বিনাশিতে লঙ্কা মম।" সর্বনাশকে জ্ঞাত হয়েও যুদ্ধের জন্য তার পুনঃপ্রস্তুতি একই সঙ্গে ভয়াবহ এবং করুণ—

"যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম, বা হবে ভব আজি!

সর্বশেষে স্তুতিপাঠকের আশ্বাসবাণী, বিপর্যয়ের প্রারম্ভে ভাগ্যকে অস্বীকার করে জীবনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ জীবনের প্রকাশ দ্বন্দ্বের মধ্যে, সর্বনাশের মধ্যে, এবং কোলাহল ও আবর্তকে অবলম্বন করে সর্বশেষ বিলয়ের মধ্যে। 'কিং লিয়র' নাটকে এড্‌গারের উক্তি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য: "মানুষ এ পৃথিবীতে তার আগমন এবং পৃথিবী থেকে অন্তর্ধানকে সমভাবেই সহ্য করবে; পরিপূর্ণতাতেই জীবনের সমৃদ্ধি এবং মূল্য।" (**Men must endure their going hence, even as their coming hither: Ripeness is all**)। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ আমরা পরিপূর্ণ জীবনোপলব্ধি এবং জীবনযাপনের পরিচয় পাই। তাই 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহৎ কাব্য।

মাইকেলের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করতে গিয়ে আমরা প্রধানতঃ এ কথা বলতে পারি যে, তিনি তাঁর যুগে জাতির পূর্ণ সচেতন মুহূর্তে বর্তমান ছিলেন। যে-মুহূর্তে জাতির মানস-বিকাশ ঘটে, সে-মুহূর্তকে তিনি রূপ দিয়েছেন। মানব-অভিজ্ঞতার উপাদানগুলি যে-কোনো যুগে অতি অল্প-সংখ্যক লোকের কাছে ধরা পড়ে; শ্রেষ্ঠ কবি সে অল্পসংখ্যকদেরই একজন। তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জনের বা উপলব্ধির ক্ষমতা প্রকাশ-ক্ষমতা বা উপলব্ধি-পরিবেশনের ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তার কারণ, যা তিনি অনুভব করেছেন, তা প্রকাশ করবার জন্য শব্দ-প্রয়োগের বিশেষ ক্ষমতাকে তাঁর অনুভূতির সচেতনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। তিনি কবি, কেননা আপন অভিজ্ঞতার প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং কৌতূহল, শব্দের প্রতি তাঁর অনুরাগ থেকে অনবচ্ছিন্ন। শব্দের বিশিষ্ট ধ্বনিদ্যোতনা এবং আহ্বান-ক্ষমতা দ্বারা তিনি আপন চিন্তা এবং বোধকে সুতীক্ষ্ণ করেন, এবং এ-ভাবেই শব্দ তাঁর অনুভূতি প্রকাশের প্রতীক হয়। কবিতা এ-ভাবেই আমাদের অভিজ্ঞতার স্বরূপকে যথার্থ এবং সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। কবিতা ছাড়া অন্য কোনো শিল্পের মাধ্যমে এতটা সূক্ষ্ম ও যথার্থভাবে আমাদের উপলব্ধিকে প্রকাশ করা যায় না।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ বিচিত্র উপমাসম্ভার উপমেয়কে সূক্ষ্ম, গভীর এবং স্পষ্ট করবার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে এ সমস্ত উপমাকে সমৃদ্ধ ব্যাখ্যাবাচক আখ্যা দিতে পারি। কবির দৃষ্টি বস্তুকে অতিক্রম করে নি এক মুহূর্তের জন্যও। বস্তুর প্রতি কবির নির্নিমেষ লক্ষ্য, বস্তুর প্রকৃতি, গতি

এবং প্রাণধর্মকে সুস্পষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে হৃদয়াবেগ এবং গীতিময় প্রাণোচ্ছলতায় উপমার যে-অস্পষ্ট মধুরতা আমরা লক্ষ করি, মধুসূদনের কাব্যে সে অস্পষ্টতার চিহ্নমাত্র নেই।

'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।"

উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে এখানে আবেগময় অস্পষ্ট সম্বন্ধ-বন্ধন ঘটেছে। বিচ্ছিন্নভাবেও উপমান এবং উপমেয় উভয়ই রহস্য-সম্পৃক্ত—তীক্ষ্ণ এবং সুব্যক্ত নয়। উপমা এখানে প্রগাঢ় নয় কিন্তু প্রসর্পী। আমরা যতটুকু দেখছি তার মধ্যে আরও একটা রহস্যময় দেখার সংযোগ ঘটেছে। উপমা এখানে তাই পরিপূর্ণরূপেই মোহময়। অন্য পক্ষে মধুসূদনের উপমা প্রগাঢ়, সুতীক্ষ্ণ এবং সুব্যক্ত। তাঁর কল্পনা এবং বোধের মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নেই। কয়েকটি উদ্ধৃতি মাত্র দিচ্ছি—

"হায়, দেবী, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমূলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ে যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল—
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে।"

অথবা—

"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী, সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানব-নন্দিনী আমি রক্ষঃকুলবধূ;

পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?"

অথবা—

"যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে
অগ্নিময় দশদিশ , দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভারাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদপুঞ্জে।"

অথবা—

"বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মন :
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।"

অথবা—

"অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে।"

প্রথম উদ্ধৃতিতে রাক্ষস-সৈন্যদের নিধনকে স্পষ্ট করবার জন্য বায়ুর তাড়নায় বিক্ষিপ্ত তুলারাশির সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। যে-সমস্ত বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অবহিত, সেগুলোকেই কবি উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এ কারণে উপমেয় সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। কোথাও কুহেলিকা বা অস্পষ্টতার চিহ্নমাত্র নেই। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে প্রমীলা আপন লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সর্বপ্রকার বাধাকে উন্মূল করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিচ্ছে। সর্বশেষ উদ্ধৃতিতে রামচন্দ্রের আক্রমণকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে—বৃষস্কন্ধে ব্যাঘ্রের আক্রমণের সঙ্গে তার তুলনা করে। উপমানের অর্থব্যক্তির জন্য পাঠককে অপেক্ষা করতে হয় না, কবি সর্বপ্রকারে উপমানকে ব্যাখ্যা করেছেন। এ কারণেই মধুসূদনের উপমাকে বলা হচ্ছে প্রগাঢ় বা সান্দ্র, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ইন্‌টেন্‌সিভ।

দান্তে তাঁর নরক বর্ণনার একস্থানে, নরকের জনতা অস্পষ্ট আলোতে তাঁকে দেখবার চেষ্টা করছে, এ-অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন, 'এবং সুতীক্ষ্ণ করলো তারা তাদের দৃষ্টিকে, ভুরু ঘন করলো, যেমন করে বৃদ্ধ সীবনকারী সূচের ছিদ্র লক্ষ করে, অথবা যেমন করে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয়, যখন আকাশে নতুন চাঁদ দেখা দেয়, পথচারীরা একে অন্যকে লক্ষ করে'—

"Hurrying close to the bank, a troop of shades
Met us, who eyed us much as passers-by
Eye one another when the daylight fades
To dusk and a new moon in the sky,
And knitting up their brows they squinted at us
Like an old tailor at the needle's eyes".

(অনুবাদ : **Dorothy L. Sayers**)

কবিতায় যে-অভিজ্ঞতার পরিচয় স্পষ্ট হয়, তা একই সঙ্গে এক মুহূর্তের এবং চিরকালের। মানব-জীবনের যে-কোনো প্রগাঢ় অনুভূতির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। প্রথম মুহূর্তে এ অনুভূতিকে মনে হয় অনবদ্য হয়তো বা আকস্মিকতা এবং ভীতিবিহ্বলতায় পরিপূর্ণ। এ মুহূর্ত বিস্মৃত হবার নয়, কিন্তু এ অনুভূতির পুনরাবির্ভাব ঘটে না। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, আমাদের জীবনের বৃহত্তর অভিজ্ঞতার মধ্যে এ অনুভূতি যদি জাগ্রত না হয়, তবে তার বিশিষ্টতা রক্ষিত হবে না। এখানে জাগ্রত হবার অর্থ হচ্ছে, আমাদের অন্তর্গূঢ় চেতনার মধ্যে সর্বমুহূর্তে প্রাণবন্ত থাকা। অধিকাংশ কবিতাকে আমরা অতিক্রম করে আসি, যেমন আমরা অতিক্রম করি আমাদের অনেক আবেগকে ; কিন্তু এমন অনেক কবিতা আছে, যার উপলব্ধি ও অনুভূতির ক্ষেত্রে উপনীত হবার জন্য আমাদের সাধনা করতে হয়। সে কবিতাই মহৎ কবিতা। তা উদ্ভূত হয়—

From the soul with elemental force
To hold its sway in every listening heart.

(গ্যেটে—ফাউস্টের উক্তি)

পৃথিবীতে যে-সমস্ত বস্তু একজন শিল্পীর চোখে পড়ে অথবা উপলব্ধিতে জাগে, যা তাকে বেদনা দেয় এবং যা তার সামনে সমস্যার মতো, শিল্পী তার সম্মুখীন হবেন এবং এ ভাবেই জীবনের সঙ্গে তিনি সংগ্রামে রত হবেন। কোনো কিছু না হারিয়ে কোনো কিছুকে অস্বীকার না করে, নির্যাতন সহ্য করে কিন্তু তাকে অতিক্রম করবার কুশলতাকে নির্মাণ করে একজন শিল্পী মহৎ হবেন। যারা শিল্পকে শুধু গুরুতর মূল্য দিয়েছে কিন্তু জীবনকে দেয় নি তাদের পক্ষে মহৎ কিছু সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু মহৎ শিল্পী তাঁরাই হতে পারেন যাঁরা জীবনের প্রতিটি বিরাট সমস্যার সাক্ষী হিসেবে থাকেন, তাঁরা সকলের সঙ্গে এক হয়ে তাঁদের দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাঁদের এবং কালের সকল সংঘর্ষকে লক্ষ করেন এবং সর্বত্র নিজেদের স্বাক্ষর রাখেন। তাই তাঁরা সকল কালের মানুষের অনেক নিকটে। এভাবে শেক্সপীয়র, প্রুস্ত, বোদলেয়র, দান্তে চিরদিনই পৃথিবীর মানুষের সমসাময়িক।

আমরা এ পৃথিবীতে প্রকৃতি, ঘটনা, ইতিহাস বা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বাস করি। আমাদের একাকী কোনও অস্তিত্ব নেই। আমাদের চিন্তাও আমাদের মানসলোকে বিভিন্ন সম্পর্কের বিচিত্র প্রতিবিম্ব। কণ্ঠে উচ্চারিত ধ্বনি, দৃষ্টিতে গৃহীত চিত্রছায়া, চিন্তার জন্য চিত্তে স্মৃতির অবলম্বন—আমাদের সঙ্গে ধরিত্রীর বিভিন্ন সম্পর্কেরই বিকাশ। যথার্থ কবি যিনি, তিনি এ সত্য সর্বমুহূর্তেই উপলব্ধি করেন। এ জীবনে আমাদের যে-উপার্জন তা আমাদের বিভিন্ন সম্পর্কেরই সঞ্চয়। প্রকৃতির সঙ্গে যে-সম্পর্ক তাতে আমরা পাই নিশ্বাস, আলো, তাপ এবং স্নায়ুর সজীবতা; মানুষের সঙ্গে যে-সম্পর্ক তাতে আমরা পাই মমতার উচ্চারণ এবং ইতিহাসের সঙ্গে যে-সম্পর্ক তাতে আমরা পাই বুদ্ধি, চিন্তা এবং যুক্তি। আমাদের প্রতিদিনের কর্ম, এ-সকল সম্পর্কের উপলব্ধিতে নিয়ন্ত্রিত। এ-সকল সম্পর্কের উপলব্ধির পরিচয় আফ্রিকার জনৈক সোমালী কবি অতি সুন্দরভাবে দিয়েছেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলছেন—

"গলায় ঘণ্টাবাঁধা যে উটগুলো পালিয়ে যাচ্ছে
তাদের মতো,
অথবা শিশু থেকে বিচ্ছিন্ন মাতার মতো,

অথবা তাঁবু তুলে নিয়ে কারা অপরিচিত
পথে যাত্রা করছে তাদের মতো,
অথবা সেই কুয়োটির মতো যার
পাড় ভেঙে পড়েছে,
অথবা নদীটির মতো যে তার তীরভূমি
বন্যায় প্লাবিত করেছে,
অথবা একাকিনী বৃদ্ধার মতো যার
একমাত্র সন্তান নিহত হয়েছে,
অথবা দল বেঁধে সাড়া তুলে
মৌমাছিদের ফিরে আসার মতো,
গতরাত্রে আমার বেদনা-জর্জরিত কণ্ঠস্বরে
সমস্ত তাঁবু থেকে ঘুম হারিয়ে গেল।"

কবির অবলোকনকে আমরা সম্পূর্ণ অবলোকন বলি, কেননা তার পাতের মধ্যে চিত্ত, নয়ন-প্রসাদ, রূপ এবং আলোক এ-কয়টি প্রত্যয় সম্মিলিত হয়। নয়ন-প্রসাদ ছাড়া রূপ দর্শনে চিত্ত অক্ষম, আবার চিত্তের উপলব্ধি ছাড়া নয়ন একাকী রূপ দর্শন করতে পারে না। শুধুমাত্র নয়নকে আশ্রয় করে স্মৃতি-অস্মৃতি, কুশল-অকুশল কোনো কর্মই হয় না। দর্শন, শ্রবণ আঘ্রাণ, স্পর্শন, আস্বাদন এবং সকল প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে চিত্তের মনন-কৃত্য সম্মিলিত হয়ে যে-উপলব্ধিকে জাগ্রত করে তাই হল একজন কবির সফলকাম অবলোকন।

চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করার কথা গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন। কবির কাছে এ শুভ নিমিত্ত হচ্ছে অকস্মাৎ বিস্মিত নয়নে পৃথিবীর রূপ দর্শন করে আনন্দকে আবিষ্কার।

কবি অভাবনীয়কে দর্শন করতে চান। পৃথিবীতে সর্বত্রই একটি অভাবনীয় আছে, একটি বিপুল রহস্যে পৃথিবীর জীবন যেন সমাচ্ছন্ন এমন একটি বোধ অল্প বয়সে সবার মনেই জাগে। বড় হয়ে বিজ্ঞান ও বিবেচনা যখন আমাদের জীবনকে ক্রমশ শাসন করতে থাকে তখন বুদ্ধির রাজত্বে এসে আমরা অভাবনীয়কে হারিয়ে ফেলি। শিশু বয়সে আমাদের মনে একটি আদিম পবিত্রতা থাকে, একটি নিষ্কলুষ বিস্ময়ের জাগরণ থাকে। একমাত্র

কবিই এ বিস্ময়কে বাঁচিয়ে রাখেন। কবির স্পর্শকাতর সংবেদনশীল মন হৃদয়ের জন্য চিরকাল রাজ্যবিস্তার করে, যে-রাজ্যে শুধু অভাবনীয়ের প্রতিষ্ঠা, যে-অভাবনীয় প্রকৃতিতে, মানুষের কর্মে এবং সম্পর্কে এবং আনন্দ-বেদনায় দীপান্বিত প্রতিটি মুহূর্তে।

সমালোচনার উদ্দেশ্য

সাহিত্য-বিচার, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাই সমালোচনার উদ্দেশ্য। আনাতোল্ ফ্রাঁস সমালোচককে নির্দিষ্ট অভিমত-জ্ঞাপনকারী বিচারক বলে আখ্যাত করেন নি; তিনি তাঁকে বিচিত্র গ্রন্থের পরিসরের মধ্যে পরিভ্রমণশীল, অনুভূতিপরায়ণ আত্মা বলে অভিহিত করেছেন। শিল্পের সান্নিধ্যে তাঁর আবেগ হবে দ্বিধাহীন এবং বক্তব্য হবে স্পষ্ট। উপভোগই যাঁর কাব্য-বিচারের মাপকাঠি, তিনি হয়তো রবীন্দ্রনাথের "উর্বশী" পড়ে বলবেন, "এ কবিতাটি পাঠ করার অর্থ শিরা-উপশিরায় আনন্দবোধের শিহরণ অনুভব করা। আমি-যে উল্লসিত হয়েছি, কাব্যের মূল্য নির্ণয়ের পক্ষে এই বোধ-টুকুই কি যথেষ্ট নয়? কতটুকু ভালো লাগলো, আমার মন কতটা আচ্ছন্ন হলো, এ-সব আমি বলতে পারবো। অন্যের অন্তরে প্রবেশাধিকার যেমন আমার নেই, তাঁর অনুভূতির গতিবিধির সন্ধানও তেমনি আমি রাখি না। যদি আমার আনন্দ-বোধকে সুচারুভাবে ব্যক্ত করতে পারি, হৃদয়ের উল্লাস যদি যথাযথভাবে মুক্তি পায়, তবে উল্লাসের প্রধান কারণকেও প্রচ্ছন্ন রেখে আমার বক্তব্যকেই শিল্প হিসেবে মর্যাদা দিতে পারবো। সমালোচনার মূল্য এখানেই যে, কোন কাব্যের রসোপভোগ করতে গিয়ে সে নিজেই রসমূর্তি ধারণ করে।"

উপরি-উক্ত সমালোচনার নীতিতে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, মূল কাব্য অতিক্রম করে সমালোচকের অভিমতের উপর আমাদের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেকে এ অবস্থা প্রার্থনীয় বলে মনে করবেন না। তাঁরা বলবেন, "আমরা আপনার কথায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে চাই নে, আমরা উর্বশীর সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে চাই। কবিতা উপভোগের জন্য সমালোচকের মানসিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজন করে না। যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তবে কাব্যের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ হবে না, সমালোচকের মন্তব্যই দীপ্তিমান হবে।"

এ যুক্তির জবাবে প্রথম পক্ষ বলতে পারেন, "একথা সত্য যে, আমার সমালোচনা 'উর্বশী' থেকে আপনাদের ক্রমশ দূরে সরিয়ে আনছে এবং সমস্ত

আলোক পুঞ্জীভূত হয়েছে আমার মধ্যে। প্রধান হয়েছি আমি। কিন্তু সমস্ত সমালোচনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই। এক বস্তু থেকে ভিন্ন বস্তুতে, কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রান্তরে আমাদের গম্যপথ নির্দেশিত। আমি হয়তো কাব্যকেন্দ্রে মূল বস্তুকে আচ্ছন্ন করে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, কিন্তু এমন কোনো সমালোচনা আছে কি, যা 'উর্বশী'র রস-রূপের অতি সন্নিধানে আমাদের পৌঁছে দেয়? ঐতিহ্য-কেন্দ্রিক সমালোচনায় আমরা কবির পরিবেশ, যুগ-সিদ্ধতা এবং কাব্যধারার সঙ্গে পরিচিত হই। এর আদর্শে 'উর্বশী'কে উপভোগ করতে হলে মহাভারতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার এবং কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'ও পড়তে হবে। মনস্তত্ত্বগত সমালোচনা কবিতা থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং কবির জীবনের সঙ্গে আমার পরিচয় সুনিবিড় করে। যেখানে উদ্দেশ্য ছিল 'উর্বশী' কবিতাটি উপভোগ করা, সেখানে আমার সম্পর্ক ঘটে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-পুরুষের সঙ্গে। আদর্শগত সমালোচনাও শিল্প সম্পর্কে আমাদের বদ্ধমূল ধারণার মাপকাঠিতে কাব্য-বিশ্লেষণ করে। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের বিবিধ ধারণার পটভূমিতে 'উর্বশী' কতটা উজ্জ্বল হয় জানি না, কিন্তু রীত্যনুসরণ অক্ষুণ্ণ থাকে। এ সমালোচনায় রীতিটাই মুখ্য, কাব্যোপভোগ গৌণ। নন্দনতত্ত্ব আমাকে অনুধাবন-ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে সৌন্দর্য ও শিল্পের ভাবরাজ্যে উন্মার্গগামী করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত সমালোচনাই সৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে, বস্তুর কেন্দ্র থেকে আমাদের আড়াল করে আনে। আমি কবির স্বপ্নে ও ভাবনায় সঞ্জীবিত হতে চাই, কবির স্বপ্নকেই আমার শিল্পানুরাগের ক্ষেত্রে জাগরিত করতে চাই।"

সমালোচনার ক্ষেত্রে এই দুই মতবাদের দ্বন্দ্ব চিরকাল রয়েছে। একদিকে আত্মোপলব্ধির উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে মূলত বস্তুর সঙ্গে সম্পর্করহিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। কাব্য-সম্পর্কে যেদিন থেকে মানুষ প্রথম চিন্তা করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই কাব্যোপভোগের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে মনন ও চিন্তার বৈষম্য দেখা দিয়েছে। আধুনিক সাহিত্যের শুরুতেও এই সন্দেহবাদ ও দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল ছিল। ষোড়শ শতকে ইতালিয়ানরা কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে **classical code** বা ধ্রুপদী আদর্শের প্রবর্তন করেছিলেন। সে সময়েই অন্য একজন ইতালিয়ান, পিয়াত্রো আরেতিনো বলেছিলেন যে,

প্রতিভার স্ফুরণ নীতি অনুসরণ করে হয় না এবং ব্যক্তিগত রসোপলব্ধি ব্যতিরেকে সাহিত্য-বিচারের আর কোনো আদর্শ নেই।

প্রত্যেক যুগেই উপভোগের সঙ্গে বিচারের বৈলক্ষণ্য ঘটেছে। একদিকে পরুষ-কঠোর রূঢ় বিচারক শুধু যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীল এবং অন্যদিকে উপভোগের নিষ্ক্রিয় উচ্ছ্বাস।

কিন্তু দুই বিরুদ্ধ ধারাকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, কোনো না কোনো ক্ষেত্রে একই পটভূমিতে এরা মিলিত হয়েছে। গ্রীকদের ধারণা ছিল যে, সাহিত্য সকর্মক প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ নয়, কিন্তু জীবনের বিবিধ উপাদানের পুনর্গঠন। আরিসটোটল্ কাব্যকে মানুষের অনুকরণ-লিপ্সার প্রসূন বলেছেন। ইতিহাস ও বিজ্ঞান থেকে কাব্যের পার্থক্য স্থির হয় এভাবে যে, যেখানে ইতিহাস ও বিজ্ঞান বাস্তবের অনুকৃতি, কাব্য সেখানে সম্ভাব্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত। রোমকগণ সাহিত্যের নীতিগত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, সাহিত্য মানব-মনকে উন্নত ও উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত করবে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ধ্রুপদী যুক্তিবাদীরা মূলত রোমকদের এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে সাহিত্য ছিল এক ধরনের মানসিক শ্রমসাধন-ব্যাপার। এঁরা বিজ্ঞান বা ইতিহাসের মতো সাহিত্যকেও চিন্তনজাত বলে আখ্যাত করেছেন। অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডের কবি ও সমালোচকগণ 'কল্পনা', 'বুদ্ধির আবেগ' ও রুচির কথা বলে কিছুটা বিশিষ্টতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রাক্তন ধারা থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হতে চান নি।

উনিশ শতকেই সর্বপ্রথম সমালোচনার বিভিন্ন ধারার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা দেখা যায়। **Mme. de Stael** সাহিত্যকে সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তি বলে ব্যাখ্যা করলেন। **Victor Cousin** শিল্প-সর্বস্ব নীতির (**art for art's sake**) প্রবর্তন করলেন। **Sainte-Beuve** জানালেন যে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যতিরেকে সাহিত্যের অন্য কোনো কৃত্য নেই। আরো পরে প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে **Taine** বললেন যে, জাতি, যুগ ও পরিবেশের অভিব্যক্তি হিসেবেই সাহিত্য রূপ লাভ করে। কিন্তু আত্মোপলব্ধিই যাঁদের চরম কথা, তাঁরা অনবরতই বলছেন যে, জীবন-সংক্রান্ত বিবিধ অনুভূতির সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর প্রভাবেই সাহিত্য শুচি,

কান্তিমান ও মহিমান্বিত হয়। বিভিন্ন মতবাদ থেকে একটা কথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, সাহিত্য চিরকালই কোনো কিছুর অভিব্যক্তি—হয়তো বা উপলব্ধির, হয়তো বা মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার, হয়তো বা বস্তুপ্রকৃতির রহস্যের ; কিন্তু চিরকালই তা আত্মপ্রকাশের শিল্প।

সমালোচনার এই প্রকাশবাদ জার্মেনীতেই প্রথম সুস্পষ্টভাবে রূপ লাভ করে। সেখানেই প্রকাশবাদ দার্শনিক যুক্তি ও সততায় পরিমার্জিত হয়েছে। জার্মান সমালোচনার এই ধারার সম্পর্কে কার্লাইল বলেছেন, "Criticism has assumed a new form in Germany. It proceeds on other principles and proposes to itself a higher aim. The main question is not now a question concerning the qualities of diction, the coherence of metaphors, the fitness of sentiments, the general logical truth in a work of art, as it was some half century ago among most critics, neither is it a question mainly of a Psychological sort to be answered by discovering and delineating the peculiar nature of the poet from his poetry, as is usual with the best of our own critics at present ; but it is, not indeed exclusively, but inclusively of its two other questions, properly and ultimately a question of the essence and peculiar life of the poetry itself......the problem is not now to determine by what mechanism Addison composed sentences and struck out similitudes, but by what for finer and more mysterious mechanism Shakespeare organized his dramas and gave life and individuality to his Ariel and his Hamlet. Wherein lies that life ; how have they attained that shape and individuality ? Whence comes that that empyrean fire which irradiates their whole being, and pierces, at least in story gleams, like a diviner thing, into all hearts ?.........These are the questions for the critic. Criticism stands like an interpreter between the inspired and the unins-

pired ; between the prophet and those who hear the melody of his words and catch some glimpse of their material meaning but understand not their deeper import."

জার্মানরাই সর্বপ্রথম প্রকাশবাদকে দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা বললেন যে, আপনাকে সঙ্গতভাবে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের দায়িত্ব শেষ হয় এবং এই অভিব্যক্তিকে অনুধাবন করাই সমালোচনার একমাত্র লক্ষ্য। গোটে সমালোচনাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—বিনাশমূলক এবং সৃষ্টিধর্মী। প্রথমটি প্রচলিত নীতি ও শাস্ত্রিক আদর্শ দ্বারা সাহিত্যের রূপ ও রসের পরিমাপ করে; এবং দ্বিতীয়টি কয়েকটি মৌলিক জিজ্ঞাসার জবাব দিতে চায়—লেখক কি করতে চেয়েছেন? এবং সে ক্ষেত্রে কতটা সার্থকতা অর্জন করেছেন? সমালোচকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে কবির উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া, একথা জানা যে, উপজীব্য বস্তু কবির দৃষ্টিগোচর কতটা ছিল এবং কতটা সার্থকতার সঙ্গে তিনি তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

কবি কি করতে চেয়েছেন এবং কি করে আপন উদ্দেশ্য সফল করেছেন? তিনি কি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন এবং কিভাবেই বা ব্যক্ত করেছেন? তাঁর শিল্প আমার মনে কোন্ ভাবোদয়ের সহায়তা করে এবং কোন্ সর্বোত্তম উপায়ে সে-ভাব প্রকাশমান হয়? কাব্যবিচারের পূর্বাহ্ণে প্রত্যেক আধুনিক সমালোচককে এ প্রশ্নগুলি বিবেচনা করতে হয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, কাব্যের মুকুরে কবি যতটা প্রতিবিম্বিত হয়েছেন অতটুকুই সমালোচকের বিশ্লেষণের পরিধিতে আবদ্ধ হবে। অস্পষ্ট সম্ভাবনার কথা তুলে কাব্যোপভোগকে ছায়াচ্ছন্ন করলে কবি আমাদের বুদ্ধির অগোচরেই থাকবেন।

প্রত্যেক লেখকের রচনার প্রতিকৃতি তাঁর প্রতিফলিত মানসিকতার বাণীরূপ। কখনও শ্রদ্ধায়, কখনও অবজ্ঞায়, কখনও নিরাসক্তিতে আমরা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন কর্ম ও সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করি তখন আমাদের বর্ণনার শব্দসজ্জায় কখনও শ্রদ্ধা, কখনও অবজ্ঞা, কখনও নিরাসক্তি ধরা পড়ে। তথ্যের ব্যতিক্রমের সঙ্গে অনুভূতির ব্যতিক্রম যে সর্বত্র জাগ্রত হবে তা বলা চলে না। তথ্যের সমৃদ্ধি স্থিরতায় এবং

অনুভূতির সমৃদ্ধি তার প্রবাহে। 'তিনি কবি', 'তিনি কবিতা লেখবার চেষ্টা করেন', 'তিনি কবিতা লেখেন'—এ তিনটি উক্তিতে একটি তথ্যই আছে যে, যে-ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তিনি কবি কিন্তু তিনটি উক্তি তিনটি বিভিন্ন মনোভাব ধারণ করছে। প্রথম উক্তিতে শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় উক্তিতে অবজ্ঞা এবং তৃতীয় উক্তিতে নিরাসক্তি স্পষ্ট। স্টাইল বা বাগ্‌ধারা এভাবেই লেখকের প্রতিফলিত মানসিকতা। লেখকের মানসিকতার পশ্চাতে সক্রিয়রূপে অথচ প্রায়শই অজ্ঞাতে বিদ্যমান তাঁর সমাজ, পরিবেশ এবং শিক্ষা। যে-সমাজ ও পরিবেশ লেখককে লালন করেছে এবং যার প্রশ্রয়ে তিনি সমৃদ্ধ অথবা লাঞ্ছিত তাঁর মানসরূপ নির্মাণকার্যে সে সমাজ সর্বদাই প্রতিশ্রুত। যে-পাঠক্রম এবং শিক্ষার ধারায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন সে শিক্ষা তাঁর বক্তব্যকে বুদ্ধিদীপ্ত অথবা নির্বিকার চাতুর্যময় অথবা নিরাভরণ, দ্বিধাহীন অথবা শঙ্কিত, প্রশান্ত অথবা অশোভন করে। যে-লেখার উদ্দেশ্য নিরীক্ষা এবং আবিষ্কার অর্থাৎ যে-লেখা সমালোচনা সে লেখার মধ্যেই লেখকের মানসিকতা যতটা ধরা পড়ে, অন্যান্য প্রকার লেখার মধ্যে ততটা নয়। সংবাদবহ গদ্যের ক্ষেত্রে তো নয়ই।

গদ্য-লেখার প্রকৃতি-নির্ধারণ এ জন্যই দুরূহ কর্ম। আমরা সকলেই কথা বলি গদ্যে, আমাদের প্রতি মুহূর্তের পরিচয়ের ভাষা গদ্য, তাই বিভিন্ন প্রকারের গদ্য রচনার মধ্যে যে-প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে তা আমাদের নির্ণয়ে আসে না। কবিতা-সম্পর্কে গভীর অনুধাবন সহজে সম্ভবপর না হলেও যে-কোনোও লোক এ কথা বলতে পারেন যে, কবিতার একটি বিশেষ গঠন-সৌষ্ঠব আছে, ছন্দ আছে, শব্দের পুনরাগম আছে। কবিতা-সম্পর্কে এ কথাই সব কথা নয় এবং হয়তো বিশিষ্টার্থক কোনোও কথাই নয়। কিন্তু বিশ্লেষণ-বিহীন হঠাৎ মন্তব্যের জন্য এ কথাই আপাতত চূড়ান্ত। গদ্য-সম্পর্কে এভাবে হঠাৎ কোনোও মন্তব্য করা-চলে না। এমন লোকের অভাব নেই যিনি গল্প-উপন্যাস পড়েন অনবরত, কিন্তু কবিতা কখনও নয়। তাঁকেও যদি গদ্যের প্রকৃতি-সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তিনি উত্তর দিতে পারবেন না কিন্তু কবিতা-সম্পর্কে সহজ কয়েকটি মন্তব্য হয়তো করবেন। তার কারণ সাধারণভাবে কবিতার দৃশ্যমান অথবা শ্রোত্রগত রূপের একটি যান্ত্রিক বিশ্লেষণ সম্ভবপর। গদ্যে এটা সহজে সম্ভবপর নয়। একটি প্রবন্ধের গদ্যরীতির সঙ্গে একটি

বিবৃতির ভাষার পার্থক্য আছে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে এ পার্থক্য উজ্জ্বল নয়।

একজন গদ্যলেখক যখন কোনও শব্দ ব্যবহার করেন, তখন সে শব্দকে অর্থের দিক থেকে প্রয়োজন-সিদ্ধ হতে হয় এবং সে প্রয়োজন প্রধানত ব্যবহারিক ও বস্তুগত। শব্দটি একটিমাত্র অর্থ বহন করে, অধিকতর নয় অর্থাৎ অর্থের দিক থেকে শব্দটিকে তীক্ষ্ণ হতে হয়, অনাচ্ছন্ন হতে হয়, স্পষ্ট হতে হয়। কবিতায় এ কথা সত্য নয়। কবিতায় শব্দের শ্রী এবং সৌন্দর্য অভিধানগত এবং দৈনন্দিন ব্যবহারগত অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়, একপ্রকার বিশিষ্টার্থক বোধ এবং সে বোধজনিত যে-সম্মোহ তার মধ্যেই শব্দের অনবরত জাগরণ। তা ছাড়া শব্দকে অতিক্রম করে সেখানে একটি উপলব্ধি সঞ্চারিত হয়। গদ্যে সাধারণত এটা হয় না।

গদ্য আমরা প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করি বলে তার প্রকৃতি আমরা বিবেচনা করতে শিখি নি। আমাদের চিন্তা, বুদ্ধি, স্বপ্ন এবং প্রয়োজনের ভাষা বলেই গদ্য আমাদের চেতনার সঙ্গে এবং কর্মের সঙ্গে জড়িত এবং সে কারণে তার পরিচয়টি একটি নিশ্চিন্ত উপস্থিতির মতো। অত্যন্ত নিকটের বলেই গদ্য আমাদের পরীক্ষার বাইরে থাকে। কবিতা যদিও গদ্য-রচনার চেয়ে অনেক বেশী তীব্র অনুভূতির এবং যদিও কবিতার বক্তব্য আমাদের চেতনার সঙ্গে মিলিত হয়েই আবিষ্কৃত হয়, তবুও আমরা কবিতার ভালো-মন্দ অথবা তাপ- ও শীতলতা-সম্পর্কে মন্তব্য প্রায়ই করি অথচ আমাদের প্রতিদিনের সংলাপের শব্দগুলো বিবেচনার বাইরেই থেকে যায়।

গদ্য-রচনায় যে-সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয় তা এতটা নির্বাচিত যে, অর্থের অস্পষ্টতার সম্ভাবনা সেখানে কম। একটি শব্দ একটি সময়ে একটি অর্থই বহন করে। সে কারণে গদ্য সর্বমুহূর্তেই সংবাদ পরিবেশনের ভাষা। একটি সময়ের সঙ্গে জড়িত থেকে গদ্যকে অগ্রসর হতে হয়, তাই গদ্য চিরকাল শব্দ-ধারণের ক্ষমতায় সমসাময়িক। প্রাচীন গদ্য আমরা ব্যবহার করি না, আধুনিক গদ্যই সর্বমুহূর্তে আমাদের অবলম্বন। বিষয় অস্বীকৃত না হলেও পুরোনো ভাষার অব্যবহারের কারণে, প্রাচীন গদ্য সচল পাঠক্রমের মধ্যে কখনও আসে না। গদ্যকে সমসাময়িক হতে হয় এবং এ সাময়িকতার মধ্যেই তাকে বিশিষ্ট হতে হয়। একজন লেখকের রচনাশৈলীতে এ

বিশিষ্টতা তখনই অবধারিত হয় যখন তিনি ঘটনা বা কর্মের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একটি রসাশ্রিত চিত্র উপস্থিত করেন। প্রধানত বেদনা এবং তীব্র দাহনের পরিচয় যে-রচনায় থাকে, তা সহজে প্রাচীন হয় না, কেননা সেখানে সর্বসময়ের একটি চৈতন্যের প্রশ্রয় থাকে। এ চৈতন্যই হচ্ছে শিল্পীর অহমিকা, যাকে আমরা স্টাইল আখ্যা দিতে পারি। বিশিষ্ট তাৎপর্য নিয়েই শব্দের দিক থেকে সাময়িক থেকেও একটি রচনা সার্থক হয়, আর তা না হলে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন অনেক কথা হারিয়ে যায়, তেমনি শুধু মাত্র সংবাদ পৌঁছে দিয়েই গদ্য হারিয়ে যায়। গদ্য-লেখককে তাই অনবরত বিশিষ্ট হবার সাধনা করতে হবে।

বর্তমান কালে সাহিত্যকে অভিব্যক্তির শিল্প বলে অভিহিত করা হচ্ছে এবং সমালোচকগণ সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তিবাদের উপরই গুরুত্ব আরোপ করছেন। তবুও অশোভন উক্তির বাহুল্য, চিন্তার শিথিলতা, বিশ্লেষণের জটিলতা কখনো কখনো সাহিত্যকে উপভোগের ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে সরিয়ে আনে। উপলব্ধি এবং উপভোগকেই যদি সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তবে সমস্ত জটিলতা ও আচ্ছন্নতা থেকে আমরা চিরকালের জন্য মুক্তি পেতে পারি।

প্রথমত, আমরা প্রাচীন নিয়ম অথবা সাহিত্য-রচনায় পূর্ব-নির্ধারিত পদ্ধতির শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে পারি। মনে রাখতে হবে যে, এই নিয়মকে গ্রাহ্য করার অর্থ হচ্ছে কাব্য ও সাহিত্যক্ষেত্রে অনুভূতি ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণকে অস্বীকার করা। এক কালে এই নিয়মের নিগড় সমালোচককে অভিচারের সম্মোহনের মতো আচ্ছন্ন করতো। প্রচলিত সাহিত্যের অভিজ্ঞতা থেকে আরিস্টোটল কিছু নিয়মের প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু রোমানদের হাতে তা ক্রমশ কুসংস্কার ও ডগমায় পরিণত হয়। নাট্যক্ষেত্রে যাঁর অনুশীলন, তাঁর জন্য হোরেসের নির্দেশ নিষ্ঠুর অনুশাসনের মতো, "একই সময়ে তিনজন অভিনেতাকে মঞ্চে আনবেন না ; আপনার নাটকের পরিসর পঞ্চাঙ্কের অধিক হবে না।" এই সমস্ত অনুশাসন সৃষ্টিশীল শিল্পকে ভারাক্রান্ত ও নির্যাতন করেছে। প্রাচীন কালে এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্পষ্ট হয় নি কিন্তু প্রত্যেক যুগের এমন অনেক কবি ও সাহিত্যিক এসেছেন, যাঁদের রচনায় গৃহীত নীতির ব্যতিক্রম ধরা পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যের বিবিধ গোত্র বা পর্যায়ের মূল্য ক্রমশ নগণ্য হয়ে আসবে। প্রাচীন যুক্তিবাদীরা সাহিত্যকে গীতিকাব্য, নাট্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য, মহাকাব্য ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। প্রত্যেক গোত্রের জন্য কতকগুলো নীতির নাগপাশ তৈরী হয়েছিল। বিভিন্ন নিয়মের নির্দেশ মতো কমেডির সঙ্গে ট্রাজেডির অথবা মহাকাব্যের সঙ্গে গীতিকাব্যের সংযোগ ঘটতে পারতো না। কিন্তু তবুও দেখা গেছে যে, আইন তৈরী হয়েছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে আইন ভঙ্গও হয়েছে বিচিত্রভাবে। শিল্পকে যদি পূর্ণাবয়ব অভিব্যক্তি বলে আখ্যাত করতে হয়, তবে সমালোচককে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, "সাহিত্য কোন্ কথা ব্যক্ত করেছে এবং কতটা সার্থকভাবে?" তাঁর মনে এ প্রশ্ন জাগবে না, "এ রচনাটিকে কোন্ গোত্রভুক্ত করা যায়?" গীতিকাব্য, মহাকাব্য ইত্যাকার বিভাগগুলো শিল্পক্ষেত্রেই বাস্তবতার সম্পর্করহিত। কবি তো মহাকাব্য বা গীতিকাব্য রচনা করেন না, তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন। এবং এই প্রকাশের ভঙ্গীই তাঁর কাব্যের অবয়ব গড়ে তোলে। কাব্যের রূপ এবং ভঙ্গী কতগুলো হবে, সে বিচার না করে এ কথা বলাই বোধ হয় সমীচীন যে, কবি যে-কয়জন হবেন, কাব্যের ভঙ্গীও সে কয়টিই হবে। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সময় অনেক সমালোচক সাহিত্যের ক্রম ও পর্যায় নির্ণয় করতে গিয়ে ভ্রমে পতিত হন। মাইকেল মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' লিখেছেন, 'বীরাঙ্গনা কাব্য'ও লিখেছেন। যদি মহাকাব্যের কোনো ইতিহাস-লেখক এ দু'টি গ্রন্থকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করেন, তখন সৃষ্টিশীল আত্মার সঙ্গে অর্থাৎ কবির সঙ্গে এঁদের সংযোগ যথাযথভাবে বিদ্যমান থাকবে কি? মহাকাব্যের ইতিহাস-লেখক হয়তো ক্ষীণ তন্তুতে আবদ্ধ করে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার'কে 'মেঘনাদবধ'-এর সগোত্র করবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই যোগসূত্র অত্যন্ত দুর্বল, এবং সমালোচনার এ পথ উপলব্ধির ও উপভোগের পথ নয়।

তৃতীয়ত, রচনাবলীর আদর্শ, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাকার বিবিধ অলঙ্কারের উপকরণের হাত থেকে আমরা মুক্তি পাব ক্রমশ। যতদিন প্রকাশভঙ্গীকে বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন ভেবেছিলাম ততদিনই প্রকাশভঙ্গীর ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে রচনালঙ্কারের প্রয়োজন হয়েছিল। আজ আমরা জেনেছি যে, রচনাবলী বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তা

কবির বিশেষ বাস্তবানুভূতির ইন্দ্রজাল—তাঁর সমগ্র সত্তার উপলব্ধি। শিল্পকুশলতা সব ক্ষেত্রেই অভিব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা পূর্ণাবয়ব। রচনার রীতি পরিবর্তন করার অর্থ, বক্তব্যে পরিবর্তন আনা, অতএব ভিন্নার্থের সাহিত্য সৃষ্টি করা। সূর্যের রক্তিমাভায় রঞ্জিত জলোচ্ছ্বাস দেখে কবি যখন বলেন, "জলিতেছে জল তরল অনল," তখন তিনি "সূর্যকিরণে জলতরঙ্গ ঝলমল করছে" এমন কোন কথা বোঝাতে চান না। তিনি যা বলেছেন তা দ্বিধাহীন ও পূর্ণাঙ্গ। অন্য কোনো কথায় তা বোঝানো যায় না। জ্ঞানদাসের "ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ", একটা আবেগের যথাযথ প্রকাশ। অন্য কোনো উক্তিতেই এ কথার সৌন্দর্য ধরা পড়তে পারে না। লেডি ম্যাকবেথের সে উক্তিটি স্মরণ করুন—

"Here's the smell of the blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand."

অন্ধকার নিশীথে নিশি-পাওয়া রমণী অতীতের অকল্যাণের প্রক্ষালন যাচ্ঞা করছে। এ ভাষা প্রতিদিনের ভাষা নয়, প্রাত্যহিকতার স্পর্শ এতে নেই। বাস্তব জীবনের যে-অন্যায়ে ক্রমশ আত্মার নির্ভর বিনষ্ট হল অথচ প্রকাশ্যে শক্তিমত্ততার আস্ফালন নিভলো না, এখানে অজ্ঞাতসারে সে আত্মার কাতরোক্তি মহিমান্বিত ভাষায় অন্ধকার আকাশে দীপ্তিময় তারার মতো জলে উঠেছে। এখানে রূপক বা উৎপ্রেক্ষার পরিচয় কতটা আছে সে প্রশ্ন একেবারেই নিরর্থক, এ ভাষা অননুকরণীয় এবং এ অভিব্যক্তি তুলনাহীন।

চতুর্থত, সাহিত্যের নীতিগত বিচারের মূল্য সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়বে। হোরেস বলেছিলেন যে, শিল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাদান। বহুযুগ পর্যন্ত সমালোচকগণ 'আনন্দ' ও 'শিক্ষা' শব্দ দুটি নিয়ে যথেষ্ট কোলাহল তুলেছিলেন। কেউ বলেছিলেন যে, কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষাপ্রদান; কেউ বলেছিলেন যে, কাব্য আনন্দ-হেতু; আবার কেউ বা কাব্যে শিক্ষা ও আনন্দের সংযোগ খুঁজেছিলেন। ইংলণ্ডের রোমান্টিক যুগেই সর্বপ্রথম স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হল যে, আপনার স্বরূপকে প্রকাশ করা ছাড়া শিল্পের আর কোনো অর্থ নেই। যখন প্রকাশ সুচারু ও সম্পূর্ণ হয়, কাব্যের উদ্দেশ্য তখনই সফল হয়। সৌন্দর্যের অস্তিত্বই তার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের একমাত্র পথ—**"Beauty is its own excuse**

for being." কবির একমাত্র কর্তব্য হল আপন শিল্প-ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ হওয়া, এবং আপন বাস্তববোধকে সার্থকভাবে প্রকাশ করা। সৌন্দর্যের পৃথিবী নীতি অথবা সাধারণ সত্যের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তার সত্তা উপলব্ধির ক্ষেত্রে সদাজাগ্রত।

নৈতিক আদর্শ এবং আলঙ্কারিকদের নির্দেশ থেকে সমালোচনাকে মুক্ত করে আনলেও, যুগের সীমাবন্ধন থেকে তার মুক্তি নেই। প্রত্যেক যুগের সাহিত্যানুরাগ, মানুষের অন্যান্য আসক্তির মতো, যুগের আবেগে কম্পমান এবং তার বিচ্যুতির দ্বারা বিকৃত। সম্পূর্ণ মানুষ থেকে কাব্যকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা চলে না। যেখানে তার জন্ম, কাব্যের উদ্‌গমও সেখানেই ; তার জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার সঙ্গে তার কাব্যের সংযোগ অত্যন্ত নিবিড়। মানুষের প্রাত্যহিক ধারণা-বাসনার মতো, দেশের সীমান্ত অতিক্রম করলেই, সাহিত্যগত অনুভূতিরও পরিবর্তন ঘটে। এক আবহাওয়ায় এর প্রাচুর্য, অন্য আবহাওয়ায় হয়তো-বা অবনতি। তবে প্রত্যেক সৃষ্টিশীল মানুষ তাঁর নিজস্ব ধারায় যুগ এবং পরিবেশ থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেন, এবং পরিবর্তে এমন কিছু প্রদান করেন, যা বিশিষ্ট ও অনন্য। প্রত্যেক যুগেই এমন অনেক লোক থাকেন, আদর্শের দিক দিয়ে যাঁরা অন্য যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত—হয়তো-বা পূর্বযুগের, নয়তো-বা পরের। সাহিত্য অথবা কাব্যের বিচারক সমালোচনার ক্ষেত্রে যে-সমস্ত সিদ্ধান্তে আসবেন, তা হবে তাঁর পরিবেশ এবং যুগধর্ম দ্বারা প্রতিবদ্ধ।

আমাদের প্রশংসার ভাষা সাধারণত অস্পষ্ট এবং বেপথু—জ্যামিতির ভাষায় উপবৃত্তগত অর্থাৎ সেখানে সত্যিকারের বিশ্লেষণ অস্পষ্ট থাকে এবং সে কারণে বস্তু-মূল্যের বিস্মরণ ঘটে। যদি বলি, 'ছবিটি সুন্দর' তখন এ-উক্তিটিতে এ-কথা বলা হল না যে, চিত্রটি আমার চিত্তে কয়েকটি বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করেছে যা অনেক মূল্যবান। অনেক বিশ্লেষণ ও বিচারের পর মন্তব্যরূপে সহজ সিদ্ধান্তে যে-কথা বলা যায়, একক রূপে অকস্মাৎ তা কখনও অর্থবহ হয় না। তবুও আমাদের চিত্তবৃত্তি এরূপ যে, আমরা অভিজ্ঞতার ধারা অনুসরণ করি না, প্রথম উক্তিকেই অভিজ্ঞতালব্ধ একটি চরম সিদ্ধান্ত মনে করি। ধরা যাক, 'ক' একটি চিত্র, 'খ' নামক কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর কারণে বা সহায়তায় চিত্রটির সম্পর্কে আমাদের মনে

একটি বিশেষ ভাব জাগ্রত হল, যাকে বলা যায় 'স'। সুতরাং 'ক'-সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে 'খস' আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত; কিন্তু আমরা একটু দ্রুততায় এবং বিনা সঙ্কোচে 'খ'-এর কথা বিস্মৃত হই—এবং বলি যে 'ক'-এর 'স' গুণটি আছে, অর্থাৎ আমরা যা আবিষ্কার করলাম তা হল 'কস'। ব্যাপারটি অভিজ্ঞতাহীন উৎপ্রেক্ষার মতো। আমরা একটি বিশেষ গুণের সঙ্গে 'ক'-কে একাত্ম করলাম, অর্থাৎ আমাদের বক্তব্যে ধরা পড়লো যে, চিত্রটির সৌন্দর্য স্বাভাবিকভাবে এবং বিবেচনা ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ-কথা মনে রাখা দরকার যে, সর্বপ্রকার বোধই—আনন্দের, সৌন্দর্যের, বেদনার—আমাদের হৃদয়ের অনুভূতির প্রতিভাস। বস্তুর উপর সৌন্দর্য আমরা আরোপ করি, বস্তুর নিজস্ব গুণ বা অ্যাট্রিবিউট হিসেবে তা আবিষ্কার করি না। বস্তুর নিজস্ব গুণ অবশ্যই কিছু আছে, কিন্তু তাকে আমরা গুণ বলবো না—উপাদান বলবো। একটি চিত্রে কাগজ বা ক্যানভাস আছে, রং আছে আবার রং-এর প্রকারভেদ আছে। যদি আমি বলি যে তৈল-চিত্র আমার ভালো লাগে, জল-রং নয়, তখন আমার বক্তব্য উপাদানগত হলো, গুণগত নয়। অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একটি মানসিক প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খলায় বস্তু-সম্পর্কে যে-বোধ আমাদের জাগবে সে বোধ আমাদের নিজস্ব-বোধ, যা বস্তুর উপরে আমরা আরোপ করছি। এ বোধকে বস্তুর বিমূর্ত গুণ হিসেবে ধরে নেওয়ায় বিপদের সম্ভাবনা আছে। একেই **I. A. Richard** বলেছেন, **"The fallacy of projecting the effect and making it a quality।"** কোনও একটা সত্য বা আনন্দের দৃষ্টিগোচর একটি অবলম্বন আছে, যেমন চিত্রকলার জন্য ক্যানভাস-কাগজ-রং, কবিতার জন্য কাগজ-কালি-শব্দসজ্জা, সুরের জন্য বাদ্যতন্ত্রী, ভাস্কর্যের জন্য পাথর। এ-সব শিল্প-সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য কখনও কখনও উপাদানগত হয় অথবা অভিজ্ঞতাহীন উৎপ্রেক্ষার মতোও হয়। আবার কখনও আমাদের মন্তব্যে মনের সঞ্চরণ ধরা পড়ে, অর্থাৎ যে-মন আনন্দকে আবিষ্কার করলো অথবা সত্যকে নির্ণয় করলো, সে মনের স্বচ্ছ পরিচয় সেখানে থাকে। যখনই কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা হয়, তখন যে-শব্দগুলি মন্তব্যকে ধারণ করে থাকে তাদের নিহিতার্থের সন্ধান আমরা করি এবং এ সন্ধানসূত্রেই আবিষ্কার করি সমালোচকের চিৎপ্রকর্ষ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো-বা চিত্তবিকার।

কবি মধুসূদন

এক

কবি মধুসূদন ঃ জীবনী

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। একই বছরে প্রকাশিত হয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাটক মাইকেল মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা'। প্রাচীন ধারার সর্বশেষ কবি ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যু হয় ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে। এ বছরেই মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য প্রকাশিত হয়। তিলোত্তমা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্যে নতুন যুগের সূচনা হল, যেমন গদ্যে ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের পূর্ণ উন্মেষ ঘটে। সাহিত্যের এ নতুন অধ্যায় যখন আরম্ভ হয়, পাক-ভারতে রাজনৈতিক ইতিহাসের নতুন অধ্যায়েরও সূচনা তখনই। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে 'কুইন্‌স প্রোক্লামেশন' (Queen's Proclamation) বলে খ্যাত মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রে পাক-ভারতের শাসন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত হয়।

বাংলা কাব্যক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সত্যিকার বিপ্লবী কবি। অসাধারণ চাঞ্চল্যে এবং জীবন-সচেতনতায় বাংলা কাব্যে তিনি এক নতুন প্রাণময়তা এবং সজীবতার সঞ্চার করেন। রচনা-ভঙ্গিতে, বক্তব্যের সচল গতিধারায় এবং আশ্চর্য শিল্প-কুশলতায় তিনি আমাদের সাহিত্যের গতি পরিবর্তন করেন এবং তার পরিসর বিস্তারিত করেন। তিনি বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সনেটের প্রবর্তন করেন, বাংলার প্রথম আধুনিক কমেডি ও ট্রাজেডির স্রষ্টাও তিনি। তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' আমাদের সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। মধুসূদনের মধ্যেই বিদেশী সাহিত্যের প্রাণধর্ম নতুন সজীবতায় স্ফূর্তি পায়। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস-রামায়ণ-মহাভারত থেকে তিনি উপাখ্যানের উপাদান সংগ্রহ করেছেন সত্য, কিন্তু কাহিনী-নির্মাণ, চরিত্র-সৃষ্টি এবং শব্দ-প্রয়োগের কৌশল ও চাতুর্য

তিনি শিখেছেন হোমার-ভার্জিল-দান্তে-মিল্টন থেকে। বিদেশী প্রভাব বলতে আমরা যা বুঝি, অর্থাৎ উদ্দীপনা, প্রাণময়তা, দীপ্তি ও চাঞ্চল্য সমস্ত কিছুই মাইকেলের কাব্যে এবং জীবনে আমরা পাই। মাইকেলের কাব্য তাঁর জীবন থেকে পৃথক নয়; কিন্তু বিদেশী প্রভাবে তাঁর কাব্য যেখানে উচ্চকিত হয়েছে প্রাণের প্রাচুর্যে, তাঁর জীবন সেখানে নিঃশেষ হয়েছে উচ্ছৃঙ্খলতায়। বিদেশী জীবন এবং সংস্কৃতিকে তিনি আপন জীবনে গ্রহণ করেছিলেন পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে। শৈশব থেকেই দেশজ হিন্দু-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা এবং বিরূপতা ছিল। এ ঘৃণার প্রকাশ্য পরিচয়স্বরূপে পাই তাঁর হিন্দু-ধর্ম পরিত্যাগ এবং খ্রীস্ট-ধর্ম অবলম্বন, ইংরেজ রমণীর পাণিগ্রহণ এবং ইংরেজি ভাষায় কাব্য-রচনার প্রয়াসের মধ্যে। ইংরেজি ভাষায় কাব্য-রচনার অসার্থকতা-নিবন্ধন বাধ্য হয়ে মাতৃভাষা তাঁকে অবলম্বন করতে হয়। তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ বছর।

মধুসূদনের জন্ম ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর জীবনের বুদ্ধিদীপ্ত কালগুলো কাব্যসাধনায় নিযুক্ত হয়েছিল কিন্তু তাঁর সাংসারিক জীবনে শান্তি ও সুখভোগ ছিল না। উচ্চাশা এবং বিশৃঙ্খল জীবনযাপনই মূলত তাঁর সর্বনাশের জন্য দায়ী। তিনি ছিলেন যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামের এক ধনী আইনজীবীর পুত্র। কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রাম। এ নদ সম্পর্কে পরবর্তী কালে তিনি লিখেছিলেন, 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে'! তেরো বছর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এখানে পাঠকালে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মে। এই আকর্ষণ শেষে তীব্র উন্মাদনায় পরিণত হয়। ইংরেজিতে কবিতা লেখা আরম্ভ করেন এবং ইংলণ্ডে যাবার জন্য ব্যাকুল হন। সতেরো বছর বয়সে লেখা একটি ইংরেজি কবিতায় এ ব্যাকুলতার পরিচয় আছে—

> **I sigh for Albion's distant shore,**
> **Its villages green, its mountains high ;**
> **Tho' friends, relations I have none**
> **In that fair clime, yet oh, I sigh**
> **To cross the vast Atlantic wave**
> **For glory or a nameless grave.**

মাইকেলের উচ্চাশার অন্ত ছিল না। বালক বয়সেই **Blackwood's Magazine** এবং **Bently's Miscellany**-তে ইংরেজি কবিতা পাঠাতে আরম্ভ করেন। এ বয়সে বায়রণ ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাধকদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মালো। তিনি ক্রমান্বয়ে হোমার, ওভিদ, দান্তে, তাসো এবং মিলটনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন। বায়রণ নেপথ্যে গেলেন। খ্রীস্টান হবার পর তিনি বিশপ্‌স্ কলেজে ভর্তি হন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তো পূর্বেই ছিল, এবার তা তীব্রতর হল। কলেজে অধ্যয়নকালে ন্যূনাধিক বারোটি ভাষা আয়ত্ত করেন—বাংলা, ইংরেজি, ফারসী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, ল্যাটিন, গ্রীক, হীব্রু, ফরাসী, জার্মান ও ইটালিয়ান।

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে মধুসূদন মাদ্রাজে যান। মাদ্রাজে তিনি আট বছর ছিলেন। বিক্ষিপ্তভাবে সংবাদপত্র-সেবা এবং শিক্ষকতা করেছিলেন। প্রথমে জনৈক ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন ; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে পরিত্যাগ করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন এক ফরাসী মহিলা। দ্বিতীয় স্ত্রী মধুসূদনের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুখে-দুঃখে সর্ব-মুহূর্তে তাঁর সহচরী ছিলেন। মাদ্রাজে আসবার পরের বছর মধুসূদনের **Captive Lady** প্রকাশিত হয়। ইংরেজি কাব্য-রচনায় মধুসূদনের খ্যাতি বিশেষ হল না। এ দেশবাসীর কাছে গৌরবের বিষয় হলেও ইংরেজি সাহিত্যাদর্শের মাপ-কাঠিতে 'ক্যাপটিভ লেডি' একটি তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক ঘটে আকস্মিকভাবে। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে একটি সখের নাট্যশালা ছিল। তাঁরা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক যখন অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, তখন মধুসূদনকে 'রত্নাবলী'র ইংরেজি তর্জমা করতে বলা হয়। উদ্দেশ্য, অভিনয়ের দিন আহূত ইংরেজ বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করা। মধুসূদনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে মধুসূদনের মনে নাটক লেখবার সঙ্কল্প জাগে। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবদ্ধ রীতি পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্ত্য রীতিতে 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করলেন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে 'শর্ম্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হল এবং পরের বছর বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চেই অভিনীত হল। রঙ্গালয়ের সম্পর্কে

থেকেই মধুসূদনের বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগের সূত্রপাত। এ সময় বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন সংস্কার এবং বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, নতুন পরীক্ষা এবং সম্ভাবনার সূচনা হল। মধুসূদন আরও নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন। একটি গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করে 'পদ্মাবতী' রচিত হয় ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে। নাটকে গ্রীক দেবদেবীর পরিবর্তে হিন্দু দেবদেবী বসানো হয়েছে; কিন্তু কোথাও মূল কাহিনীর সৌন্দর্য খর্ব হয় নি; বরঞ্চ নতুন আধারে তা নতুন-ভাবে দ্যুতিমান হয়েছে। এর পর মধুসূদন দুটি সামাজিক প্রহসন রচনা করেন—'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবকদের বিপথ-গমনের চিত্র এঁকেছেন প্রথমটিতে; দ্বিতীয়টিতে তথাকথিত আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের প্রতি শ্লেষ আছে। এ নাটক দুটিতে মধুসূদনের সমাজ-সচেতনতার পরিচয় আছে। সংলাপ-রচনায় আশ্চর্য দক্ষতা এবং সজাগ অনুভূতির পরিচয় মধুসূদন এ নাটক দুটিতে দিয়েছেন। 'পদ্মাবতী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা'র ভাষা শ্লথ ও আড়ষ্ট; কিন্তু প্রহসন দুটি সমাজ-নির্ভরতার জন্যই সমসাময়িক কথ্য ভাষাকে অবলম্বন করেছে।

এর পর মধুসূদন আপন ক্ষমতা সম্পর্কে সজ্ঞান হলেন। তাঁর প্রতিভার পূর্ণপরিণতিরূপে আমরা 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং 'বীরাঙ্গনা'কে পাচ্ছি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমা-সম্ভব'-এর অংশবিশেষ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। একটি পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করে কাব্যটি লেখা। গল্পটি এই—সুন্দ ও উপসুন্দ, দুই অসুর ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা পরাভূত হয়েছেন। পরাভূত দেবতারা প্রকাশ্য যুদ্ধে অসুরদের সঙ্গে জয়ী হতে পারবেন না জেনে ব্রহ্মার সহায়তায় অপরূপ লাবণ্যবতী তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেন এবং তাকে বিন্ধ্য-কাননে রেখে আসেন। সুন্দ ও উপসুন্দ উভয়েই তিলোত্তমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয় এবং একে অন্যকে হত্যা করে। গল্পটি পৌরাণিক বটে, কিন্তু ঘটনা-সংস্থানের কৌশল এবং চরিত্র-পরিকল্পনা ইউরোপীয়। কীটস্-এর Hyperion-এর অনুসরণে মধুসূদন পরাজিত দেবতাদের চিত্র এঁকেছেন; কিন্তু Hyperion-এর প্রগাঢ় অনুভূতির পরিচয় 'তিলোত্তমা-সম্ভব'-এ নেই। ইংরেজি কাব্যে নিবিড় অন্ধকারে পরাজিত দেবচিত্র অন্ধকারের মতোই ভয়াবহ, নিশ্চিন্ত এবং আয়ত্তের অতীত।

'তিলোত্তমা'য় লক্ষযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে নতুন ছন্দ এবং শব্দ-ব্যবহারের পরীক্ষা। মাইকেল জানতেন যে, এ গ্রন্থে মানবীয়বোধের পরিচর্যা ঘটে নি; কিন্তু তবুও নতুন ছন্দ এবং শব্দ-ব্যবহারের কৌশলের দিক থেকে বিচার করে এ কথা বলা চলে যে, 'তিলোত্তমা-সম্ভব' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। এতদিন বাংলা কাব্যে ছিল পয়ার ও ত্রিপদীর একঘেয়ে পদচারণ। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্যে মধুসূদন পুরানো পয়ারকে অবলম্বন করেই তাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রূপান্তরিত করলেন। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্যের প্রথম দুই সর্গ ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রচিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের দুটি সংখ্যায় অনামাঙ্কিতরূপেও সর্গ দুটি প্রকাশিত হয়। চারি সর্গে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম সর্গটি রাজেন্দ্রলালের নিম্নলিখিত ভূমিকাসহ মুদ্রিত হয়েছিল—

"কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকাশিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন ও অন্ত্যযমকের পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরেজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালাতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।"

ইংরেজি **Blank Verse**-এর মূল হচ্ছে পঞ্চপার্বিক আয়ামবিক (iambic)। ইংরেজি সিলেবিক (Syllabic) বা স্বরমাত্রিক হওয়ায়, পর্ব-বিভাগের সময় দুই বা ততোধিক সিলেবলের কোনো শব্দের এক বা দুই সিলেবল এক পর্বে এবং অবশিষ্টাংশ অন্য পর্বে পড়ে। এ কারণে কবিতা-পাঠকালে কণ্ঠ-যতি সর্বত্র ছন্দ-যতিকে অনুসরণ করে না। এ সুবিধা থাকায় আয়ামবিক ছন্দ ব্লাঙ্ক ভার্সের পদ্যভঙ্গিতে সহজে রূপান্তরিত হতে পেরেছে। বাংলা পয়ারে স্পষ্টত এ সুবিধেটা ছিল না। মধুসূদনের পূর্বেকার সকল কবিই ছন্দ-যতি ও কণ্ঠ-বিরতি একই স্থানে রেখেছেন। বাংলা পয়ারে যতি-বিভাগ ছিল নিরঙ্কুশ। একটি ধ্বনিকে সম্পূর্ণ করে যতি পড়তো। এবং ক্ষণ-বিরতির পর নতুন ধ্বনির উদ্ভব হত। তার ফলে চরণগুলো সম-

ধ্বনিবিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে একটি সঙ্গীতময়তা সৃষ্টি করতো। মধুসূদন যতি-বিভাগকে নিরঙ্কুশ রাখলেন না। আমাদের বাচনভঙ্গির স্বাভাবিক সঞ্চরণকে অনুভব করে কণ্ঠ-যতির উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। মধুসূদনের ক্ষমতা অসাধারণ এ কারণে যে, তিনি পয়ারের মতো ঢিমে তালের গতানুগতিক ছন্দের মধ্যেও আশ্চর্য সম্ভাবনা আবিষ্কার করলেন। অমিত্রাক্ষর চরণান্তের মিলকেই কেবল রহিত করলো না, উপরন্তু যতিবিন্যাসে বৈচিত্র্য এনে ছন্দকে অর্থের এবং কণ্ঠধ্বনির অনুগামী করলো। ইংরেজি কাব্যে ব্লাঙ্ক ভার্স উদ্ভাবনার যে-কৃতিত্ব মার্লোর, বাংলা কাব্যে মধুসূদনের কৃতিত্ব তারও অধিক। মার্লো ব্লাঙ্ক ভার্সের পূর্ণ রূপ দিতে পারেন নি, মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে অমিত্রাক্ষরের পূর্ণতা দিয়েছেন। মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকেই প্রথম গদ্যের মধ্যে কোথাও কোথাও অমিত্রাক্ষর পয়ারের প্রবর্তন করেন। সেখানে চরণান্তের মিলটাই শুধু রহিত হয়েছে, অন্য কোনো পরিবর্তন আসে নি।

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য' ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রীক আদর্শে রচিত মহাকাব্য। গ্রীক কাব্যের সৌন্দর্য এবং অসাধারণ দীপ্তিকে মধুসূদন সম্পদ করলেন বাংলা ভাষায়। সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে মধুসূদনের ঋণ উপাখ্যানগত; কিন্তু গ্রীক সাহিত্য এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের কাছে তাঁর ঋণ স্টাইল-বা রচনাশৈলী-গত। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রকার বিশ্বনাথ কবিরাজের নির্দেশসম্মত মহাকাব্য মধুসূদন লেখেন নি, তিনি মহাকাব্যের প্রাণধর্মকে পেতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে মহাকাব্যের অস্থি-সংস্থানের নির্দেশ আছে, যেমন, সর্গ কয়টি হবে, বর্ণনা থাকবে কোন্ কোন্ বস্তুর বা অবস্থার; কিন্তু গ্রীক অলঙ্কার-শাস্ত্রে মহাকাব্যের প্রাণধর্মের ইঙ্গিত আছে, যেমন, ছন্দ ও ভাষা হবে বিষয়বস্তুর অনুগামী এবং সে বিষয়বস্তু হবে বিপুল, ব্যাপক, গভীর এবং উদাত্ত। মহাকাব্যের কবি অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে মানবভাগ্যের চিত্র অঙ্কন করবেন।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ আমরা মানব-জীবনের বিশিষ্ট কোনো একটি দিকের পরিচয় পাই না; কিন্তু মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে কর্মচঞ্চল অবস্থায় দেখি। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে, কবির জীবনোপলব্ধির পরিপূর্ণতা। গ্যেটে 'ফাউস্ট'-সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, 'ফাউস্ট' নাটকে তাঁর

বেদনায় বাণী অপরিচিত ক্ষেত্র থেকে প্রশংসা এনেছে এবং এ প্রশংসা তাঁকে ভীতি-বিহ্বল করেছে। তাঁর স্নায়ুতে কম্পন জেগেছে এবং তিনি ক্রন্দন করেছেন। নতুন প্রাণোন্মাদনায় মাইকেলের স্নায়ুতেও কম্পন জেগেছিল। জীবনের জটিলতা তাঁকে জীবনের বিস্তৃতির এবং বলিষ্ঠতার পরিচয় দেবার সুযোগ দিয়েছে। বিতৃষ্ণা, বেদনা, অশেষ আশা, লাঞ্ছনা, নিষ্ফলতা, সংশয় এবং দ্বন্দ্ব এ কাব্যকে মহিমান্বিত করেছে।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর বিভিন্ন অধ্যায়ে মহৎ কাব্যের লক্ষণ পরিস্ফুট। প্রথম সর্গে সমুদ্রকে লক্ষ করে বীরকুলর্ষভ রাবণ অভিমান এবং আক্ষেপ প্রকাশের মধ্যে জীবনের ক্ষণকালীন বৈকল্যের পরিচয় যেমন দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পরিহাস ও ব্যঙ্গোক্তি এবং অপবাদদূরীকরণার্থে আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেদনের মধ্যে জীবনের পূর্ণতার পরিচয়ও তেমন দিচ্ছে। যে-সমস্ত উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে এ পূর্ণতার পরিচয় পাচ্ছি, তার মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য, গতি এবং বলিষ্ঠতা মূর্ত হয়েছে। প্রথম সর্গের অন্যত্র বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদে রাবণের খেদোক্তি শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। শক্তিধর নায়ক আপন সর্বনাশকে প্রত্যক্ষ করছে; কিন্তু সর্বনাশকে রোধ করবার সামর্থ্য নেই। সম্ভাব্য প্রলয়ের সম্মুখীন হয়েও সে অকম্পিত পদে মৃত্তিকার উপর দণ্ডায়মান থাকতে চায়। এ-ভাবেই 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ আমরা জীবনের প্রকাশ দেখি দ্বন্দ্বের মধ্যে, সর্বনাশের মধ্যে এবং কোলাহল ও আবর্তকে অবলম্বন করে সর্বশেষ বিলয়ের মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর উৎকণ্ঠা এবং অপ্রমেয় আশা রাম-রাবণের সংগ্রামের মধ্যে ফুটে উঠেছে। একথা বলা চলে যে, মধুসূদন সে যুগে জাতির পূর্ণ সচেতন মুহূর্তে বর্তমান ছিলেন। যে-মুহূর্তে জাতির মানস-বিকাশ ঘটে, সে মুহূর্তকে তিনি রূপ দিয়েছেন। মানব-অভিজ্ঞতার উপাদানগুলো যে-কোন যুগে অতি অল্পসংখ্যক লোকের কাছেই ধরা পড়ে, মধুসূদন সে অল্পসংখ্যকদেরই একজন।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ হোমারের 'ওডিসি' এবং 'ইলিয়াদ', ভার্জিলের 'ইনিদ', দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' এবং মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর প্রভাব আছে। এ প্রভাব তিন প্রকারের : প্রথমত, ঘটনা- বা কাহিনী-গত ; দ্বিতীয়ত, ভাষা- বা শব্দব্যবহার-গত এবং তৃতীয়ত, আদর্শগত।

ঘটনার দিক থেকে যে-কয়টি প্রধান মিল বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পাচ্ছি

তা হচ্ছে এই, দ্বিতীয় সর্গে যেখানে 'রক্ষ-কুল-রাজলক্ষ্মী' অন্যান্য দেবতাদের সহায়তায় রামের জয় এবং রাবণের পরাজয় কামনা করছেন, সে অংশের সঙ্গে ওডিসির প্রথম পুস্তকের মিল আছে, যেখানে দেবী এথেনে টেলিমেকাসের সহায়তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। পঞ্চম সর্গে মায়া দেবী 'স্বপন-দেবী'কে নির্দেশ দিচ্ছেন ঘুমন্ত লক্ষ্মণের কাছে যেতে। ইলিয়াদের দ্বিতীয় পুস্তকে জিউস্ স্বপ্নকে নির্দেশ দিচ্ছেন আগামেম্‌ননের কাছে যেতে। অষ্টম সর্গে বিদেশী প্রভাব অনেকটা স্থূলভাবে রূপ পেয়েছে। এখানে একই সঙ্গে দান্তে, হোমার এবং ভার্জিলের অনুকরণ দেখি। মধুসূদন নিজে অবশ্য শুধু ভার্জিলের 'ইনিদ'-এর কথাই লিখেছেন; কিন্তু আমরা 'ওডিসি'র একাদশ পুস্তকের প্রভাবটাই বেশি দেখি। রাম নরকে যাচ্ছেন তাঁর পিতার আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, যেমন ইনিস্ পাতালে গিয়েছিলেন তাঁর পিতা এ্যান্‌কিশিসের আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অথবা যেমন ওডিসিস্ তাঁর মাতার আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন চিরনিশাবৃত মৃত্যুর দেশে। 'মেঘনাদবধ'-এর আরম্ভের দেব-বন্দনা 'ইনিদ'-এর দেব-বন্দনার মতো।

ভাষা বা শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে বিচার করলে এ কথা বলা যায় যে, মধুসূদন বিদেশী ক্লাসিক্যাল ভঙ্গিকে আয়ত্ত করে বাংলা কাব্যকে তার গতানুগতিক বিমর্ষ ক্ষেত্র থেকে মুক্ত করেন এবং তাকে জীবনরসে পরিপূর্ণ করেন। বিশেষণ- এবং উপমা-প্রয়োগের মধ্যেই মধুসূদনের এ-উপলব্ধির পরিচয় স্পষ্ট।

উপমার ক্ষেত্রে মধুসূদন-যে হোমারকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন তার প্রমাণ পাই 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ প্রচুর পরিমাণে সিংহ বা ব্যাঘ্রের এবং অগ্নির উপমা প্রয়োগের মধ্যে। 'ইলিয়াদ' এবং 'ওডিসি'র প্রধান প্রধান উপমাই হচ্ছে সিংহ এবং অগ্নির। মধুসূদনও 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ সিংহের উপমা এবং অগ্নির উপমা বহুবার ব্যবহার করেছেন—সিংহ বা ব্যাঘ্রের ছাব্বিশ বার এবং অগ্নির পনেরো বার। এ-ছাড়া অন্য অনেক উপমায় অবশ্য মধুসূদন বাঙালী জীবন এবং পরিবেশের নিগূঢ় পরিচয় দিয়েছেন।

সর্বশেষে জীবনাদর্শের কথা। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর রাবণ-চরিত্র পরিকল্পনায় একটি বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ মূর্ত হয়েছে। এখানে মিলটনের প্রভাব কার্যকর হয়েছে। প্যারাডাইস লস্ট-এর শয়তান যেমন দুর্জয় বাসনার প্রতীক,

রাবণও তেমনি অশেষ আশা এবং অফুরন্ত শক্তির প্রতীক। রাবণ সমস্ত সংঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হয়েছে। ভাগ্যের বিরূপতা সে জানে; কিন্তু যেহেতু সম্ভাব্য পরিণতি রোধ করা তার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়, তাই সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থাকতে চায়। অনেকে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ গীতিময়তার লক্ষণ পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ চতুর্থ সর্গের অশোকবনে সীতার কাহিনীর উল্লেখ করা হয়ে থাকে; কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, কোমলতা কখনও দুর্ধর্ষতার বিরোধী নয়, বরঞ্চ অনুষঙ্গীই। বিপুল পরিসরের একটি কাব্যে গীতিলালিত্যের প্রয়োজন আছে মহাকাব্যের ভয়াবহ বোধের রিলিফ (relief) বা উপশমের জন্য। তা ছাড়া কাহিনীর দ্রুতগতির মধ্যে কখনও কখনও বিরাম না থাকলে চলবে না। চতুর্থ সর্গ কাহিনীর জন্য এভাবেই একটি রিলিফ এবং প্রয়োজনীয় বিরাম সৃষ্টি করেছে।

মধুসূদনের কাব্য-সাধনার সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ সময় হচ্ছে ১৮৬১-৬২ খ্রীস্টাব্দ। এ দুই বছরের মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয়। রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক খণ্ডকাব্য 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে। এটা বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর আধুনিক পরিণতি। মধুসূদন এগুলোকে 'ওড্' (ode) আখ্যা দিয়েছেন। এখানে কবি রাধা-বিরহের গান গেয়েছেন। তত্ত্ব বা রূপকসম্বলিত বৈষ্ণবভাব এখানে নেই, সহজ লিরিকের ভাবটাই এখানে প্রধান। যেমন—

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে রে
অবিরাম গতি;
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী;
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি? ধিক্ এ কুমতি!
আমার সুধাংশু নিধি— দিয়াছে আমার বিধি—
বিরহ আঁধারে আমি? ধিক্ এ যুকতি!

'বীরাঙ্গনা' প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে। ইতালীয় কবি ওভিদের (Padlius Ovidius Naso—43 B. C.—17 A. D.) Heroides কাব্যের অনুকরণে 'বীরাঙ্গনা' রচিত। ওভিদ প্রাচীন ক্লাসিক্যাল সাহিত্য এবং

পুরাণের বিভিন্ন নায়িকার চিত্ত উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন পত্রাকারে। 'হিরোয়দস'-এর পত্র-সংখ্যা একুশ। এর মধ্যে প্রথম পনেরোটি ওভিদের। অন্য ছ'টি ওভিদের কিনা সে নিয়ে সন্দেহ আছে। প্রথম পনেরোটিই কেবল নায়িকা-পত্র ; কিন্তু পরের ছয়টি নায়ক-নায়িকার উত্তর-প্রত্যুত্তর। 'হিরোয়দস'-এ প্রাচীন কাব্য-খ্যাতা বিভিন্ন পরিত্যক্তা রমণীর কল্পিত পত্র পাই, যেমন ইনিসের কাছে লিখিত দিদোর পত্র, প্যারিসের কাছে লিখিত ইনোনীর পত্র, ইউলিসিসের কাছে পেনিলোপীর পত্র, ইত্যাদি। শুধু আবেগের দিক থেকেই নয়, পরিবেশ এবং ঘটনার দিক থেকেও 'বীরাঙ্গনা'র সঙ্গে 'হিরোয়দস'-এর সাদৃশ্য আছে। 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'কে 'ইউলিসিসের প্রতি পেনিলোপী'র পত্রের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়, 'সোমের প্রতি তারার' সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য পাওয়া যায় 'হিপোলিটাসের প্রতি ফেইড্রা' পত্রের ; 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী' পত্রের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য পাওয়া যায় 'দেমোফোনের প্রতি ফিলিস'-এর পত্রের।

ইতিমধ্যে মধুসূদনের পিতার মৃত্যু ঘটে। যথেষ্ট অর্থের অধিকারী তিনি হন। সে অর্থব্যয়ে দেশে নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন এবং মাতৃভাষার চর্চা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল ; কিন্তু জীবনক্ষেত্রে অধিকতর উচ্চ প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জুন তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের ভার্সেই (Versailles)-এ অবস্থানকালে মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতা'-রচনায় মনোনিবেশ করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শতাধিক সনেট রচনা করেন এবং কলকাতায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে এগুলো প্রকাশিত হয়। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'ই প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের সর্বশেষ কাব্য। ইতালীয় কবি পেত্রার্ক-এর অনুকরণে চৌদ্দ পঙ্‌ক্তির পরিধির মধ্যে একটি ভাবকে সম্পূর্ণতা দান করা মধুসূদনের পক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। তা ছাড়া এ গ্রন্থেই মধুসূদনের অপূর্ব মাতৃভূমি-প্রীতির পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে ; বিদেশে নির্বান্ধব পরিবেশে মাতৃভূমির কথা তাঁর মনে জেগেছে এবং তিনি দেশের নদী, নদীতীরের বটবৃক্ষ, শ্যামা-পক্ষী, শিব-মন্দির এ সবের প্রতি অদম্য আকর্ষণ অনুভব করেছেন। এ আকর্ষণ-যে কত আন্তরিক, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনাবিল তার পরিচয় আমরা পাই 'বঙ্গভাষা' কবিতায় :

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পর-দেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে !'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ফিরে এসে মধুসূদন ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেন ; কিন্তু আইন-ব্যবসায়ে তিনি চরমভাবে ব্যর্থকাম হন। অর্থাগম-যে হয় নি তা নয়, কিন্তু সমস্ত অর্থ ব্যয় হত পান-ভোজনে এবং অন্যবিধ অপব্যয়ে। তিনি ঋণগ্রস্ত হন, অবশেষে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। গৃহহীন, সহায়-সম্বলহীন রোগাক্রান্ত কবি ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ২৯এ জুন আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। এর দু'দিন পূর্বেই তাঁর পত্নীর মৃত্যু ঘটেছিল।

দেশে ফিরে এসে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় মধুসূদন আর কিছু রচনা করেন নি। অভাবের তাড়নায় 'মায়াকানন' নামে একটি নাটক, শিশুপাঠ্য নীতিমূলক কবিতামালা এবং 'হেকটর-বধ' নামে একটি গদ্যকাব্য লেখবার চেষ্টা করেছিলেন। কোনটাই শেষ হয় নি।

মধুসূদন তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একসময় লিখেছিলেন যে, তাঁর আবির্ভাব হবে ধূমকেতুর মতো। সত্যিই ধূমকেতুর মতো অপরিচয়, আকস্মিকতা এবং অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য নিয়েই আমাদের সাহিত্যাকাশে তিনি অতি সংক্ষিপ্ত কালের জন্য সঞ্চরণ করেছিলেন।

দুই

মেঘনাদবধ কাব্যে উপমা

কবির কর্তব্য হচ্ছে মানুষের মনের তরঙ্গবিক্ষোভ, স্রোতোধারা এবং গভীর অতলতাকে চিত্রিত করা। তিনি পৃথিবীর দীনতা এবং দীপ্তিকে প্রকাশ করবার জন্য উপযুক্ত শব্দের সন্ধান করেন। যে-ভাষার ঐশ্বর্য তাঁর সকল উচ্চারণের আভরণ, একটি সুনিশ্চয় অধিকারে সে ভাষার সচল শব্দ-সামগ্রীকে তিনি তাঁর উপলব্ধির প্রতীক করেন। মানুষের বিশ্বাস এবং গভীরতম চেতনা, প্রকৃতির বিবিধ বিকাশ কবির শব্দ ও সুরে উষাকালের সূর্যোদয়ের মতো প্রতি মুহূর্তেই বিস্ময়ের শিখা।

কবি আপন ভাষার মৌলিক শব্দভাণ্ডার এবং বাক্যের অন্বয়-শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করেই তার মধ্যে নতুন ভাবস্পন্দন এনে থাকেন এবং এভাবেই মহাকাব্যে জীবনোপলব্ধির পরিপূর্ণতা জাগে। চরিত্রনির্মাণে, ঘটনা এবং অবস্থার বর্ণনায় এবং সর্বোপরি কাহিনীকে রূপ দেওয়ার মধ্যে এ পরিপূর্ণতার পরিচয় পাই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কবি জীবনের বিস্তৃতির এবং বলিষ্ঠতার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন।

চরিত্রনির্মাণে পরিপূর্ণতা প্রতিষ্ঠার জন্যে কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপমার ক্রমপ্রসার এবং অবিরল ব্যঞ্জনার সুযোগ নিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সর্গে আমরা প্রমীলার পরিচয় পাই। প্রমীলা স্বামী-বিরহে কাতরা এবং স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায় দ্বিধাহীন ও একাগ্রচিত্ত। সম্পূর্ণ সর্গে প্রমীলার যে-পরিচয় পাই তা সবদিক থেকে পরিপূর্ণ। এমন কখনও মনে হয় না যে, প্রমীলা বিভিন্ন মুহূর্তে কারণ-বিশেষে বিভিন্ন আবেগের অধীন হয়েছে; কিন্তু মনে হয় যে, তার সম্পূর্ণ সত্তা একটা বিশেষ সত্যকে জাগ্রত করতেই উন্মুখ হয়েছে। তার চরিত্রের পূর্বাপর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না, সম্পূর্ণ জীবনের প্রবাহেরও পরিচয় আমরা চাই না। যে-মুহূর্তে সে প্রকাশিত সে মুহূর্তেই সে সম্পূর্ণ এবং সে মুহূর্তেই তার চরিত্র সর্বরূপে বিকশিত। কবি এই পরিপূর্ণতার পরিচয় এনেছেন সহধর্মী উপমার ক্রমপ্রসার ও অবিরল

ব্যঞ্জনা এনে। বেদনা-ব্যাখ্যায় এবং আবেগের তীব্র গতি—উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমপ্রসারিত সহধর্মী উপমার প্রয়োগ করা হয়েছে। সর্গের আরম্ভেই বেদনা-ধর্মী উপমার ব্যঞ্জনা রয়েছে :

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমতি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে!—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীতধ্বনি।

এখানে শৃঙ্খলিত রূপে অনেকগুলো উপমা এসেছে এবং সব কয়টি উপমা মিলে এমন একটি আচ্ছন্ন অবস্থার পরিচয় এসেছে যার মধ্যে কোনও ছেদ নেই—একটি পরিপূর্ণ নিঃসংশয় বেদনার আচ্ছন্নতা। কৃষ্ণ-বিরহে সংসারের সর্বকৃত্য থেকে রাধার যে-বেদনাময় মূর্তি এবং অনুক্ষণ বিবশা রাধার যে-ব্যাকুলতা তার সঙ্গে এখানে প্রমীলার ব্যাকুলতার তুলনা করা হয়েছে। আবার শূন্য-নীড়ে উদ্‌ভ্রান্ত কপোতীর উপমাও আনা হয়েছে এবং সর্বশেষে সমস্ত আনন্দের নীরবতার ছবি তিনি এঁকেছেন একথা বলে যে, "নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা, গীতধ্বনি"। আরও কিছুদূর গিয়ে অন্য একটি উদাহরণের মধ্যে একই বেদনার পরিচয় পাই :

কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে?

কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে ;—
'তোর লো যে দশা এই ভোর নিশা-কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা !

প্রমীলার মানসিক অবস্থার পরিচয় পেলাম। কবি বিভিন্ন উপমা এবং উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে এ অবস্থার একটি একাগ্র রূপ আঁকতে চেয়েছেন। এখানে উপমার প্রয়োগ না হলে আমরা শুধু একটি অবস্থার বিবৃতি পেতাম : কিন্তু প্রমীলার সম্পূর্ণ পরিচয় পেতাম না। উপমাবিহীন বেদনা-বিবৃতি হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এর শচী চরিত্রকে অত্যন্ত লঘু, অস্পষ্ট ও অস্বাভাবিক করে তুলেছে। 'বৃত্রসংহার'-এর চতুর্থ সর্গে শচীর মানসিক অবস্থার পরিচয় হেমচন্দ্র দিয়েছেন। শৃঙ্খলিত উপমার ব্যঞ্জনায় চরিত্র-যে কত উজ্জ্বল হয় তার পরিচয় আমরা প্রমীলার ক্ষেত্রে দেখেছি, শচীর ক্ষেত্রে দেখবো যে, নিছক বেদনাবিলাস বিলাপে রূপান্তরিত হয়ে চরিত্রকে সম্পূর্ণ নির্জীব করেছে :

সায়াহ্নে সখীর সনে বসিয়া নৈমিষ বনে,
শচী কহে সখীরে চাহিয়া।
'বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন,
থাকিব লো মরতে পড়িয়া ॥
না হেরে অমরাবতী, চপলা, দুঃখেতে অতি,
আছি এই মানব-ভুবনে।
না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা,
পুনঃ কবে পশিব গগনে ॥

মধুসূদন প্রমীলার পরিচয় এনেছেন বিভিন্ন উপমা এবং উৎপ্রেক্ষায়, প্রমীলার সাজসজ্জা এবং যাত্রার ব্যাখ্যায়। এ ব্যাখ্যায় আমরা আবেগের তীব্রতায় একটি দ্বিধাহীন নিশ্চিন্ত গতির পরিচয় পাই। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

ক. কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?

খ. রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা ! কিরীটছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ ।

গ. চলিলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা ।

ঘ. যথা বায়ু সখা সহ দাবানল গতি
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে ।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু, উড়িল চৌদিকে ;
কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নিশিখা ? অগ্নি-শিখা তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে ।

প্রথম উপমাটি, একটি বিশেষ আবেগের পরিচয়সূচক সর্বশেষ এবং সর্বসম্পূর্ণ ইঙ্গিত। উচ্চ পর্বতের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নিম্নগতি নদী-যে সমুদ্রের দিকে দ্রুতগামী, গতির পরিচয় অর্থে এটাই কি সর্বশেষ অলঙ্কার নয় ? এখানে প্রশ্নের অপেক্ষা নেই। এই উপমায় কবির নিশ্চিন্তবোধের পূর্ণজ্ঞানের স্বীকৃতি আছে। কবি যদি প্রান্তিক প্রবহমাণ নদীর গতির কথা বলতেন, তাহলে সে গতি দ্বিধাহীন এবং নিশ্চিন্ত হতো না, সেখানে মন্থরতার সুযোগ থাকতো। একই তীব্রতা, বিমুক্ত প্রসার এবং সমগ্রপ্রাণতার পরিচয় দাবানলের উপমার মধ্যে এসেছে। বায়ুর সহযোগিতায় দাবানলের গতি যেমন দুর্বার, প্রমীলার গতিও তেমনি দুর্বার ও নিঃশঙ্ক।

চতুর্থ সর্গে করুণাবোধের অনুষঙ্গী বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা এবং অনবরত বিভিন্ন সমান্তরাল উপমার প্রশ্রয়ে সীতা-চরিত্র যেভাবে ভাস্বর হয়েছে, অন্য

কোন উপায়ে সীতাকে সেভাবে স্পষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। মধুসূদন এই সর্গে বাংলা শব্দের সম্ভাবনাকে অনেক দূর বিস্তৃত করেছেন। যে-ভাষায় হৃদয়াবেগের বিবৃতি মাত্রই ছিল সজীব প্রাণ-পরিচয়ের সর্বশেষ কথা, সে ভাষাকে উপমারূপকের প্রাচুর্যে উচ্ছল করে নিবেদিত-প্রাণ এবং সর্বংসহা সীতা-চরিত্রের উজ্জীবন অসাধারণ কুশলতার পরিচায়ক। মধুসূদনের সময়ে ব্যবহৃত বাংলার মৌলিক শব্দ-ভাণ্ডারে-যে এত ঐশ্বর্য এবং সম্ভাবনা নিহিত ছিল তা তখন কে ভাবতে পেরেছিল ? অন্ত্যযমক নির্বিচারে পরিহার করে যতিকে অর্থব্যক্তির প্রয়োজনে বিভিন্ন রূপে বিন্যস্ত করে এবং অনবরত উপমারূপকের ক্রমপ্রসার ও অবিরল ব্যঞ্জনায় বাংলা ভাষাকে তিনি যে-অসাধারণ শক্তিশালী করেছিলেন তার পরিচয় 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রমীলা ও সীতা-চরিত্র বিকাশের মধ্যেই পাই। চতুর্থ সর্গে সীতা সরমার কাছে আপন বেদনার পরিচয় দিচ্ছে। এখানে সে একান্তভাবে স্মৃতিনির্ভর ; কিন্তু সর্বপ্রকার আচ্ছন্নতা-মুক্ত। বেদনা-সমর্থিত উপমা প্রয়োগ করে সে সমস্ত ইতিহাসকে দৃষ্টিগোচর করেছে। অনেকগুলো উপমার ক্ষেত্রে মধুসূদন একই সঙ্গে ধ্বনিমাহাত্ম্য এবং ব্যাখ্যাসূত্রকে অবলম্বন করেছেন। এটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, কবিতায় ধ্বনির বোধ প্রতিটি শব্দকে প্রাণবন্ত করে। একই সঙ্গে আরম্ভ এবং শেষ, আদিম ও বর্তমানকে সন্ধান করে। শব্দার্থের বিচিত্র ব্যঞ্জনায়, আমরা একই সঙ্গে প্রাচীন বিলুপ্ত সংস্কারকে এবং আধুনিক সচেতনতাকে পাই। ধ্বনি-বোধের এহেন পথযাত্রাকে শ্রোত্রকল্পনা বলতে পারি।

এ শ্রোত্রকল্পনায় কবির অভিজ্ঞতার বিন্যাস আছে। বিস্ময় এবং আনন্দ, শঙ্কা এবং জাগরণ পাঠকের হৃদয়েও সাড়া জাগায়। তাই বলা হয়ে থাকে যে, মহৎ কবিতার উপলব্ধিতে পৌঁছুতে হয় ; কিন্তু সাধারণ চেতনার কবিতাকে আমরা অনবরত অতিক্রম করে আসি।

চতুর্থ সর্গ থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

ক. হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে !
মলিন-বদনা দেবী, হায়রে যেমতি

খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে !

খ. বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।

গ, হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রবি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !

বিভিন্ন ব্যঞ্জন-ধ্বনি-সাম্যে তো বটেই, অধিকন্তু আবেগ-নির্ভর উপমার প্রশ্রয়ে বিস্ময়, আনন্দ এবং জাগরণের পরিচয় এসেছে। উপমা যদি বিস্ময় এবং আনন্দ না জাগায় এবং উপমেয়র নিঃসংশয় প্রাণ-চেতনাকে যদি জাগ্রত না করে তবে সে উপমার কোনো মূল্য নেই। উপমানের দ্বারা উপমেয় অনেক ক্ষেত্রে অলঙ্কৃত হয়, কিন্তু অলঙ্কারই তার শেষ নয়—লক্ষ রাখতে হবে যে, অলঙ্কৃত হয়ে বস্তু-রূপ সজীব হয়েছে কিনা। কালিদাসের কাব্যে অলঙ্কার সৌন্দর্য-হেতু কিন্তু সেখানে সৌন্দর্যই জীবন এবং সৌন্দর্যেই সমস্ত কল্পনার শেষ, তাই কালিদাস অনবরত সৌন্দর্যের মধ্যেই সমস্ত প্রাণের জাগরণ দেখেছেন। কালিদাসের কাব্যে গতিময় উপমাও সৌন্দর্য-হেতু। আমি এখানে 'রঘুবংশ' থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

ক. বৈদর্ভনির্দ্দিষ্টমসৌ কুমারঃ, ক্লৃপ্তেন সোপানপথেন মঞ্চম্।
শিলাবিভঙ্গৈর্মৃগরাজশাবস্তুঙ্গং নগোৎসঙ্গমিবারুরোহ ॥

। সিংহশাবক যেরূপ শিলাভঙ্গী দ্বারা উন্নত পর্বতশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ কুমার অজ সুনিশ্চিত সোপানমার্গ দ্বারা ভোজরাজ-নির্দিষ্ট অত্যুচ্চ মঞ্চে আরোহণ করলেন ॥

খ. তাং সৈব বেত্রগ্রহণেনিযুক্তা রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায়।
সমীরণোত্থেবতরঙ্গলেখা, পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীম্ ॥

। অনন্তর পবনবেগে সমুত্থিত তরঙ্গমালা যেমন মানস-সরোবরস্থিত রাজহংসীকে এক পদ্ম হতে অন্য পদ্মের নিকটে নিয়ে যায়, তেমনি প্রতিহারী সুনন্দা রাজকুমারীকে অন্য এক রাজার সন্নিধানে নিয়ে গেল ॥

গ. সঞ্চারিণী দীপশিখৈব রাত্রৌ, যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥

। রাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা অতিক্রম করে গেলে রাজ-পথস্থিত অট্টালিকাসমূহ যেরূপ তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হয়ে থাকে, তদ্রূপ বিধাতার অতি মনোহর-দৃষ্টিস্বরূপ ইন্দুমতী যে-যে-রাজাকে অতিক্রম করতে লাগলেন, তাঁরা সকলেই বিষাদে বিমর্ষভাব ধারণ করলেন ॥

উপরের তিনটি উদাহরণেই গতির কথা আছে ; কিন্তু গতি হিসাবে তাদেব নিজস্ব কোনো সত্তা নেই। গতিকে সজীব করবার জন্যে উপমা নির্মিত হয় নি, সৌন্দর্যের প্রকাশের জন্য গতির আদেশ সৃজিত হয়েছে। প্রথম উদাহরণে উপমেয় হচ্ছে—কুমার অজ-কর্তৃক সোপান বেয়ে মঞ্চে আরোহণ। এর উপমান হচ্ছে সিংহ-শাবক-কর্তৃক শিলাভঙ্গী দ্বারা উন্নত পর্বতশিখরে আরোহণ। এ উপমায় আরোহণের বিশেষ পদ্ধতি নয়, কিন্তু আরোহণকালে সুঠাম দেহ-বিন্যাসের সৌন্দর্যই কবির লক্ষ্য ছিল। দ্বিতীয় উদাহরণে চলমান মুহূর্তে যৌবনবতী রাজকুমারীর দেহ-তরঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এখানকার উপমেয় সংক্ষিপ্ত পদচারণের সংবাদ, কিন্তু উপমান সৌন্দর্য-হেতু বিস্তৃত—এক পদ্ম হতে অন্য পদ্মের নিকট রাজহংসীর নিছক গমন নয়, কিন্তু তরঙ্গায়িত দেহের সচল ছন্দ। তৃতীয় উদাহরণেও

গতির কথা আছে, কিন্তু গতিকে অতিক্রম করেছে ইন্দুমতীর দেহসৌষ্ঠব এবং রূপপ্রভা, যাকে কবি বলেছেন সঞ্চারিণী দীপশিখা।

নিছক সৌন্দর্য-বর্ণনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের উপমা তীক্ষ্ণ ও সজীব নয়, অনেকটা মধ্যযুগীয় 'চন্দ্রের জিনিয়া রূপ'-এর মতো, যেমন :

একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন।

অথবা—

কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!

অথবা—

রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে!
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুরাতি,
কেননা হইবে সুখী, সর্বজন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি ভুবন-মোহিনী।

এ প্রকৃতির উপমা মধুসূদনের কাব্যে বিরল না হলেও মধুসূদনের বিশিষ্টতা খুঁজতে হবে অন্য ক্ষেত্রে—গতিময় উপমার ক্ষেত্রে, প্রগাঢ় উপমা এবং বাঙালী জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত উপমা-ব্যঞ্জনায়। বাংলা কাব্যে এগুলো নতুন সৃষ্টি। এ নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদন হোমারের কাছে ঋণী।

আমি এখানে অনেকটা বিস্তৃতভাবে হোমারের উপমা-সম্পর্কে একজন ইংরেজ সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করবো। বাংলাতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো আলোচনা এ-পর্যন্ত হয় নি বলে, এতটা ব্যাপক উদ্ধৃতির প্রয়োজন অনুভব করছি। সমালোচক হোমার-এর উপমাকে বলছেন 'ব্যাখ্যাযুক্ত চিত্রকল্প'। সাধারণ নিয়মে একটি বিশেষ বর্ণনায় উপমা-সংখ্যা বর্ণিত ঘটনার ব্যস্ত-অনুপাতে হয়ে থাকে। যেখানকার বর্ণিত ঘটনা প্রচুর, দ্রুতগতি

এবং বিচিত্র সেখানে উপমা অনেকটা সীমাবদ্ধ ; কিন্তু যেখানে বর্ণনা ঘটনা-বহুল নয় সেখানে চিত্রকল্পই প্রাধান্য পেয়েছে। 'ইলিয়াদ'-এ উপমা প্রাধান্য পেয়েছে—কেননা সেখানে ঘটনার গতি সহজ, কিন্তু 'ওডিসি'-তে এর বিপরীত।

> The first book of the Iliad is remarkable above the rest for the number and diversity of its historical events : it contains, accordingly, not one simile. The same is the case with the three opening cantos of the Odyssey. The battle pieces of the Iliad, on the other hand, where the action, however turbulent, is uniform, even monotonous in its details, offers the greatest profusion of similes. This may also, in part, be owing to the exciting nature of the subject...... In conformity with the same general law, the poet's similes are almost exclusively confined to the narrative or descriptive element of the two poems.

অর্থাৎ ইলিয়াদের প্রথম পুস্তক ঐতিহাসিক ঘটনার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ থেকে বিশিষ্ট। এ অংশে একটিও উপমা নেই। ওডিসির প্রথম তিনটি সর্গের অবস্থাও তাই। অপর পক্ষে ইলিয়াদের যুদ্ধ-বর্ণনার ক্ষেত্রে উপমার প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়—সেখানে ঘটনা যতই তীব্র ও আবর্তিত হোক না কেন, প্রধানত তা' বিস্তৃত, বৈচিত্র্যহীন ও সমতালের। অবশ্য বর্ণনা উত্তেজনামূলক বলেও অংশত উপমার প্রাচুর্য ঘটেছে হয়তো। ......একই সাধারণ নিয়মে একথা বলা চলে যে, উভয় গ্রন্থেই কবির উপমাগুলো বর্ণনামূলক অংশেই প্রধানত পাওয়া যায়।

কোনো মহান দৃশ্য অথবা বীভৎস ভয়াবহ দৃশ্য, অথবা সংগ্রামরত সৈন্যদল অথবা বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব হোমারকে বিভিন্ন সমান্তরাল বিচিত্র উপমা নির্মাণের সুযোগ দিয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় তিনি সহধর্মী অনেকগুলো উপমা পর পর সাজিয়ে গেছেন। কখনও বা একই উপমার পুনরাবৃত্তি করেছেন :

> The sight of some sublime or terribe object of armies in

battle array, or the war of hostile elements, seem to transport him, almost against his better judgment, into a profusion of equally vivid illustrations. In such cases he does not hesitate to borrow several figures in succession from the same class of natural phenomena. Nor does he disdain to avail himself of the same simile, on a recurrence of matter.

যে-বস্তুর শক্তি বা সৌন্দর্য-সম্পর্কে আমরা অধিকতর অবহিত সে বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয় অপেক্ষাকৃত অল্প অবহিত বস্তুর। যেমন, নায়কের বীরত্ব অথবা শক্তিকে রূপ দেবার জন্য, তাকে তুলনা করা হয়, যখন সে শত্রুব্যূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে—সিংহের সঙ্গে, যে-সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ছে বলীবর্দের উপর। উপমেয়কে রূপ দেবার জন্য এখানে উপমান যথাযথ হয়েছে। অক্রমণের তীব্রতা ব্যাখ্যার জন্য এবং আক্রমণকারী-যে আক্রান্ত শত্রুর চাইতে বলশালী, তা প্রমাণ করবার জন্য এ উপমা যথেষ্ট সঙ্গত।

A poetical simile may be defined, the illustration of one object with which the reader is assumed to be less familiar, by a comparison with some other of which he is supposed to have a better knowledge......where the poet, wishing to magnify the extraordinary courage or strength of a hero, likens him, when rushing on the hostile ranks, to a lion rushing on a herd of oxen, the figure is both appropriate and exact in respect of the matter to be exemplified, the fury of the assault and the superiority of the assailant to his adversaries.

হোমার উপমা অলঙ্কারের দিকটিকে বিস্তৃত করেছেন এমনভাবে যে. শেষ পর্যন্ত উপমা তার নিজস্ব বেষ্টনরেখা অতিক্রম করেছে—যাকে সমালোচক বলছেন :

the extension, namely, or enlargement of the comparison beyond the limits of the comparison itself.

হোমারের উপমার ক্ষেত্রে আমার সর্বশেষ উদ্ধৃতি :

> **There are two main purposes for which similies may be introduced : first, that of ilustrating the mode, secondly, that of marking the degree in which an action or, object is exhibited. In the latter case, any close correspondence between the two members of the parallel is the less to be expected. The figure here, in fact, often becomes rather a poetical hyperbole than a comparison. When, for example, Achilles sweeping the fleeing enemy before him is compared to a fire ravaging a forest, the figure is purely hyperbolical. Still, however, it is appropriate, as enhancing the irresistible ardour of the hero, and the rapidity of his destructive power.**

দুটি প্রধান উদ্দেশ্যে উপমা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে : প্রথমত, বস্তুর চিত্রকল্প নির্মাণের জন্যে ; দ্বিতীয়ত, ঘটনার প্রকাশমান রূপের তীব্রতা বা গভীরতা নির্ধারণের জন্যে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে জাতিগত ঘনিষ্ঠতা না থাকাই সম্ভবপর। বস্তুত এখানে উপমাটি কাব্যগত অতিশয়োক্তির রূপ নিয়ে থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ, একিলিস পলায়নকারী শত্রুসৈন্য ধ্বংস করে চলেছে, এ ঘটনাকে 'দাবানল একটি বনকে গ্রাস করছে'—এর সঙ্গে তুলনা সম্পূর্ণভাবেই অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। অতিশয়োক্তি হয়েও এটা যথাযথ, কেননা এখানে নায়কের অপ্রতিরোধ্য আবেগ এবং ধ্বংস-ক্ষমতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

হোমারের অনুকরণে মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ প্রচুর পরিমাণে গতিময় উপমা নির্মাণ করেছেন। শুধু প্রকৃতির দিক থেকেই সমধর্মী নয়, বিষয় বা আদর্শের দিক থেকেও উভয়ের উপমা একজাতীয়। হোমারের কাব্যে সিংহ এবং অগ্নির উপমা এসেছে অনবরত। মধুসূদন হোমারের অনুকরণে বহুবার সিংহ এবং অগ্নির উপমা ব্যবহার করেছেন। আমি এখানে বিশ্লেষণের সুবিধার জন্যে প্রথমে সিংহ এবং ব্যাঘ্রের উপমা এবং পরে অগ্নির উপমা উদ্ধৃত করব।

সিংহ এবং ব্যাঘ্রের উপমা :

১. অগ্নিময় চক্ষু যথা হর্য্যক্ষ সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে।

২. শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা।

৩. ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি—
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি—
কেশরী-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে !

৪. উল্লাসে দেব চলিলা অমনি
ভাঙ্গিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে।

৫. কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী—
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী।

৬. কাল সিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার সতর্ক সতত—
উচিত থাকিতে তার। কখন, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে !

৭. দক্ষিণ দুয়ারে ফেরে কুমার অঙ্গদ—
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে।

৮. দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!

৯. একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী! সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!
'রক্ষ, নাথ', বলি আমি পড়িনু চরণে
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দূলে
মুহূর্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি
সেই শার্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!

১০. মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?

১১. অতি দ্রুত চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।

১২. ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী..................

অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ-শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।

১৩. বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র।

১৪. চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে বাঘিনী যেমতি—
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে।

এ সমস্ত উপমাকে বস্তু-বর্ণনা বলা চলে না, কেননা এ সব ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট বস্তুকে অলঙ্কৃত করা হয় নি, অধিকতর মনোহর করবার চেষ্টাও নেই। চেষ্টা আছে বস্তুকে ব্যাখ্যা করবার, তার শক্তি-নির্ণয়ের এবং তার প্রাণধর্ম নির্ধারণের। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই মধুসূদন-যে সার্থক হয়েছেন তা বলা চলে না। সম্পূর্ণ নতুন একটা কিছু নির্মাণের আবেগে অনেক সময় কবি প্রয়োগসিদ্ধতার কথা চিন্তা করেন নি। তৃতীয় উদাহরণটি এর একটি নিদর্শন। কামদেবের ফুল-ধনু ভবানীর বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করল যেন কেশরিণীর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করল সিংহ-শাবক। এখানে অসঙ্গতি প্রকাশ পেয়েছে। ফুল-ধনু আশ্রিত হয় না—চঞ্চল করে এবং রিরংসা জাগায়।

প্রথম উপমাটি সংবাদ-পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তাই তার বিস্তার আছে এবং ব্যাখ্যা আছে। রামচন্দ্র আক্রমণ করলেন কুমারকে যেমন করে সিংহ আক্রমণ করে বৃষকে। মূলত এ দুটিই হচ্ছে সমান্তরাল ঘটনা; কিন্তু কবি বৃষস্কন্ধে সিংহের লম্ফপ্রদানকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। কবির লক্ষ্য হল রামচন্দ্রের আক্রমণের উপর এ-সমস্ত গুণ আরোপ করা।

দ্বিতীয় উদাহরণে সিংহ এসেছে গৌণভাবে। এখানে মুখ্য উপমান হল ব্যাধদল-কর্তৃক গহন-কানন-বেষ্টন।

অষ্টম উদাহরণে সীতার অসহায়তার সঙ্গে রাক্ষসদের নিশ্চিন্ততার প্রতিতুলনা নির্মিত হয়েছে—একদিকে হীন-প্রাণা হরিণী, অন্য দিকে নির্ভয়-হৃদয় বাঘিনী। উপমাটি এখানে অত্যন্ত সজীব এবং আশ্চর্যরূপে যথাযথ।

নবম উদাহরণে মধুসূদন একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করেছেন। এটাকে বলতে পারি স্মৃতি-নির্ভর বেদনাবৃত্তি। উপমানের একটি বিস্তার আছে, যাকে বলা যায় illustrative imagery। ভার্জিলের 'ইনিড'-এর মধ্যে এ ধরনের কাহিনীগত চিত্রধর্মী উপমা আছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। উদাহরণটি একটি ইংরেজী অনুবাদ থেকে নেওয়া :

So speaks the god, and quicker than he speaks he smooths the swelling seas, and scatters the collected clouds, and restores the day. Cymothoe and Triton together lend their help, and push the ships off the jugged rocks ; he himself heaves them with his trident, and opens the vast quicksands, and calms the water's surface ; and lightly with his wheels glides over the crests of the waves. As oft we see, when in a great crowd, arises suddenly a tumult, and the ignoble crowd race angrily ; their fury finds them with brands and stones begin to fly ; but presently, if they chance to see a man dignified by propriety and virtues, they are slient and stabbed by with listening ears ; he guides their souls by his words, and soothes their passions. Thus all at once is hushed the roaring of the sea, as the Father looking out o'er its surface, and borne onwards through the cloudless sky, guides his steeds, and as he flies, loosens the reins to speed his gliding car.

দেবতা কথা বললেন। কথা বলার চেয়েও দ্রুততার সঙ্গে তিনি উত্তাল সমুদ্রকে শান্ত করলেন এবং পুঞ্জীভূত মেঘরাশিকে ইতস্তত ছড়িয়ে দিয়ে দিবসের সূর্যকে মেঘমুক্ত করলেন। সাইমোথোয়ে ও ট্রিটনের সহযোগিতায় দেবতা শিলাস্তূপে আবদ্ধ জাহাজগুলোকে বাইরে ঠেলে মুক্ত করে দিলেন। তিনি ত্রিশূল দিয়ে শিলারাশিকে স্তূপীকৃত করলেন, চোরাবালিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পথ তৈরী করলেন আর সমুদ্রকে শান্ত করলেন। সমুদ্রের তরঙ্গমালার উপর দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর রথের চাকা চালিয়ে নিয়ে

গেলেন। মাঝে মাঝে আমরা যেমন দেখি যখন কোন জনমণ্ডলীর মধ্যে আকস্মিকভাবে গোলযোগের সৃষ্টি হয় বা নিম্নজাতীয় জনতা ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তখন ক্রোধবশত তারা হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং পাথর বা অস্ত্রাদি ছুঁড়ে মারতে থাকে ; কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্রে কোন মর্যাদাসম্পন্ন ও পুণ্যবান ব্যক্তির আবির্ভাব হলে তারা নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শোনে। সেই পুণ্যবান ব্যক্তি তখন অমৃতবচনে তাদের আত্মার পথ নির্দেশ করেন এবং তাদের উত্তেজনাকে প্রশমিত করেন। ঠিক তেমনি দেবতাও সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে সমুদ্রের গর্জনও আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় ; আর তাঁর অশ্ব-দল এগিয়ে চলে। রথের গতি দ্রুত করার জন্য তিনি হাতের বল্গা শিথিল করে দেন।

অগ্নির উপমা :

১. সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।

২. শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ—
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।

৩. অমনি অম্বিকা
স্বর্ণ বরণ সম কায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা অবসানে
ঢাকিল বদনশশী, কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হায় লুকাইলা।

৪. যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।

টলিল কনক-লঙ্কা, গৰ্জ্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জে পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা ? অগ্নি-শিখা তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।

৫. চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে।

৬. যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশদিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে !

৭. অগ্নিময় আকাশ পুরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয়গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে।

৮. যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারিদিকে আইল ধাইয়া
পৌরজন।'

৯. চলিলা অঙ্গনা,
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।

১০. দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী।

১১. রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিল দূতে।

১২. জ্বলিছে অম্বর যথা ঘন দাবানলে।

১৩. যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে।

১৪. হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমেষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজি।

১৫. দেবদল, তেজোহীন এবে,
পলাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা, বহিলে প্রবলে
পবন।

এ উদাহরণগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, মধুসূদনের অগ্নির উপমা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সিংহ-ব্যাঘ্রের উপমার চেয়ে সঙ্গততর। সিংহ-ব্যাঘ্রের ক্ষেত্রে অপরিচয়ের জন্যই উপমা সর্বত্র যথাযথ হয় নি ; কিন্তু অগ্নির বিভিন্ন রূপ, পরিচিত সীমানার মধ্যে, বাঙালী জীবনে অত্যন্ত সত্য ও নৈমিত্তিক। শুষ্ক তৃণে অগ্নি-প্রজ্বালন, গ্রাম্য-গৃহে অগ্নিদাহন, বনস্থলে দাবানলের ধ্বংসলীলা —বাঙালী জীবনে অপরিচিত ব্যাপার নয়। এ চিত্রগুলোকেই মধুসূদন বারবার ব্যবহার করেছেন, এ উপমাগুলো আপন অধিকারেই প্রতিষ্ঠিত।

আরও স্পষ্টভাবে বাঙালী জীবনের আনন্দ, আচরণ এবং বিশ্বাসের পরিচয়সূচক অনেকগুলো উপমা মধুসূদন ব্যবহার করেছেন, যেমন :

হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড়া শস্য ক্ষত কৃষীবলদলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে।

অথবা—

বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসববাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে।

অথবা—

বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।

অথবা—

ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।

মধুসূদন উপমা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রীক কাব্যরীতিকে আদর্শ করেছিলেন, একথা পূর্বেই বলেছি। সিংহ এবং অগ্নির উভয় উপমাই হোমার থেকে গৃহীত; কিন্তু অগ্নির উপমার ক্ষেত্রে অনুকরণ বা অনুসরণের পরিচয় নেই। সিংহ বা ব্যাঘ্রের উপমার ক্ষেত্রে অনুকরণ অনেক বেশি স্পষ্ট। এখানে একই উপমার পুনরাবৃত্তি-সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

যে-যুগে হোমার কাব্য রচনা করেছিলেন সে যুগে শ্রোতার আনন্দময় স্বীকৃতি দ্বারা কাব্যের মূল্য নির্ণীত হত। একত্রিত শ্রোতৃবর্গ কাব্যের পাঠক্রম অনুসরণ করে কবিতার রসাস্বাদ করত। এ কারণে কবিকে বিশেষ কতকগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হত। শ্রোতা যাতে কাহিনীকে অনুসরণ করতে পারে এবং অনুসরণের সময় যাতে কোন প্রতিবন্ধকতা না জাগে সেজন্যে ব্যাখ্যাযুক্ত দীর্ঘ উপমার প্রয়োজন হয়েছে, একই উপমার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবং ব্যক্তি-নির্দেশক বিশেষণের ব্যবহার ঘটেছে। কবি শ্রোতার জন্যে কোনো কিছু রেখে দেন নি। বক্তব্যের মর্মোদ্ঘাটন পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঘটে—সেজন্য উপমা বিলম্বিত এবং বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিটি উপমা একটি পরিপূর্ণ চিত্র-রূপে জেগেছে। শ্রোতাকে উপমাটি অনুভব করবার জন্য চিন্তা করতে হয় নি—কেননা উপমাটি পরিচিত দৃশ্যের উদ্ঘাটন করেছে। যেমন—'তার গাল বেয়ে চোখের পানি নেমে এল যেমন করে পার্বত্য ঝরনার পানি কালো রেখায় পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে, পেত্রোক্লুস একটি ছোটো মেয়ের মত কাঁদছে যে-মেয়ে মায়ের কোলে উঠতে চায়। মায়ের আঁচল ধরে টানে, চোখভরা পানি নিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকায় এবং যতক্ষণ না কোলে উঠতে পারে ততক্ষণ

তার কান্না থামে না।' E. V. Rieu-এর অনুবাদ থেকে আরও কতকগুলো উদাহরণ দিচ্ছি :

1. Then he advanced on them like a mountain who sallies out, defying wind and rain in the pride of his power, with fire in his eyes to hunt the oxen or the sheep, to stalk the roaring deer, or to be forced by hunger to besiege the very walls of the homestead and attack the pens. (Odyssey : Book VI)
2. Seizing the olive pole, they drove its sharpened end into the Cyclops' eye, while I used my weight from above to twist it home, like a man boring a ship's timber with a drill which his mates below him twirl with a strap they hold at either end, so that it spins continuously. (Odyssey : Book IX)
3. Odysseus broke down as the famous minstrel sang his lay and his cheeks were wet with the tears that ran down from his eyes. He wept as a woman weeps when she throws her arms round the body of her beloved husband, fallen in battle before his city and his comrades, fighting to save his hometown and his children from the disaster. She has found him gasping in throes of death ; she clings to him and lifts her voice in lamentation. But the enemy come up and belabour her back and shoulders with spears, as they lead her off into slavery and a life of miserable toil, with her cheeks washed by her pitiful grief. Equally pitiful were the tears that now welled up in Odysseus' eyes (Odyssey : Book VIII).
4. He was like a stallion who breaks his halter at the manger where they keep and fatten him, and gallops off across

the fields in triumph to his usual bathing place in the delightful river. He tosses up his head, his mane flies back along his shoulder! He knows how beautiful he is; and away he goes, skimming the ground with his feet, to the haunts and pastures of the mares. Thus Hector sped away, when he had heard the god speak, to lead his charioteers to battle. (Iliad : Book XV).

১. তিনি এক পার্বত্য সিংহের মত এগিয়ে এলেন। যে-সিংহ শক্তিমদে মত্ত হয়ে, ঝড়-বৃষ্টিকে তুচ্ছ করে অগ্নিময় চক্ষে বলীবর্দ-মেষ শিকারের জন্য বা বিচরমাণ হরিণকে অতর্কিতে আক্রমণের জন্য গুহার বাইরে বেরিয়ে আসে। অথবা যে-সিংহ গোষ্ঠগৃহের প্রাচীর ডিঙিয়ে গৃহপালিত পশুদের আক্রমণ করে।

(অডিসি—ষষ্ঠ পুস্তক)

২. অলিভ গাছের ডালটা সবাই মিলে ধরে সূক্ষ্মাগ্র দিকটা জোরে সাইক্লোপ্‌স্‌-এর চোখের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। আমি ডালটার ওপরে আমার শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে চেপে রেখেছিলাম যাতে সেটা ভাল ভাবে তার চোখে ঢুকতে পারে। ঠিক যেমন করে জাহাজের তক্তা ছিদ্র করার সময় একজন তুরপুনের মাথাটা শক্ত করে ধরে রাখে যাতে তা ঠিকমত ঘুরতে পারে আর তার সঙ্গীরা নীচে দু'দিক থেকে চর্মপেটী ধরে তুরপুনটা ঘোরাতে থাকে!

(অডিসি—নবম পুস্তক

৩. খ্যাতনামা গায়ক যখন এই গানটি গাইল ওডিসিয়াস তখন ভেঙে পড়ল, অশ্রু-ধারায় তার গণ্ডদেশ সিক্ত হল। তেমন করে সে কাঁদল—যেমন করে স্ত্রী অশ্রুপাত করে দেশ এবং জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে রণক্ষেত্রে পতিত প্রিয়তম স্বামীর দেহ আলিঙ্গন করে। সে তাকে মৃত্যুযন্ত্রণায় রুদ্ধশ্বাস দেখে জড়িয়ে ধরে উচ্চস্বরে বিলাপ শুরু করে; কিন্তু শত্রুরা এসে যায়, তার পৃষ্ঠদেশে ও স্কন্ধে বল্লম দিয়ে আঘাত করে; তাকে নিয়ে যায় দাসত্ব ও দুঃসহ পরিশ্রমের মধ্যে, দাহনে তার

গণ্ডদেশ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ওডিসিয়াসের চক্ষুতে এখন যে-অশ্রু উথলে উঠলো তা তেমনি করুণ।

(অডিসি—অষ্টম পুস্তক)

৪. আহারের পাত্র-সংলগ্ন দড়ি ছিঁড়ে অশ্ব মুক্তির আনন্দে ছুটে যায় মাঠের দিকে, নদীর তীরে, যে-নদীতে সে কতবার গা ধুয়েছে। মাথা উঁচু করে সে দাঁড়ায়। ঘাড়ের কেশর বাতাসে উড়তে থাকে। কি সুন্দর সে। আবার সে ছুটে যায়। খুরের আঘাতে মাটি কেঁপে ওঠে। সে ছুটে যায় ঘোটকীদের চারণভূমিতে।—দেবতার কথা শুনে হেক্টরও ঠিক তেমনি করেই ছুটে যান যুদ্ধে, রথবাহিনী পরিচালনার জন্যে।

(ইলিয়দ—পঞ্চদশ পুস্তক)

হোমার অনুভূতি এবং হৃদয়াশ্রিত আবেগকে চিত্ররূপ দিয়েছেন। যেখানে পাঠক অথবা শ্রোতাকে চিন্তা করতে হবে বা উপলব্ধি করতে হবে সেখানে দৃশ্যমান বিভিন্ন চিত্র নির্মাণ করেছেন এবং প্রতিটি চিত্রই উপলব্ধির বিষয়কে লক্ষগোচর করেছে। যেখানে বলা চলত যে, 'মেয়েটি মায়ের কোলে যাবার জন্যে আকুল হয়েছে'—সেখানে তিনি আকুলতাকে চিত্রবৈচিত্র্যে ফুটিয়ে তুললেন, যেমন, 'মেয়েটি মায়ের আঁচল ধরে টানছে,' 'পানি-ভরা চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছে', 'যতক্ষণ না কোলে উঠতে পারছে ততক্ষণ কাঁদছে'—ইত্যাদি। এভাবে হোমার তাঁর শ্রোতার জন্যে বিশ্লেষণের সুযোগ রাখেন নি—প্রগাঢ় সহানুভূতি চিত্ররূপে দৃশ্যমান হয়েছে। শ্রোতাকে তিনি চমকিত করেছেন, সন্ত্রস্ত করেছেন, বেদনাবৃত্তে আবর্তিত করেছেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও অর্থবোধের কারণে চিন্তিত করেন নি।

তিন

মেঘনাদবধ কাব্যে মানবভাগ্য

গ্রীক সাহিত্যে 'ফেইট' এবং 'নেমেসিস' বলে দু'টি কথা আছে। ফেইট হচ্ছে অদৃষ্ট—নিয়তি। দুর্জয়, দ্বিধাহীন, অশেষ শক্তিধর দৈবই মনুষ্যজীবনে সর্বাপেক্ষা বলবান। পুরুষকার দৈবের সম্মুখে ব্যর্থকাম হয়; মনুষ্যের সকল শক্তি, ধর্মাধর্মবোধ নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তা হলে দেখছি নিয়তি হচ্ছে এক প্রকার পূর্ব-নির্ধারিত বিশ্ববিধান। প্রাচীন গ্রীককাব্যে নিয়তি কখনো কখনো দেবতাদের ইচ্ছা বা আদর্শের বিরোধী ছিল। হোমারের হাতে এর পরিবর্তন ঘটে। হোমারের কাব্যে নিয়তি এবং দেবতা সহগামী এবং একই সাধিকা-শক্তির অংশ। হোমার এই উভয় শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে গ্রহণ করেন নি।

'নেমেসিস'-এর অর্থ হচ্ছে প্রতিফল অথবা দেবতাদের ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ—মহাপাপের সেই শাস্তি যা অন্যায়কারীকে কোনও না কোনও সময়ে স্পর্শ করবেই। গ্রীক পুরাণে 'নেমেসিস' হচ্ছেন অধোভুবনের দেবী, রাত্রি এবং জিঘাংসা দেবীর কন্যা যিনি মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাপ করেন এবং অবিমৃষ্যকারীকে শাস্তি দেন। 'নেমেসিস'-এর পূর্ব-অবস্থাকে গ্রীক ভাষায় বলা হয় 'আইডস', যার অর্থ হচ্ছে লজ্জা বা সম্মানবোধ। মানুষ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও প্রমুক্ত, তখনই 'আইডস' ও 'নেমেসিস' ক্রিয়াশীল হয় এবং মানুষ তখনই সম্পূর্ণ স্বাধীন যখন কোনও দিক থেকে তার জন্য কোনও বাধা-বাধকতা থাকে না। যে-ব্যক্তি সমস্ত নীতি ও শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করেছে, যে কখনো কোন বস্তু বা ঘটনার সম্মুখে সন্ত্রস্ত নয়, যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, 'নেমেসিস' সাধারণত তার মধ্যেই প্রকাশ পায়। দেখা যাবে যে, তার স্বাধীন গতির মধ্যে হঠাৎ এমন কিছু হয়তো ঘটবে যা তাকে সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানেই হোক, অস্বস্তি দেবে। এই অস্বস্তিকর অবস্থানই 'নেমেসিস'-এর ইঙ্গিত বহন করে। গ্রীক সাহিত্যে কয়েকটি বিশেষ কারণে 'নেমেসিস' সক্রিয় হয়; প্রথমত, ভীরুতা ও মানসিক দুর্বলতা; দ্বিতীয়ত, মিথ্যাভাষণ ও

কর্তব্যের মধ্যে মিথ্যার আভাস ; তৃতীয়ত, অসম্ভ্রমবোধ ও রূঢ়তা ; চতুর্থত, দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি নিষ্ঠুরতা। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়কের মনে লজ্জা অথবা অস্বস্তির ভাব জাগরিত হতে পারে। এই অস্বস্তির ভাব থেকে মুক্তি পাবার দু'টি উপায় আছে—কারণগুলি থেকে দূরে থাকা অথবা তাদের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই অদৃষ্টের প্রতিশোধ বা পরিহাস জাজ্বল্যমান হয়।

ভার্জিল-এর 'ইনিদ'-এর মধ্যে **'fatum'** বলে একটি কথা আছে। এ শব্দটি গভীর অর্থবাচক। এর কাছাকাছি ইংরেজী শব্দ হচ্ছে **Destiny**—মানবভাগ্য। যে-ভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, এ শব্দটির পুরোপুরি অর্থজ্ঞাপন কখনোই সম্ভবপর নয়। টি. এস. এলিয়ট বলেছেন যে, যান্ত্রিক জগতে এ শব্দটির কোন অর্থই হতে পারে না। তাঁর মতে, এটা **Necessitarianism** নয়, **Caprice**-ও নয়। প্রথম শব্দটির অর্থ আমরা বলতে পারি আবশ্যিক সঙ্ঘটন আর দ্বিতীয়টির অর্থ আকস্মিক পরিবর্তন। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা ভাগ্য আছে, যদিও কোনও কোনও লোক বিশেষ ভাবে 'নিয়তি-নির্দিষ্ট পুরুষ'। ইনিস একজন নিয়তি-নির্দিষ্ট পুরুষ, কেননা ভার্জিলের চক্ষে তাঁর উপর পাশ্চাত্য জগতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ; কিন্তু এই নিয়তি-নির্দিষ্টতাকে কোনক্রমেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এক অর্থে এটা দায়িত্বভার-সম্পর্কে সজ্ঞানতা। এটা আত্মপ্রশংসা বা অহমিকাবোধ জাগাবে না, কেননা ভার্জিল ভাবছেন যে, কোনও একটা বিশেষ দায়িত্ব যাঁর উপর আরোপিত হয়েছে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে দায়িত্বকে সুসম্পন্ন করা : কিন্তু মনে রাখতে হবে, সে দায়িত্ব যার উপর অর্পিত হয়েছে, সে কাজ করবে যন্ত্রস্বরূপ বা নির্দেশবহরূপে। যে-মুহূর্তে সে নিজেকে সমস্ত শক্তির উৎস বলে মনে করবে এবং একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হবে, তখনই সে নির্যাতিত হবে এবং সর্বস্বান্ত হবে। ইনিস ভাগ্যের নিগূঢ়তম বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু সে কখনো নিজেকে কোন শক্তির উৎস বলে মনে করে না। সে জানে যে, ভাগ্যকে কামনা করে পাওয়া যায় না, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যকে অতিক্রমও করা যায় না। তা হলে সে কোন্ শক্তির দাস হল? দেবতাদের নয়, কেননা অনেক সময় দেবতাও তো যন্ত্রস্বরূপ। তা হলে দেখতে পাচ্ছি যে, ভাগ্যের কল্পনা মূলত রহস্যাবৃত, কিন্তু এমন রহস্য

যা যুক্তিবিরোধী নয়, কেননা আমরা ভাগ্যের সচলতা এবং সক্রিয়তা থেকে একটি তথ্য জেনেছি যে, এই পৃথিবী এবং মানুষের ইতিহাসের ধারার গভীর অর্থ আছে।

গ্রীক সাহিত্যে নিয়তির বিচিত্র লীলায় মানুষ অত্যন্ত অসহায়। নিয়তি সেখানে পূর্ব-নির্ধারিত বিশ্ববিধান, যাকে কোনক্রমেই অতিক্রম করা যায় না। মানুষ জানে যে, নিয়তি-নির্দেশ কখনই অতিক্রান্ত হতে পারে না; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে অন্ধভাবে অথবা নিজের অজ্ঞাতসারে নিয়তির বিরুদ্ধাচরণ করে অথবা তাকে অতিক্রম করতে চায়। অবশেষে বিপুল শক্তিধর নিয়তি মানুষকে চরমভাবে নিঃশেষ করে এবং তখন মানুষের পরাজয়, হাহাকার এবং যন্ত্রণায় আমরা ভীত হই। একটি উদাহরণ দিলে এ কথাটি স্পষ্ট হবে। 'ইডিপাস'-এর কাহিনী আমরা জানি। সেখানে মানুষের অসহায়তা চরম ভাবে চিত্রিত হয়েছে। ইডিপাস হচ্ছে লেয়াস্ এবং তাঁর স্ত্রী জোকাস্টার পুত্র। নব-জাতকের নামকরণের পূর্বেই অ্যাপোলোর দৈববাণী এলো যে, ভাগ্যচক্রে একদিন এ পুত্র তার পিতাকে হত্যা করবে এবং বিধবা মাকে বিয়ে করবে। এপোলোর দৈববাণী লেয়াস্ অবিশ্বাস করেন নি; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি এক মেষপালককে নির্দেশ দিলেন পুত্রকে পর্বতপ্রান্তে পরিত্যাগ করে আসতে। ভাগ্যের নির্দেশ অন্যথা হল না, তাই থীবীর মেষ-পালক করুণাপরবশ হয়ে শিশুকে এক করিন্থিয়ান মেষপালকের হস্তে সমর্পণ করল। করিন্থিয়ান মেষপালক ছিল করিন্থের 'সন্তানহীন নৃপতি পলিবস-এর আজ্ঞাবহ। সে শিশুকে পলিবসের হাতে সমর্পণ করল। পলিবস শিশুকে দত্তক গ্রহণ করলেন এবং নাম দিলেন ইডিপাস। ইডিপাস যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং করিন্থের যুবরাজ বলে সর্বত্র মান্য হলেন। এ সময় তিনি এপোলোর দৈববাণী শুনতে পেলেন যে, তিনি পিতৃঘাতী হবেন। তিনি দৈববাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্যে পালক-পিতাকে আপন পিতা ভেবে করিন্থ পরিত্যাগ করলেন। নির্দেশবিহীন ভাবে পরিভ্রমণরত অবস্থায় থীবীর সীমান্তে তিনি তাঁর যাত্রায় বাধাপ্রদান-রত পথচারীকে হত্যা করেন। এই পথচারী ছিলেন তাঁর পিতা। ভাগ্যকে তিনি অতিক্রম করতে চেয়ে-ছিলেন, কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারে চরম নিষ্ঠুরতায় ভাগ্য প্রকাশমান হল। থীবীর অভ্যন্তরে এসে তিনি দেখেন যে, দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় চলছে।

ভয়াবহ স্ফিন্‌কস্‌এর জন্যে দেশবাসী সন্ত্রস্ত। স্ফিন্‌কস্‌এর ধাঁধার উত্তর কেউ দিতে পারছে না এবং অপারগ হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। ধাঁধার উত্তর দিয়ে ইডিপাস স্ফিন্‌কসের শক্তি অপহরণ করলেন এবং সকৃতজ্ঞ থীবীবাসিগণ তাঁকে রাজা বলে গ্রহণ করল। ইডিপাস রাজা হয়ে লেয়াসের পত্নী জোকাস্টাকে বিয়ে করলেন। ইডিপাসের ঔরসে জোকাস্টার গর্ভে পুত্র-কন্যার জন্ম হল।

ইডিপাসের অজ্ঞাতসারে দৈববাণী সফল হলো। এখন বাকী রইল ইডিপাসের কাছে সমস্ত সত্য স্পষ্ট হওয়া। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, ইডিপাস সর্বতোভাবে নিরীহ। সে ন্যায়-পরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং জন-কল্যাণকারী। তার নিজের দোষে নয়, কিন্তু ভাগ্যের নির্দেশে সে চরম-ভাবে নিঃশেষিত হচ্ছে। সমস্ত সত্য যেদিন তার কাছে স্পষ্ট হল, সেদিন তার কোনও প্রকার ত্রাণের উপায় নেই। নিয়তি তাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেছে আপন সত্যকে স্পষ্ট করবার জন্যে এবং অসহায় ইডিপাস লাঞ্ছিত এবং নিঃশেষিত হয়েছে। নিয়তি এখানে অমোঘ, একাগ্র, নির্মম এবং নিশ্চিন্ত। যন্ত্রণার বিচিত্র বিকাশের মধ্যে ইডিপাসের অসহায়তা দেখে আমরা বিহ্বল হই এবং চরমভাবে শঙ্কিত হই। নিয়তি বা বিশ্ববিধানের এই দুর্বার গতি এবং অপ্রতিরোধ্য আবেগের সম্মুখে মানুষ বাত্যাতাড়িত তৃণের মত।

সেক্সপীয়রের নাটকে নিয়তি-লাঞ্ছিত মানুষের পরিচয় পাই। সেখানেও মানুষ অসহায়; কিন্তু সেখানে তার অসহায়তার জন্যে সে নিজেই দায়ী। শক্তিমান নায়ক নিজের শক্তির উপর বিশ্বাসী হয়ে অগ্রসর হয়েছে; কিন্তু আপন চরিত্রের কোনো বিশেষ দুর্বলতার কারণে সে এমন একটা পথ অবলম্বন করেছে, যে-পথে তার জন্যে সর্বনাশ আছে, কিন্তু আনন্দ নেই। সে জানে যে, এ পথে সর্বনাশ আসতে পারে, তাই সর্বনাশ রোধ করবার চেষ্টার অন্ত নেই; কিন্তু আপন রিপুর কাছে সে একান্ত অসহায়, তাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। আমরা এখানে ম্যাকবেথের উদাহরণ আনতে পারি। ম্যাকবেথ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ন্যায়বান, আদর্শ পুরুষ; কিন্তু তার হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষারূপ দুর্বলতা আছে। এ দুর্বলতাকে সে কোনক্রমেই অতিক্রম করতে পারছে না। শেষপর্যন্ত এ

দুর্বলতার কারণেই অনবরত অন্যায় পথে তার পদচারণ ঘটল। এ নাটকে আমরা ভাগ্যের সামনে মানুষের অসহায়তার চিত্র দেখি; কিন্তু এ নিয়তি সে নিজেই নির্মাণ করেছে।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ মাইকেল মধুসূদন দত্ত অল্পপরিসরের মধ্যে গ্রীক নিয়তিকে অবলম্বন করবার চেষ্টা করেছেন। অনেক সমালোচক বলে থাকেন যে, এ কাব্যে পূর্বজন্মকৃত অপরাধের শাস্তি এবং কৃতকর্মের ফলভোগ আছে। বিভিন্ন চরিত্রের উক্তিতে এই পূর্বজন্মের কথা এবং কৃতকর্মের কথাই পাই; কিন্তু বিশেষভাবে অনুধাবন করলে দেখতে পাব যে, এগুলি উক্তি-স্বরূপেই আছে, মহাকাব্যের ঘটনা-সংস্থানে এগুলির কোন পরিচয় নেই। তবুও উক্তিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। আমাদের প্রথম প্রমাণ করতে হবে যে, এই প্রাক্তন এবং কৃতকর্মের ফলভোগ বিভিন্ন ঘটনা বা আবেগের মধ্য দিয়ে সমর্থিত হয় নি। এটা প্রমাণ হলেই প্রাক্তনগত সমস্ত উল্লেখকে আমরা বর্জন করতে পারব এবং তারপরেই আমাদের প্রমাণ করার প্রয়োজন হবে যে, এ কাব্যের ঘটনা-সংস্থানে, বিভিন্ন সংঘাতে এবং চরিত্রগত আবেগে গ্রীক নিয়তিবাদ সমর্থিত হয়েছে কি হয় নি।

প্রথম সর্গে প্রাক্তন সংক্রান্ত উক্তিগুলি এই :

১. রাবণের উক্তি :

হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি !
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে ?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই ?
... ...
হায় শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কালপঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম-গেহে ?

২. চিত্রাঙ্গদার উক্তি :

কিন্তু ভেবে দেখ নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন লোভে, কহ রাজা, এসেছে এদেশে
রাঘব ?
... ...

তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, উর্ধ্বফণা ফণী—দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে,
মজালে রাক্ষস-কুলে, মজিলা আপনি !

৩. রমার উক্তি :

যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে !
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।

রাবণের উক্তিতে আত্মকৃত অন্যায় এবং পাপবোধ-সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা আছে ; কিন্তু রাবণের চেতনায় পাপ-সম্পর্কে কোনো প্রকার সজ্ঞানতা নেই। রাবণ মূলতঃ অভিযোগ করছে যে, ক্রমান্বয়ে সে সর্বস্বান্ত হচ্ছে কেন ? সীতাকে-যে অপহরণ করে নিয়ে এল সে সম্পর্কেও রাবণের অপরাধের মনোভাব নয়। সে দোষারোপ করছে শূর্পণখাকে। শূর্পণখা পঞ্চবটী বনে লক্ষ্মণকে দেখে তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে ; কিন্তু লক্ষ্মণ তার নাসিকা কর্তন করে। সে জন্যেই শূর্পণখার দুঃখে দুঃখিত হয়ে সীতাকে অপহরণ করে রাবণ। এ অপহরণের ব্যাপারে রাবণের মনে কোন প্রকার পাপবোধের পরিচয় নেই। রাবণের বক্তব্য হচ্ছে যে, শূর্পণখার প্রতি করুণাপরবশ হয়ে সে সীতাকে অপহরণ করেছে। এখানে কোনও প্রকার অসদাচরণ অথবা মানসিক বৈকল্যের পরিচয় নেই। অপহৃতা সীতাকে

উদ্ধারের জন্যে রামচন্দ্র এসেছে লঙ্কায় এবং সেখানে উভয় পক্ষের সংগ্রামে রাবণ ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হচ্ছে। সামর্থ্য তার অশেষ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেন-যে সে ক্রমান্বয়ে পরাজিত হচ্ছে তার কারণ সে খুঁজে পায় না। রামের সঙ্গে বিরোধের কারণ সে খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু 'কুসুমদাম-সজ্জিত দীপাবলী তেজে উজ্জ্বল নাট্যশালা'-স্বরূপ সুন্দর লঙ্কাপুরীর সমস্ত 'দেউটি' কেন যে নিভে যাচ্ছে তার কারণ সে খুঁজে পায় না। রাবণের উক্তিতে প্রাক্তনের বোধ নেই অথবা কৃতকর্মজনিত শাস্তিরও সচেতনতা নেই।

চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে রাবণের উপর দোষারোপ আছে। চিত্রাঙ্গদা স্পষ্ট ভাবেই বলছে যে, সীতাকে অপহরণ করেছে বলেই লঙ্কাপুরে কালাগ্নি জ্বলেছে। নিজ কর্মফলে রাবণ সমস্ত রাক্ষসকুলকে সর্বস্বান্ত করেছে। এটা ক্ষুব্ধ এবং বেদনালাঞ্ছিত মাতার উক্তি। এটা উক্তি-স্বরূপই রয়েছে, রাবণের দিক থেকে এর কোন প্রতিক্রিয়া জাগে নি। যতটুকু প্রতিক্রিয়া জেগেছে তা হচ্ছে রাক্ষসকুলের মানরক্ষার জন্যে আবার নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি। রাবণ এই উক্তির উত্তরে কর্মফলের কথা উল্লেখ করে নি। ক্ষোভে অভিমানে শোকার্ত রাবণ বলছে :

'এত দিনে' (কহিলা ভূপতি)
'বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের নাম? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!'

দেবতারা অবশ্য অনবরত রাবণের পাপের কথা বলছেন, তার কর্মফল এবং ভাগ্যদোষের কথা বলছেন; কিন্তু এ কাব্যের গতিবিধিতে এবং রাবণের চরিত্র-প্রকাশের মধ্যে এর সমর্থন আমরা পাই না। গ্রীক কাব্যের মধ্যে দেবতারা কোন একটি পক্ষের সমর্থক কখনো নন, মানুষে মানুষে দলভাগের মত দেবতারাও সেখানে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন; তাই ভাগ্য সেখানে দেবতাদের কৃতরূপে প্রকাশিত হয় না, আমরা সেখানে ভাগ্যের একটি বিচ্ছিন্ন সর্বগ্রাসকারী অবশ্যম্ভাবী রূপ পাই। মধুসূদন তাঁর

সমস্ত দেবতাকে এক বিশেষ ষড়্‌যন্ত্রসূত্রে গ্রথিত করেছেন ; তাই যেখানে দেবতারা প্রাক্তনের ফলকে প্রকাশমান করবার জন্যে ছুটে চলেছে, সেখানে মূলত তারা আপন ষড়্‌যন্ত্রকেই সফলকাম করছে। এ কারণে আমরা বলতে পারি যে, রাবণের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়-সম্পর্কে যে-সমস্ত কথা বলছেন, সেগুলি মূলত তাদের ষড়্‌যন্ত্রের সমর্থনসূচক। তারা সম্মিলিতভাবে একে অন্যের সমর্থনে এবং নির্ভরতায় এবং বিশেষ এক যুক্তিধারা অবলম্বন করে রাবণের অজ্ঞাতসারে তাকে চরমভাবে নিঃসম্বল করছে। মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণ পূর্ণভাবে সর্বস্বান্তই হয়েছে বলা যেতে পারে। এ কারণেই দেবতাদের উক্তিকে এখানে ভাগ্যের নির্দেশ বলে মানা যেতে পারে না। আর যদি কৃতকর্মের ফলের কথাই বলি তা হলেও বলতে হয় যে, রাবণের চরিত্র-বিকাশের মধ্যে এর আভাসমাত্র নেই। দেবতারাই অনবরত বলছেন যে, লঙ্কাপুরী পাপে পূর্ণ এবং রাবণ তার অন্যায় আচরণের জন্য শাস্তি পাবেই ; কিন্তু এই গ্রন্থের কোথাও লঙ্কাপুরীর পাপক্রিয়ার অথবা রাবণের কোন প্রকার বিকল আচরণের পরিচয় নেই। রাবণের চরিত্র বিশ্লেষণ-সূত্রে আমরা দেখছি যে, রাবণ দেশপ্রেমী, প্রজা-বৎসল, শক্তিধর এবং অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। করুণা এবং সহানুভূতিতে সে যেমন আশ্চর্যরকম কোমল এবং মানবীয়, তেমনি শত্রুর সম্মুখে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং দেশের সমস্ত শক্তিকে একত্র করার ক্ষেত্রে নিঃশঙ্কচিত্ত।

এখানে হোমারের দেব-কল্পনা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। হোমারের দেবতারা অমর সন্দেহ নেই ; কিন্তু মানব-রূপে তাদের সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ সৌন্দর্যে এবং দেহগত রূপে তারা মানবকল্প। তাদের ক্ষমতা প্রায় অসীম এবং রূপের প্রভাও যথেষ্ট ; কিন্তু মানুষের মত তাদের দুর্বলতা আছে এবং কর্মপন্থার কারণ আছে। তারা মানুষের আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত এবং মানুষের কার্যধারায় ন্যায়ানুসরণ তাদের ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে।

দেবতাদের সঙ্গে মানুষের তফাৎ এখানে যে, দেবতারা শঙ্কামুক্ত এবং আনন্দময়, অন্য পক্ষে মানুষ কর্মে, আকাঙ্ক্ষায় এবং আকুলতায় নিয়ত পীড়িত। এই পার্থক্য 'ইলিয়দ' এবং 'অডিসি' দুই মহাকাব্যেই সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'অডিসি'র মধ্যে এই পার্থক্য আশ্চর্য সজীবতায় বর্ণিত

হয়েছে, বিশেষ করে পঞ্চম পুস্তকে, যেখানে ওদিসিউস্ কালিপ্সো'র অমরত্বের দানকেও অস্বীকার করছে। ওদিসিয়াস্ দেবতাদের অমরত্ব এবং অনন্ত যৌবন কামনা করে নি।

'অডিসি'তে সর্বশক্তিমান দেবতা জিউস। জিউস হচ্ছে ক্রোনোসের পুত্র। জিউস সর্বশক্তিমান হওয়া-সত্ত্বেও ভাগ্যের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়, যদিও সে মানুষের ভাগ্যকে পরিচালনা করে। সে করুণাপরায়ণ, ন্যায়বান। ভাগের নির্দেশে সে মানুষকে হয়তো শাস্তি দেয় অথবা যন্ত্রণা দেয়; কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার পরিকল্পনা বা কার্যক্রমের দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত। জিউসের সঙ্গে ভাগ্যের সম্পর্ক কি, তার পরিচয় 'ইলিয়দে'র ষোড়শ পুস্তকে কিছুটা পাওয়া যায়। সারপেডনকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখে জিউস তার স্ত্রী হেরে-কে বলেছে:

> ভাগ্য আমার প্রতি অকরুণ। সারপেডনকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি অথচ তাকে বাঁচাবার উপায় নেই। দেখতে পাচ্ছি যে, পেত্রোক্লসের হাতে তার মৃত্যু অবধারিত। আমার মন এখন দ্বিধাগ্রস্ত, আমি কি তাকে জীবিতাবস্থায় যুদ্ধের বেদনা ও অশ্রুপ্রবাহ থেকে মুক্ত করে লিসিয়ার সজীব ভূমিতে সরিয়ে আনব? না, পেত্রোক্লসের হাতে তাকে নিহত হতে দেব?

উত্তরে হেরে বলছে:

> তুমি আমাকে অবাক করছ। যার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, যে পতিত হবে যুদ্ধে, তাকে কি তুমি মৃত্যুর বেদনা থেকে রক্ষা করতে চাও? যদি তুমি সারপেডনকে ভালবাস, তবে তোমার কর্তব্য হবে ভাগ্য-নির্দেশ মত পেত্রোক্লসের হাতে তার মৃত্যু ঘটতে দেওয়া।

এখানে আমি এদের সংলাপটুকু E. V. Rieu-এর 'ইলিয়দ'-এর ইংরেজী অনুবাদ থেকে তুলে দিচ্ছি:

> The son of Cronos of the Crooked Ways saw what was happening and was distressed. He sighed and said to Here, his sister and his wife: 'Fate is unkind to me. Sarpedon, whom I dearly love, is destined to be killed by

Patroclus, son of Menoetius. I wonder now—I am in two minds. Shall I snatch him up and set him down above in the rich land of Lycia far from the war and all its tears? Or shall I let him fall to the son of Menoctius this very day?'

'Dread son of Cronos, you amaze me!' replied the ox-eyed Queen of Heaven, 'Are you proposing to reprieve a mortal man whose doom has long been settled, from the pains of death?......No; if you love and pity Sarpedon, let him fall in mortal combat with Patroclus, and when the breath has left his lips send Death and the sweet god of sleep to take him up and bring him to the broad realm of Lycia, where his kinsmen and retainers will give him burial, with the barrow and monument that are a dead man's rights.'

ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে, তা দেখতে পেয়ে ক্রোনোসের পুত্র বিষাদ-ভারাক্রান্ত হল। সে তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে হেরেকে, যে একই সঙ্গে তার ভগ্নী ও স্ত্রী, বলল, 'ভাগ্য আমার প্রতি নিষ্করুণ—কারণ যে সারপেডনকে আমি এত ভালবাসি, মিনটিয়াসের পুত্র পেট্রোক্লসের হস্তে তার মৃত্যু অবধারিত। আমি এখন চিন্তিত হচ্ছি—আমার মন এখন দ্বিধাগ্রস্ত। আমি কি তাকে জীবন্ত অবস্থায় যুদ্ধের বিষাদ এবং অশ্রুর বন্যা থেকে মুক্ত করে লিসিয়ার উর্বর ভূমিতে নিয়ে আসতে পারব? না, মিনটিয়াসের পুত্রের হাতে তাকে নিহত হতে দেব?'

স্বর্গের রানী জবাব দিলেন, 'হে ক্রোনোসের ভীষণ পুত্র; তুমি আমাকে অবাক করছ। অনেক দিন পূর্ব থেকেই যার মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে আছে, সেই মরণশীল মানুষকে তুমি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চাও?··· না, যদি তুমি সারপেডনকে ভালবাস এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল

> হও, তোমার কর্তব্য হবে বিধিলিপি-অনুসারে পেট্রোক্লসের হাতে তার মৃত্যু ঘটতে দেওয়া। এতে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু এবং নিদ্রাদেবতা এসে তাকে লিসিয়া রাজ্যে নিয়ে যাবে। সেখানে আত্মীয়স্বজন তাকে সমাহিত করবে এবং তার সমাধির উপর গড়ে উঠবে বিরাট স্মৃতি-সৌধ।

এখানে আমরা দেখছি যে, নিয়তি হচ্ছে একটা বিশেষ সত্য যা নিশ্চল, অবশ্যম্ভাবী এবং সর্বব্যাপ্ত, যাকে অতিক্রম করা কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয়, অথচ মানুষ অনবরতই তাকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে এবং এই অতিক্রমের চেষ্টায় লাঞ্ছিত এবং বিপর্যস্ত হচ্ছে। গ্রীক কাব্যে দেখতে পাই যে, মানবের নিয়তি-সম্বন্ধে দেবতারা অবহিত। দেবতাদের কেউ নিয়তিকে অসফল করতে চাচ্ছে আবার কেউ বা নিয়তিকে সমর্থন করছে। নিয়তিকে সমর্থন করতে যেয়েও কখনো কখনো কোন কোন দেবতা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে ; কিন্তু সর্বপ্রকার আপত্তি এবং দ্বিধাকে অতিক্রম করে নিয়তি প্রকাশমান হচ্ছে। এক কথায় পৃথিবীর অস্তিত্বের মত নিয়তিও সুনিশ্চিত এবং সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য। নিয়তির এই রূপ 'ইলিয়াদ' এবং 'অডিসি' কাব্যের মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রকাশমান হয়েছে।

'ইনিদ্' কাব্যে নিয়তিকে সত্যরূপে চিত্রিত করা হয়েছে—দিবা-রাত্রির মত সত্য এবং পৃথিবীর অস্তিত্বের মত সত্য। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দেবতার নির্দেশ মানা। দেশকে ভালবাসা, পরিবার, বন্ধুবর্গ এবং অনুচরদের প্রতি সত্য-সম্বন্ধে অর্থাৎ করুণায়, মমতায় ও সমর্থনে বিজড়িত থাকা ; তবে নিয়তির এ-রূপটি প্রকাশমান হয় তার কাছেই যে, সর্ব দিক থেকে 'সত্য'। এ সত্যকে কিন্তু উপলব্ধি করতে হয় এবং সে জন্যেই ইনিসের মত বলিষ্ঠ প্রাণবান ব্যক্তিকে ভার্জিল তাঁর কাব্যের নায়ক বলেছেন। ইনিস হচ্ছে ভাগ্যনির্দিষ্ট পুরুষ এবং ইনিস তা নিজেও অনুভব করে। দেবতারা স্বপ্নে, অনুভূতিতে, প্রেরণায় এবং ইঙ্গিতে বিভিন্ন সময়ে এ সত্য তার কাছে স্পষ্ট করে। ইনিস ভাগ্যনির্দিষ্ট পুরুষরূপে ইতালীতে একটি সাম্রাজ্য জয় করবে। দৈবশক্তি তাকে পথের নির্দেশ দেয় এবং তাকে সাহায্য করে। একটি প্রচণ্ড সমুদ্র-ঝড়ে বিভ্রান্ত হয়ে ইনিস তার দলবলসহ উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ বন্দরে পদার্পণ করল। এখানে ইনিস কার্থেজের রানী দিদোর প্রণয়াসক্ত

হল। ইনিস এবং দিদো একত্রে বসবাস করতে লাগল। ইনিস ভুলে গেল যে, নিয়তি তাকে ইতালীতে নিয়ে যেতে চাচ্ছে এবং সেখানে সে নতুন সাম্রাজ্য জয় করবে। অনেক দিন চলে যায়, তারপর নিয়তির নির্দেশের কথা ইনিসের স্মরণে আসে। ইনিস দিদোকে পরিত্যাগ করে এবং আবার সমুদ্রযাত্রায় নামে। বঞ্চিতা দিদো ইনিসকে অভিশাপ দেয় এবং অবশেষে আত্মহত্যা করে।

'ইনিড' কাব্যে ভাগ্যের এই গতি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ইনিস নিয়তির নির্দেশ-সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইনিসের যাত্রা-পথ নিয়তি-নির্ধারিত, কখনো কখনো বৈলক্ষণ্য এলে দৈবরোষ প্রবল হয় এবং বলিষ্ঠ নায়ক বিশ্ববিধান-সমর্থিত পথে আবার যাত্রা করে।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ দু'টি চরিত্রের বিকাশে এই নিয়তি-নির্ধারিত পথ-বিন্যাসের স্বরূপ স্পষ্ট হয়। একজন হচ্ছে লক্ষ্মণ, অন্যজন ইন্দ্রজিৎ। লক্ষ্মণ বিশ্বাস করে যে, সে নিয়তি-নির্দিষ্ট পুরুষ, দৈববলে বলী এবং এ কারণে সে জয়লাভ করবেই। ইন্দ্রজিৎকে গোপনে হত্যার জন্যে লক্ষ্মণ যখন রামের কাছে অনুমতি চাচ্ছে তখন ভীত-সন্ত্রস্ত রাম বলছে :

> কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
> প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।

এর উত্তরে লক্ষ্মণের উক্তি হচ্ছে :

> দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
> ডরে সে এ ত্রিভুবনে ? দেব-কুলপতি
> সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ; কৈলাস নিবাসী
> বিরূপাক্ষ ; শৈববালা ধর্ম্ম-সহায়িনী !
> দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে, কাল-মেঘ সম
> দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
> চারিদিকে ! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
> এ তব শিবির, প্রভু ! আদেশ দাসেরে
> ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;
> অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদ-প্রসাদে।
> বিজ্ঞতম তুমি, নাথ ! কেন অবহেল

দেব-আজ্ঞা? ধর্ম্মপথে সদা মতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?

এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, লক্ষ্মণ নিয়তির নির্দেশ-সম্বন্ধে সচেতন এবং সে নিয়তির উপাদানরূপে কাজ করছে, তাই আমরা অনুভব করতে পারি যে, তার জয় সুনিশ্চিত। এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে মেঘনাদের বিদায়দৃশ্য। মেঘনাদের মানসচেতনা বিপরীত অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। সে একমাত্র নিজের শক্তির উপরই বিশ্বাসী। সে নিজেকে কোন বিশেষ শক্তির উপাদানরূপে কল্পনা করতে পারে না—সে নিজেকে জানে সমস্ত শক্তির উৎসরূপে এবং এ কারণেই তার পতন ঘটছে। তার মাতা যখন বলছে:

কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার।

তার উত্তরে মেঘনাদ বলছে:

কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুইবার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শরজালে! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি নিক্ষেপি
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী,
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্তে নরেন্দ্র! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, লক্ষ্মণের দিক থেকে নিয়তি-নির্দিষ্ট একটা দায়িত্বভার সম্পর্কে সজ্ঞানতা আছে। লক্ষ্মণের কর্তব্য হচ্ছে দায়িত্বকে সুসম্পন্ন করা অর্থাৎ লক্ষ্মণ হচ্ছে নির্দেশবাহক। অন্য দিকে মেঘনাদ নিজেকেই

সমস্ত শক্তির উৎস মনে করছে, তাই সে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। সে ভাগ্যের নিগূঢ়তম বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত নয়, সে একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল। যান্ত্রিক অনুগামিতায় লক্ষ্মণ জয়ী আর একান্ত আত্ম-প্রত্যয়ে মেঘনাদ পরাভূত। এই বিরোধাভাসে উভয়ের চরিত্রের বলিষ্ঠতা এবং দুর্বলতা একই সঙ্গে আশ্চর্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

লক্ষ্মণের নিশ্চিন্ত দেব-নির্ভরতার পরিচয় 'মেঘনাদবধ কাব্যে'-র সর্বত্রই আমরা পাই। রাম বহুবার যুদ্ধ পরিহার করতে চেয়েছে বিপর্যয়ের ভয়ে এবং বহুক্ষেত্রেই পরাজয় তার কাছে সম্ভাব্য বলে মনে হয়েছে, মনে হয়েছে যে, মেঘনাদের ধ্বংস তার কাছে অনিবার্য, কেননা দেব-কুল তার সহায়। তৃতীয় সর্গে রাম, প্রমীলার যুদ্ধসজ্জা দেখে চিন্তিত হয়ে বিভীষণকে বলছে :

দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান গিরি
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে!
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে;
কে রাখে এ মৃগ পালে?

এর উত্তরে সৌমিত্রি শূর বলছে :

কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি।

আমরা তা হলে দেখতে পাচ্ছি যে, লক্ষ্মণ এবং মেঘনাদের শক্তির উৎস-কেন্দ্রে দ্বৈতাভাস আছে এবং কবি এই দ্বৈতাভাসের মধ্য দিয়ে নিয়তির পরিচয় দিতে চেয়েছেন। উভয় চরিত্রের আবেগের বিকাশ এবং পরিণতিতে যদিও আদর্শগতভাবে নিয়তির অপরিহার্যতার পরিচয় আছে, কিন্তু নিয়তির নির্দেশকে সার্থক করতে গিয়ে লক্ষ্মণ যে-পন্থা অবলম্বন করেছে এবং যার অনুসরণে অবশেষে মেঘনাদের পতন ঘটল, তার সঙ্গে নিয়তির অমোঘ রূপের

কোন সম্পর্ক নেই। যদি নিয়তির নির্দেশ এই হয়ে থাকে যে, লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের পরাজয় ঘটবে তা হলে লক্ষ্মণের গোপন ষড়্‌যন্ত্র এবং কাপুরুষোচিত আচরণের কোন প্রয়োজন ছিল না। নিয়তির অনিবার্যতার পরিবর্তে এখানে প্রধান শক্তিরূপে স্পষ্ট হচ্ছে দেব-কুলের গ্লানিময় গোপন অসদাচরণ। দেবতারা সর্বশক্তিমান এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ এই শক্তিমান দেবতারা—বারুণী থেকে আরম্ভ করে মহাদেব পর্যন্ত—একটি নিকৃষ্টতম গোপন ষড়যন্ত্রে একত্র হয়েছে এবং এদের সকলের সুবিন্যস্ত এবং সুনিশ্চিত কার্যধারায় মেঘনাদ নির্বীর্য এবং নিঃশেষ হয়েছে। এ কাব্যের কোথাও ভাগ্যের অমোঘ রূপের পরিচয় নেই এবং মানব-ভাগ্যের চিত্রাঙ্কনে মধুসূদন ব্যর্থকামই হয়েছেন বলতে হবে।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ মহাদেবের কল্পনা গ্রীক দেবপ্রভু জিউস থেকে নেয়া; কিন্তু যেখানে জিউস বিশ্ববিধানকে প্রকাশমান এবং কার্যকর করে মাত্র এবং যে-ক্ষেত্রে তার নিজস্ব দায়িত্ব কিছুই নেই, সেখানে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর মহাদেবের কার্যকারণের মধ্যে নিয়তি-সমর্থনের স্পষ্ট কোন পরিচয় নেই। আমরা দেখেছি সারপেডনের পরিণতি জানতে পেরে জিউস দেবতার আক্ষেপ এবং মনোবেদনা। জিউস সেখানে সারপেডনকে রক্ষার জন্যে চেষ্টা করছে এবং ভাগ্যকে কোনও ক্রমে অস্বীকার করা যায় কিনা তার চিন্তা করছে। অবশেষে যখন দেখা গেল যে, ভাগ্যকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা তার নেই তখন সে সারপেডনের পতনকে মহীয়ান করলো। আমরা সেখানে জিউসের মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ভাগ্যের অনিবার্যতার একটি সুন্দর পরিচয় পাই। জিউস সেখানে কোনও কর্মের-নায়ক নয়, ভাগ্য-নির্দেশে সে একজনের পতনকে সম্ভবপর করছে মাত্র। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ মহাদেবের উক্তি এই:

জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন;
কিন্তু নিজ কর্ম্মফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,

মহেশ্বরি ; হায় দেবি, দেবে কি মানবে,
কার হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়া-দেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।

এখানেও দেখছি, অন্যান্য দেবতার মতো মহাদেবও রাবণের পাপের কথা বলছে, যে-পাপের ব্যাখ্যাসূত্র আমরা কোথাও খুঁজে পাই নে। অব্যাখ্যাত এবং অসমর্থিত পাপের কারণে সর্বনাশ হচ্ছে—এখানে গ্রীক নিয়তি বা প্রাক্তন কোনও কিছুরই পরিচয় নেই ; মহাদেবের আচরণে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তিনি ভাগ্যকে রূপ দিচ্ছেন না ; কিন্তু সমস্ত দেবশক্তির ষড়্‌যন্ত্রের সমর্থক হয়েছেন। মেঘনাদ বা রাবণের জন্যে তার কোন অনুকম্পা নেই, তিনি নিশ্চিন্তে মেঘনাদের সর্বনাশের নির্দেশ দিচ্ছেন। রাবণের দুষ্কর্মের উল্লেখ আছে এবং প্রাক্তনের গতির কথাও বলা হয়েছে ; কিন্তু এগুলো প্রবচন-রূপে এসেছে মাত্র—গভীর বেদনা, অপরিসীম হতাশ্বাস অথবা ভাগ্যের অমোঘ রূপের পরিচয় এর মধ্যে নেই। তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দেবতাদের পারম্পরিক সংযোগ-ধারায় একটি অসাধারণ ষড়্‌যন্ত্রের কুশলী-বিন্যাস ঘটেছে এবং মহাদেবের সমর্থনের পর কার্যক্ষেত্রে সেই ষড়্‌যন্ত্রের প্রকাশ ঘটলো। এখানে ভাগ্য কোথায় ? যেহেতু রাবণ এই ষড়্‌যন্ত্রের কুশলী-বিন্যাস-সম্বন্ধে অবহিত নয়, তাই তার চিন্তায় ভাগ্যগত অনুভূতির কথা পাই এবং এভাবেই ভাগ্যের এক বিরাট পরিহাসে রাবণ নিঃশেষ হলো। সুতরাং একমাত্র রাবণ চরিত্রকে অর্থাৎ এই চরিত্রের চিন্তাধারা এবং কর্মপ্রবাহকে অনুসরণ করলেই আমরা ভাগ্যের অমোঘ এবং নিঃসংশয় রূপের পরিচয় পাই। রাবণের বিভিন্ন উক্তিতে এই সত্যটি ধরা পড়ে :

১. কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী ! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;

নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?

(প্রথম সর্গ)

২. কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?
প্রভঞ্জন বৈরী তুমি, প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী.
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?

(প্রথম সর্গ)

৩. এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে !
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি !
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী ।
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি

পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি ! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমূলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তূলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।

(প্রথম সর্গ)

৪. বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে ? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি !
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায় ? কি কাজ কহ এ বৃথা বিলাপে
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি ! মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর।

(নবম সর্গ)

৫. ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি,—বুঝিব কেমনে
তার লীলা ?

(নবম সর্গ)

রাবণের এ সমস্ত উক্তি সাধারণ সংবাদবহ নয়, এগুলো তার হৃদয়-বেদনা এবং উপলব্ধির সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়িত। পরাজয়ের অপ্রতিরোধ্য গতি দেখে সে অনুভব করেছে যে, ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ। কয়েকটি ঘটনায় তার এই অনুভূতিটা প্রবল হয়েছে—প্রথম, অনবরত শত্রুপক্ষের হাতে দেশের সৌন্দর্য ও শক্তির ক্রমবিপর্যয় ; দ্বিতীয়, রাম কর্তৃক সেতুবন্ধন; যে-সেতুবন্ধনের সম্ভাবনা রাবণের কল্পনায় কখনো জাগে নি ; তৃতীয়, যে-লক্ষ্মণকে সে নিহত বলে ধারণা করেছিল, তার জীবনপ্রাপ্তি এবং চতুর্থ, তার জীবনের একমাত্র আশা মেঘনাদকে রাজ্যভার অর্পণ করে নিশ্চিন্তে মৃত্যু, সেই আশাভঙ্গের তুলনাহীন বেদনা। এ ক'টি বেদনাময় আকস্মিকতায় ভাগ্যের অমোঘ রূপের যে-পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে তার তুলনা যে-কোন সাহিত্যে বিরল। নিয়তির এই অনিবার্যতার সঙ্গে দেবতাদের সক্রিয় বিরুদ্ধতা-সম্পর্কে রাবণের অজ্ঞানতাকে যখন আমরা মিলিয়ে দেখি তখন নিয়তির পরিহাসটা বড় বেশী নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ পায় ; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র এই নিষ্ঠুরতার কারণেই রাবণ আমাদের হৃদয়ের এত নিকটে।

৪

মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ চরিত্রের পূর্ণতা

মহাকাব্যে চরিত্রের পূর্ণতা চরিত্রের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং ইতিহাসগত পরিণতির উপর নির্ভর করে না। প্রাচীন সংস্কৃত-যুগে এই ইতিহাস এবং পুরাণগত পূর্ণতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তাই সেখানে নায়কের জন্ম-সময়, বংশ-পরিচয়, বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তার ক্রমবিকাশ এবং ইতিহাস-বা পুরাণ-আশ্রিত পরিণতি লক্ষ করি। গ্রীক আলঙ্কারিকরা চরিত্রের পূর্ণ ইতিহাস এভাবে জ্ঞাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা বলেছেন যে, চরিত্র বিশেষক্ষেত্রে, বিশেষ আবেগ বা সত্যবোধে পূর্ণরূপে জাগ্রত হবে এবং এই জাগরণের মধ্যেই চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয়। জীবনের দীর্ঘ সময়-ক্ষেপণের মধ্য দিয়ে মানুষের যে-বিকাশ তাতে মানুষের দৃশ্যমান গতিবিধির পরিচয় আছে; কিন্তু প্রাণপ্রবাহের যথার্থ পরিচয় আছে কিনা বলা কঠিন, কেননা প্রাণধর্ম দেহবিকাশের সঙ্গে পূর্ণভাবে জড়িত নয় এবং মানুষ-যে ক্রমান্বয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবর্ধমানরূপে অগ্রসর হয়েছে তাতে গতানুগতিকতার স্বরূপই আছে; বিশেষ হৃদয়-বিকাশের পরিচয় নেই। গ্রীক আলঙ্কারিক জোর দিয়েছেন ঐক্যতত্ত্বের উপর। সময়, স্থান এবং আবেগের একীভূত তত্ত্ব। সেখানে সময় থেকে স্থান বিচ্ছিন্ন হয় নি এবং স্থান ও সময়ের সঙ্গে জড়িত হয়েই আবেগের প্রকাশ ঘটেছে। তাই সেখানে আমরা দৃশ্যমান গতানুগতিক জীবনধারার প্রবাহ পাই না; কিন্তু হঠাৎ এক বিশেষ মুহূর্তে সম্পূর্ণ জীবনকে বিশেষ আবেগের সম্ভারে জাগ্রত এবং বিকাশমান দেখি। যুদ্ধ-ক্লান্ত ইউলিসিস জীবনের মধ্যযামে বহু বিপদ এবং অসম্ভবের সম্মুখীন হলো, অবশেষে সমস্ত কিছু অতিক্রম করে গৃহের মমতা এবং সমর্থনের ক্ষেত্রে নিজেকে আবিষ্কার করলো। এখানে আমরা ইউলিসিসের পূর্ণ পরিচয় পেলাম। ইউলিসিসের পূর্ণতা হচ্ছে তার জাগ্রত জীবন এবং শক্তিমান মানসিকতা। সংস্কৃত কবি সর্বমুহূর্তেরই চরিত্রের পূর্ণ ইতিহাস জ্ঞাপন করতে চেয়েছেন, তাই রামায়ণে রামের জন্ম, ক্রমবর্ধমান অবস্থা, বিবাহ, বিপর্যয়, অসদ্ভাব এবং অবশেষে শান্তি ও মৃত্যুর পরিচয়

আছে; অর্থাৎ সংস্কৃত কবি জীবনের দৃশ্যমান বিকাশকে অস্বীকার করেন নি। গ্রীক কবি যেখানে উপলব্ধির উপর জোর দিয়েছেন সংস্কৃত কবি সেখানে ইতিহাস বা পুরাণ-আশ্রিত পরিচয়ের উপর নির্ভর করেছেন। অবশ্য জীবনের দীর্ঘ পরিচয়ের মধ্যে বিশেষ বিশেষ রসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার অর্থ এই, রস বিশ্লিষ্ট হয়েছে চরিত্রের ইতিহাস থেকে এবং রস সে কারণে চরিত্রের উপর আরোপিত। সময়ের দীর্ঘ পরিসরে চরিত্র বিভিন্ন রসের বিকাশ ঘটিয়েছে আপন জীবনে, তার মধ্যে একটি রস প্রধান, অন্যগুলো হচ্ছে তার অনুষঙ্গী। তাই সেখানে রস-বিশ্লেষণ চরিত্র থেকে বিলক্ষণ। গ্রীক কাব্যে এটা সম্ভবপর হয় নি। তার কারণ সেখানে চরিত্র আবেগের সম্ভার, সময় এবং স্থান নিয়ে একই সঙ্গে উচ্চকিত। ইউলিসিসের শক্তিমান রূপ অথবা ব্যক্তিত্ব তার গতিবিধির সঙ্গে জড়িত; কিন্তু রামচন্দ্রের চরিত্র সেভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয় না। জীবনের বিস্তৃত বিকাশ নিয়ে রামচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে আপন জীবনে বিভিন্ন রসের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং সেই রস বিশ্লেষণের জন্যে বিভিন্ন ঘটনাই যথেষ্ট। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ আবেগ প্রকাশের জন্যে বিশেষ বিশেষ ঘটনার উন্মোচন প্রয়োজন হয়েছে। আবেগের ব্যাখ্যার জন্যে ঘটনা এসেছে, তাই সেখানে চরিত্রের একটি স্থূলরূপ খুঁজে পাওয়া যায়।

আরোপিত-সত্য এবং উদ্ভূত-সত্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। উদ্ভূত সত্যের ক্ষেত্রে ঘটনা, আবেগ এবং চরিত্র একই সঙ্গে জাগ্রত। ঘটনাকে সেখানে আবেগ থেকে বিভিন্ন করা যায় না এবং চরিত্র ঘটনা এবং আবেগের মধ্যেই জাগ্রত। আরোপিত-সত্যে আমরা পূর্ব থেকে নির্ধারিত চরিত্রকে পাই; অর্থাৎ কবি সেখানে চরিত্রের ঘটনাগত একটা বিন্যাস নির্মাণ করেন এবং সেই বিন্যাসের মধ্যে বিভিন্ন আচরণের পরিচয় দেন। যেমন রামচন্দ্র লোকরঞ্জন, প্রজাহিতৈষী, ধর্মপ্রাণ—চরিত্রের এহেন প্রস্তাবনা গ্রন্থারম্ভেই করা হয়েছে। কবির দায়িত্ব হচ্ছে এর পর বিভিন্ন কৃত্যে ঐই আদর্শগুলোর পরিচয় দেওয়া। গ্রীক কবি এখানে চরিত্রের কোন প্রস্তাবনা করবেন না, চরিত্র সেখানে উদিত হবে নতুন সূর্যের মতো, যেমন হয়েছে ইউলিসিসের ক্ষেত্রে অথবা ইডিপাস নাটকে ইডিপাসের ক্ষেত্রে।

লেখক চরিত্রকে নির্ধারিত করে দেন নি, চরিত্র আপনার হৃদয়ের মতো আপনাকে নির্মাণ করেছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ আমরা চরিত্রের এ পূর্ণতাকে কি ভাবে পাই? তিনি কি আরম্ভে চরিত্রের প্রস্তাবনা করেছেন? না, তাঁর চরিত্রগুলো বিচিত্র বিপর্যয়ে আপনাদেরে নির্মাণ করেছে? রাবণ-চরিত্রের উন্মোচন এবং সমৃদ্ধি দেখলে সহজেই এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া যায়। এ কাব্যে রাবণ সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ চরিত্র এবং আবেগের সম্পূর্ণতার জন্যেই চরিত্র এখানে পূর্ণাবয়ব। রাবণ-চরিত্রের উন্মোচন যখন, তখনই তার বিকাশ এবং সমৃদ্ধি; কোনপ্রকার সময়-ক্ষেপণের প্রয়োজন হয় নি। বিচিত্র কৃত্যে আপনাকে বিকাশমান করবারও প্রয়োজন হয় না। সময়, আবেগ এবং চরিত্র একটি ঐকতান গড়েছে। আমরা রাবণকে পাই রামায়ণের ইতিহাসের ধারায়, কোন বিশেষ পর্যায়ে নয়; কিন্তু তাকে পাই একটি চরম সঙ্কটের মুহূর্তে নিঃসংশয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন। যে-বিপর্যয়ের প্রতিরোধ অসম্ভব, সেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েই সে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্যে অত্যন্ত সচেতন।

প্রথম সর্গেই রাবণ-চরিত্রকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত দেখি। দৃশ্য উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে রাবণকে স্নেহে আর্ত এবং বেদনায় ভগ্নপ্রাণ দেখি এবং এই আর্ত ও ভগ্নপ্রাণ অবস্থায় রাবণের সম্পূর্ণ জীবন যেন নিঃশেষিত মনে হয়। সে নিজেকে ভাগ্যহত মনে করেছে! কেন তার সর্বনাশ ঘটলো তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে আপন প্রবৃত্তির উপর দোষারোপ করছে; কিন্তু একটু পরেই আমরা দেখি যে, বীরবাহুর বীরত্বখ্যাতি শুনে রাবণ আনন্দিত হচ্ছে এবং সবাইকে আবার নতুন করে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে বলছে। এর পরেই রাবণের আবেগ হচ্ছে দেশের সম্মান এবং সৌন্দর্য রক্ষা করা। দেশ-প্রীতির এই দীপ্তিময় ব্যঞ্জনা নিম্নের দুটি উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হবে:

১. এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলী; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,

দূর কর আপদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।

২. নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজ-স্থন্দরী,
তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি !
রক্ষ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী।

আমরা লক্ষ করছি যে, পূর্বাহ্নে প্রস্তাবিত কোন বিশেষ রূপে রাবণ-চরিত্রের বিকাশ ঘটে নি। চরিত্র নিজের পথ নিজেকেই নির্মাণ করেছে। কবির কোন দায়িত্বই যেন নেই! চরিত্র বিভিন্ন ঘটনা এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ক্রমান্বয়ে আপন প্রকৃতির উদ্‌ঘাটন করেছে। এ ভাবে যে-চরিত্র নির্মিত হলো তার মধ্যে আমরা আরোপিত-সত্যকে পেলাম না, কিন্তু উদ্ভূত-সত্যকে পেলাম। অর্থাৎ সত্য এখানে চরিত্রের বিকাশের মধ্যে ফলবান ; কিন্তু সত্যের সমর্থনের জন্যে চরিত্রের বিকাশ নয়। সত্য বলতে আমরা এখানে চরিত্রের প্রকৃতিগত স্বাভাবিকতাকে মনে করছি।

সংস্কৃত কাব্যে কবিরা চরিত্রের প্রস্তাবনা শুরুতেই করেছেন, তার কারণ চরিত্র সেখানে প্রাচীন ইতিহাস এবং পুরাণ থেকে নেওয়া এবং সে কারণে চরিত্রের সচলতারও একটা বাধ্যবাধকতা আছে, অর্থাৎ চরিত্র পুরাণে এবং ইতিহাসে যেভাবে নির্মিত হয়েছে তার থেকে কোন প্রকারের ব্যতিক্রম ঘটছে না। কালিদাস রঘুবংশের শুরুতে বলছেন যে, সূর্য-সম্ভূত বংশের বর্ণনা অতিশয় দুষ্কর হলেও এ বিষয়ের এক উপায় বিদ্যমান আছে ; মহাকবি বাল্মীকি ও অন্যান্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ এর প্রবেশদ্বার আবিষ্কার করে গেছেন। হীরক দ্বারা ছিদ্র করলে মণির মধ্যে যেমন সহজেই সূত্রের সঞ্চার হয়ে থাকে, বর্ণনীয় অংশে কালিদাসেরও সেইরূপ গতি হবে, অর্থাৎ প্রাচীন মহর্ষিগণের

বিরচিত আখ্যানসমূহই তাঁর প্রধান সহায় হবে। আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি যে, প্রাচীন মহাকাব্যে চরিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন জটিলতা ছিল না, প্রাচীন নির্ধারিত সত্যের সমর্থনই ছিল সেখানে বড় কথা। মধুসূদনের প্রার্থনা ভিন্ন-ধর্মী। প্রথম সর্গে তিনি বলছেন :

গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত ; উরি দাসে দেহ পদচ্ছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র· গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

চতুর্থ সর্গে কবির প্রার্থনা :

হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
দীন আমি ! রত্নরাজী তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।

দেখা যাচ্ছে, কবি নির্ধারিত কোনও চরিত্রকে অনুসরণ করছেন না। পূর্ববর্তী কবিগণের আবেগ তিনি চান, কিন্তু তাঁদের অবলম্বিত সত্যকে তিনি চান না। জীবনের উন্মোচন এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি নতুন প্রাণ-সম্পদ যাচ্ঞা করেছেন এবং এক্ষেত্রে মধুসূদনের সম্পর্ক গ্রীক কবিদের সঙ্গে। তাঁদের প্রাণধর্মকে তিনি অবলম্বন করেছেন এবং তাঁদের ঐক্যতত্ত্ব তাঁর স্বপ্নে ও কল্পনায় নতুন অনুভূতির সঞ্চার করেছে।

যেখানে সংস্কৃত কবি ভক্তি এবং নিবেদনের পথ বেছে নিয়েছেন, প্রাচীন যুগের পাশ্চাত্য কবি সেখানে কাহিনীর উন্মোচন এবং বিন্যাস চেয়েছেন মাত্র। কাহিনী-উন্মোচন অর্থাৎ চরিত্রের মূল সত্য এবং কাহিনীর সঙ্কট-

কালের জাগরণ। 'ইনিদ'-এর শুরুতে ভার্জিল নায়কের অশেষবিধ বিপর্যয়, সর্বনাশ এবং সঙ্কটের কারণ সন্ধান করেছেন, দান্তে 'ডিভাইন কমেডি'র শুরুতে মিউজের সহায়তা চেয়েছেন সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে; কিন্তু সত্য যে কি তা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি, কাহিনীর উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে সত্য আপনা থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য 'প্যারাডাইজ লস্ট'-এ মিল্টন সংস্কৃত কবিদের মত আরোপিত-সত্যের কথা বলেছেন। সেখানে ন্যায়ানুসরণ এবং খ্রীস্টান ধর্ম-সমর্থিত সত্যের প্রতিষ্ঠাই কবির উদ্দেশ্য।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ রাবণ-চরিত্র উনিশ শতকের নবজাগ্রত জীবন-চেতনার প্রতীক। উনিশ শতকে বাঙালীর সমাজ যখন সর্বতোভাবে স্বাধীন হতে চাচ্ছে সে মুহূর্তেই 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর রাবণের আবির্ভাব। সর্বতোভাবে স্বাধীন অর্থাৎ সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত, ধর্ম-প্রেরণায় সর্বমুহূর্তেই উচ্চকিত। যুগের এই স্পৃহাকে রাবণ বহন করছে, তাই তার জীবনে জয়-পরাজয়ের বৈলক্ষণ্য নেই, কেননা সংগ্রামই যেখানে সত্য সেখানে শান্তিও সংগ্রামের সঙ্গেই ওতপ্রোত। অস্তিত্বের মূল্য বিপর্যয়ের বিস্তারের মধ্যেই,—কোনপ্রকার জয়লাভের মধ্যে নয়। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ তাই আমরা কোন প্রকার জয় কিংবা পরাজয়ের ইতিহাস পাই না; কিন্তু সংঘর্ষের অভিঘাতে জীবনের মূল্য নিরূপিত হতে দেখি। 'কিং লিয়ার' নাটকে সেক্সপীয়ার যে-কথা বলেছেন **'We must endure our coming hence, as our going hither ; ripeness is all'.** 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর ক্ষেত্রেও সে কথা প্রয়োগ করা চলে। অপরিসীম তমসায় সৃষ্টি নিশ্চিহ্ন হয় নি, কিন্তু তমসা আছে বলেই নতুন সূর্যের অভ্যুদয় সম্ভবপর হয়েছে। আমরা লক্ষ করি যে, অপরিসীম তমসার মধ্যে দেবতাদের জয় ঘোষিত হয়েছে; কিন্তু রাবণের সত্যিকার বিকাশ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয় সর্গে দেবতাদের কার্যক্রম যেখানে বর্ণিত হয়েছে তখন রাত্রিকাল—

অস্ত গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি
একটি রতন ভালে।

পঞ্চম সর্গে যেখানে দেবতাদের ষড়্‌যন্ত্র সম্পূর্ণ হচ্ছে, তখনো অপরিসীম অন্ধকার—

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ আলয়ে।

ষষ্ঠ সর্গে যেখানে রাবণকুলে সর্বনাশ হলো, দেবতাদের এবং দেবোপম মানুষের অমানুষিকতায়, সেখানে অন্ধকার রাত শেষ হয় নি।

অষ্টম সর্গে রাম পাতালপুরীতে দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে লক্ষ্মণকে বাঁচাবার প্রার্থনা নিয়ে, তখনো অন্ধকার রাত—

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট : রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব।

কিন্তু রাবণের জাগরণ পরিপূর্ণ সূর্যালোকে। মেঘনাদের হত্যার পর সপ্তম সর্গে যেখানে রাবণ যুদ্ধে দেবতাদের পরাজিত করছে তখন রাত্রি নেই—

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্নভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।

এবং নবম সর্গে যেখানে রাবণকে সর্বস্বান্ত অবস্থায় দেখছি, কিন্তু শক্তিহীন অবস্থায় নয়, তখনো প্রমুক্ত উষা—'প্রভাতিল বিভাবরী'। মনে হয় কবি সূর্যালোক এবং তমসার বৈপরীত্যের মাধ্যমে জীবনের মূল্য নির্ধারিত করেছেন।

মহাকাব্যে অন্ধকার সাধারণত গোপন ষড়্‌যন্ত্রের প্রতীক—কখনো কখনো পরাজয়ের, হতাশ্বাসের, লাঞ্ছনার এবং গ্লানিকর জীবনযাত্রার, আবার কখনো কখনো অন্যায় আচরণের, নিষ্ঠুরতার এবং মলিন ও অসমর্থিত সম্পর্কের। এ্যাংলোসেক্সন-মহাকাব্য 'বিউল্‌ফ্'-এ আমরা সমস্ত ঘটনা গভীর অন্ধকারের মধ্যে সংঘটিত হতে দেখি। সমস্ত লোক দিবসের অপরিমিত আনন্দে রাত্রিতে যখন উন্মুক্ত প্রাসাদকক্ষে বিশ্রাম নিচ্ছে, তখন সমুদ্রের তলদেশ থেকে একটি নিষ্ঠুর দৈত্য বেরিয়ে আসছে আর নিরীহ নাগরিকদের আক্রমণ করছে। এ দৈত্যের জন্ম অন্ধকারের মধ্যেই।

'বিউলফ' মহাকাব্যে আমরা মানুষের অন্ধকার থেকে আলোকে বিনির্গমনের সাধনার পরিচয় পাই এবং সেখানে সর্বপ্রকার অনমুষ্ঠেয় কর্ম রাত্রিতে সংঘটিত হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশে দৈত্যকে হত্যা করার পর 'বিউলফ' বেরিয়ে এল পরিপূর্ণ আলোকে অর্থাৎ তখন সর্বপ্রকার অসদাচরণের সমাপ্তি ঘটল এবং শক্তিকে অবলম্বন করে জাগ্রত হলো।

অন্ধকারকে পরাজয়ের প্রতীক হিসেবে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন কীট্‌স্ তাঁর 'হাইপেরিয়ান' গ্রন্থে। সেখানে শনি দেবতার পরাজয়ে অস্তিত্ব-বিচ্যুতির যে-সংবাদ আছে, তার পরিচয় এভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন,—

Deep in the shady sadness of a vale,
Far sunken from the healthy breath of morn,
Far from the fiery noon, and eve's one star ;
Sat grey-hair'd Saturn quiet as a stone,
Still as the silence round about his lair ;
Forest on forest hung about his head
Like cloud on cloud. No stir of air was there,
Not so much life as on a summer's day
Robs not one light seed from the feathered grass,
But where the dead leaf fell, there did it rest.
A stream went voiceless by, still deadened more,
By reason of his fallen divinity
Spreading a shade : Naiad 'mid her reeds
Press'd her cold finger closer to her lips.

এ কাব্যে কীট্‌স্ স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, আমাদের পদচারণের সঙ্গে সঙ্গে জয়ের আশ্বাস আসে এবং আমরা এই জয়ের সম্ভাবনায় ক্রমান্বয়ে অন্ধকারকে অতিক্রম করে আসি। রূপহীন অসদ্ভাব এবং বিশৃঙ্খলা অন্ধকারেই শক্তিমান ; কিন্তু আমরা জয়লাভের পথে যতই অগ্রসর হই, ততই সর্বপ্রকার shapeless chaos-কে অতিক্রম করে আসি। এখানে তিনি স্পষ্টভাবে আলোককে জয়, আশ্বাস এবং সম্ভাবনার প্রতীক ধরেছেন, এবং অন্ধকারকে প্রতীক ধরেছেন বিশৃঙ্খলার অসদ্ভাবের এবং অন্যায়ের।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রথম সর্গে মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণ করে রাবণ যখন যুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন তখন তিনি বলছেন যে, মেঘনাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে ইষ্টদেবকে পূজা করা এবং পরে প্রভাতকালে রাঘবের সঙ্গে যুদ্ধ করা। রাত্রিকালে কোন প্রকার কার্যক্রম তিনি সমর্থন করেন নি—

তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি !
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে,
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।

দ্বিতীয় সর্গে আমরা লক্ষ করি যে, যখন রাত্রি হলো তখন দেবতাদের ষড়্‌যন্ত্র সম্পূর্ণ হলো। অন্ধকার রাত্রিতে দেবতারা রাবণের বিনাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এক পক্ষ যখন সংগ্রামের প্রয়োজনে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় আছে, অপর পক্ষ তখন অন্ধকার রাত্রিতে গোপন অসদাচরণের সুযোগ নিয়েছে।

তৃতীয় সর্গে কবি প্রমীলার আসন্ন সবনাশের আভাস সূর্য ও অন্ধকারের রূপকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন,—

আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে কে পারে কহিতে ?
কত দূরে হেরি বামা সূর্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে ;—
'তোর লো যে দশা এই ভোর নিশা-কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা !
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে !
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে !
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি !

কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা

আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে ?'

তৃতীয় সর্গের একটা ব্যাপার এখানে বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য। তা হচ্ছে এই যে, প্রমীলা স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় তার নারীসৈন্য নিয়ে লঙ্কাপুরে যাচ্ছে গভীর রাত্রিবেলায় ; কিন্তু সেখানেও কোন গোপনতা নেই। বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল স্পষ্টতায় প্রমীলা তার সখীদের নিয়ে রামের শিবিরের সামনে এসেছে এবং অগ্রসর হবার দাবী জানিয়েছে,—

বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে ;
নতুবা ছাড়হ পথ ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে ;
রক্ষোবধূ মাগে রণ ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা ; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর ; নহে চর্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত !
যথারুচি কর, দেব ; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্র-বাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগ-পালে।

প্রমীলা-যে হঠাৎ রঘুপতির সামনে এসে তাদের বিভ্রান্ত করেছে তা নয়, প্রথম থেকেই সে স্পষ্টভাবে অগ্রসর হয়েছে এবং সবাইকে জানিয়েই পথ চলেছে, গোপনে নয়,—

যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে

আবরিতে অগ্নি-শিখা ? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।

প্রথম সর্গে যেমন দেখেছি রাবণ মেঘনাদকে সেনাপতি পদে বরণ করছে এবং প্রকাশ্য-যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে বলছে, তেমনি এখানে প্রমীলার ক্ষেত্রেও কোন প্রকার অন্তরালের এবং গোপন আচরণের প্রশ্রয় নেই। অপ্রস্তুত রাম-সৈন্যকে অতর্কিতে আক্রমণ করে পরাভূত করা প্রমীলার পক্ষে অসম্ভব ছিল না ; কিন্তু প্রমীলাও রাবণ এবং মেঘনাদের মত বীরধর্মে বিশ্বাসী। তাই কোন প্রকার অসদাচরণের সমর্থন তার মধ্যে আমরা পাই না। প্রমীলা বলছে যে, রাম মেঘনাদের শত্রু এবং মেঘনাদ বীর, সুতরাং মেঘনাদ সংগ্রামে তাকে পরাভূত করবে। রামচন্দ্র প্রমীলার শত্রু নয়, তাই পতি-বৈরীর সঙ্গে সংগ্রাম করবার আকাঙ্ক্ষাও তার নেই, তবে আঘাত করলে প্রতিঘাতের জন্যে সে প্রস্তুত হবে,—

রঘুবর পতি-বৈরী মম,
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী ;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে।

এ-সর্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাবণ-পক্ষীয়দের কর্মধারাও কখনো কখনো রাত্রিতে সংঘটিত হয় ; কিন্তু সেখানে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে না এবং কোন প্রকার গোপনতার প্রশ্রয় থাকে না। রাত্রিও সেখানে দিবসের স্বচ্ছতা পায়। এক ক্ষেত্রে সূর্যালোকে সমস্ত কিছু উজ্জ্বল, অন্য ক্ষেত্রে অগ্নি-শিখায় সমস্ত কিছু উদ্ভাসিত। এ-সর্গে মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনবরত অগ্নির উপমা এনেছেন, যেমন—

১. চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে !

২. যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ-দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে !

৩. অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে অগ্নেয়গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে !

৪. যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারিদিক আইলা ধাইয়া
পৌর জন !

৪. চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।

সপ্তম সর্গে রাবণ যেখানে শুধু বীরধর্মের উপর নির্ভর করে উজ্জ্বল দিবা-লোকে প্রকাশ্য সংগ্রামে নেমেছে, সেখানেও রাম-পক্ষীয়েরা ছলনা এবং গোপন ষড়্‌যন্ত্রের প্রশ্রয় ছাড়ে নি। রাবণের পরিচয় এ-সর্গে যতটা পরিপূর্ণ ভাবে স্পষ্ট হয়েছে, অন্য কোথাও ততটা হয় নি। সর্বস্বহারা হয়ে রাবণ চরম সঙ্কটের মুহূর্তে একমাত্র মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত। এখানে মৃত্যুতে তার পরাজয় নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা। রাবণের উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য :

দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী ;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে ! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে

স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণ-লঙ্কা-অলঙ্কার! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম? কিন্তু দেব-নরে
পরাভবি, কীর্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বামতম মম প্রতি; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে?
আর কি পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি!
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে;
বিশ্বজয়ী, স্মরি তারে চল রণস্থলে!
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্বুরকুলে—
কর্বুরকুলের গর্ব মেঘনাদ বলী!

এর পূর্বের অর্থাৎ ষষ্ঠ সর্গে অন্ধকারে গোপন অন্যায়ের চরম নিদর্শন আমরা দেখেছি। সর্বপ্রকার ন্যায়, সম্ভ্রম, ক্ষত্রধর্ম বা সজীব বীরধর্মের স্পষ্টতা সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে লক্ষ্মণ নির্লজ্জ তস্করের মত দেবতাদের সহায়তায় কৌশলে মেঘনাদকে হত্যা করেছে। লক্ষ্মণ এসেছে মায়াদেবীর সহায়তায় সকলের অলক্ষ্যে অত্যন্ত গোপনে। কাপুরুষতার এমন জঘন্য নিদর্শন আর কোথাও নেই। অন্য দিকে আমরা দেখি যে, মেঘনাদ প্রকাশ্য

যুদ্ধে লক্ষ্মণের সম্মুখীন হবার পূর্বে ইষ্টদেবকে অর্চনা করছে। এ অর্চনা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার জন্যে, লক্ষ্মণকে নিহত করার গোপন কৌশলের সন্ধানের জন্যে নয়, এবং মনে রাখতে হবে ইষ্টদেবের পূজাও গোপন থাকে নি। বিভীষণের পথ-নির্দেশে লক্ষ্মণ সেই অর্চনাক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে এবং গোপন আক্রমণে শুধু-যে মেঘনাদকে হত্যা করেছে তা নয়, পবিত্রতা এবং মনুষ্যধর্মকেও হত্যা করেছে। লক্ষ্মণের পক্ষে যুক্তি হচ্ছে :

> আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
> ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
> অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
> তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
> তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!

এর সুন্দর উত্তর দিয়েছে মেঘনাদ নিজেই :

> ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
> লক্ষ্মণ। নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
> রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
> নাম তোর রথী-বৃন্দ! তস্কর যেমতি,
> পশিলি এ গৃহে তুই।

অন্যায় সমরে চরমভাবে আহত হল যখন মেঘনাদ, তখনকার বর্ণনায় মধুসূদন অপরিসীম করুণা প্রকাশ করেছেন :

> যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
> সভায় কর্বুরপতি, সহসা পড়িল
> কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
> রিপুরথী কাটি যবে পড়ে রথতলে।
> সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে!
> প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল!
> আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
> মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে!
> মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
> আচম্বিতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল

শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে!

মেঘনাদের হত্যার পর লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ যখন ফিরে চললো রামের কাছে তখন তারা স্পষ্ট পথে সমুন্নত শিরে যায় নি। যেভাবে গোপন পদচারণ ছিল তাদের প্রথম যাত্রায় সেই একই গোপনতা নিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা শঙ্কাকুল চিত্তে তারা পলায়ন করলো—

বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দূলী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে।

অপরিসীম তমসার চিত্র এঁকেছেন মধুসূদন অষ্টম সর্গে, যেখানে রামচন্দ্র পাতালে গিয়েছে পিতা দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে। সর্গের আরম্ভেই আমরা রাত্রি দেখি। এই রাত্রিতেই বৈতরণী পার হয়ে চির-নিশাবৃত-পুরীতে রামচন্দ্র আসছে। এখানকার অন্ধকার অতলস্পর্শী, ভয়াবহ এবং যন্ত্রণায় নিঃসংশয়। মধুসূদন এই সর্গের আদর্শ পেয়েছিলেন ভার্জিলের ইনিদ্ মহাকাব্যের ষষ্ঠ পুস্তকে। ইনিদ্-এ অন্ধকারের বর্ণনা এভাবে আছে:

They were walking in the darkness, with the shadows round them and night's loneliness above them, through Pluto's substanceless Empire, and past its homes where there is no life within; as men walk through a wood under a fitful moon's ungenerous light when Jupiter has hidden the sky in shade and a black night has stolen the colour from the world. In front of the very Entrance Hall, in the very Jaws of Hades, Grief and Resentful Care have laid their beds. Shapes terrible of aspect have their dwelling there, pallid Diseases, Old Age forlorn, Fear,

> **Hunger, and Counsellor of Evil, ugly Poverty, Death, and Pain. Next is the Sleep who is close kin to Death, and Joy of Sinning and, by the threshold in front, Death's harbinger, War. And the iron chambers of the Furies are there, and Strife the insane, with a bloody ribbon binding her snaky hair. (W. F. Jackson Knight-**কৃত অনুবাদ)

মধুসূদন অন্ধকারের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত !
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী—
বজ্রনাদে ; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে !
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা ; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অষ্টম সর্গে বিদেশী প্রভাব অনেক বেশি পড়েছে এবং প্রভাবটি মূলত স্থূল। কাব্যভাবের দিক থেকেও এ সর্গটি সর্বাপেক্ষা দুর্বল। এখানে গতির পরিচয় নেই, প্রাণ-ধর্মের পরিচয় নেই, একটি আড়ষ্ট সচেতন কল্পনাকে মধুসূদন কোনক্রমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বিদেশী-সাহিত্যের মূল অনুকৃতির কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

১.　　　　　　এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে !

দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'তে পাই :

Through me you pass into
the city of woe,
Through me you pass into
eternal pain,
Through me among the people
lost for aye……
All hope abandon ye who
enter here.

২. বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে !

'অডিসি'র একাদশ পুস্তকে আছে :

A pair of vultures sat by him, one on either side, and plucked at his liver, plunging their beaks into his body.

৩. নহে ভূতপূর্ব দেহ এবে যা দেখিছ,
প্রাণাধিক ! ছায়া মাত্র ! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া শরীরী তুমি ? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম ।

'অডিসি'র একাদশ পুস্তকে পাই অডিসির মাতা অডিসিকে বলছে :

We no longer have sinews keeping the bones and flesh together, but once the life-force has departed from our white bones, all is consumed by the fierce heat of the blazing fire, and the soul slips away like a dream and flutters on the air.

মায়াদেবীকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধকার নরকের দেশে রামচন্দ্রের যাত্রা এপোলোর প্রিস্‌টেসের সঙ্গে ইনিসের যাত্রা তুলনীয় । ইনিস এসেছে এক ভয়াবহ নদীর তীরে যেখানে বহু আত্মা জড়ো হয়েছে নদী পার হবার আশায় । বসন্তের শুরুতে ঝরে-পড়া অজস্র শুকনো পাতার মতো

তাদের সংখ্যা অনেক। নদী পার হয়ে তারা যেতে চাচ্ছে সূর্যকরোজ্জ্বল ভূমিতে, তারা আশায় তাদের বাহু প্রসারিত করেছে, কিন্তু নিষ্ঠুর নৌকা-চালক তাদের কাউকে পার করছে, আবার কাউকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ইনিস প্রশ্ন করলো, নদীর তীরে এ জটলার কারণ কি? এ-সমস্ত আত্মারা কি চায়? দেবী উত্তর করলেন:

All this multitude which you see are the resourceless, who had no burial. The warden over there is Charon, and those who are ferried over the waves are the buried. It is forbidden to convey them past the banks of dread and over the snarling current before their bones have found rest in a due burial place; instead they must roam here flitting about the river banks for a hundred years, and not until then are they accepted and find their way home to the pools which are now their heart's desire.

(Jackson Knight-এর অনুবাদ)

মধুসূদনের অনুকৃতি এ অংশে অত্যন্ত দুর্বল। তিনি নদীতীরে এক অদ্ভুত সেতুর কথা বলেছেন যেদিকে লক্ষ কোটি প্রাণী ছুটে চলেছে। তিনি প্রশ্ন করছেন যে, সেতুটি বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করছে কেন এবং অগণ্য প্রাণীও-বা সেদিকে ছুটে চলেছে কেন। মায়াদেবী তার উত্তরে বলছেন:

কামরূপী সেতু,
সীতানাথ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা।
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেতপুরে কর্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে।
ধর্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব দ্বারে; পাপী যারা

সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে ; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন !
চল মোর সাথে তুমি ; হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।

'ইনিদ' কাব্যে ইনিস যখন নদীর তীরে এল তখন নৌকাচালক তাকে লক্ষ করে বলল, তোমরা যেই হও, তোমাদের গতি সংযত কর ; বল, কোথা থেকে আসছ। এটা ছায়ার দেশ, ঘুমের দেশ এবং স্বপ্নাচ্ছন্ন রাত্রির দেশ। এ নদী সকলে অতিক্রম করতে পারে না।

Whoever you are who stride in arms towards my river, come, say why you approach. Check your pace; speak now, from where you are. This is the land of the Shades, of Sleep and of Drowsy Night. It is sin to carry any who still live on board the boat of Styx.

তখন ইনিসের সঙ্গিনী এপোলো দেবতার পূজারিণী উত্তরে বললেন যে, তাঁদের কোন অসদুদ্দেশ্য নেই এবং তাঁদের সে পথে আসার অধিকার আছে। এই বলে তিনি মন্ত্রপূত বৃক্ষশাখা তাকে দেখালেন। বৃক্ষশাখা দেখে প্রহরী বিনীত হল এবং তাঁদের যাত্রায় বাধা দিল না।

And she showed the branch which had been hidden in her garment. The storm of anger in Charon's heart subsided and he said no more to them.

এর পর তাঁরা নদী অতিক্রম করলেন।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ এ অংশের অনুকৃতি এভাবে ঘটেছে :

ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ-দেউটী সম অগ্রে কুহকিনী
উজ্জলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মুরতি
যমদূত দণ্ডপাণি। গর্জি বজ্রনাদে

শুধিলা কৃতান্তচর, 'কে তুমি ? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি পশিলা এ দেশে
আত্মময় ? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্তেকে !' হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে।
নতভাবে নমি দূত কহিলা সতীরে ;—
'কি সাধ্য আমার, সাধিব, রোধি আমি গতি
তোমার ? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা ঊষার মিলনে !'
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি ; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম গতি চৌদিক উজলি !

'ইনিদ'-এ নদী পার হয়ে ইনিস এল বিভিন্ন বেদনা, পীড়া, লাঞ্ছনা এবং দুঃখের ক্ষেত্রে। সে অংশের বর্ণনা **Jackson Knight**-এর অনুবাদ থেকে তুলে দিচ্ছি :

Immediately cries were heard. These were the loud wailings of infant souls weeping at the very entranceway ; never had they had their share of life's sweetness, for the dark day had stolen them from their mother's breasts and plunged them to a death before their time. Next to them are those who had been condemned to die on a false accusation. But here their places are always justly assigned by a jury chosen by lot ; for Minos, as president of the court, shakes the urn, convenes a gathering of the silent, and gives a hearing to the accounts of lives lived and charges made. Beyond these souls, in the next places, the sorrowful who thought without guilt, gained death for themselves by their own hand, flinging their lives away in

utter loathing for the light. How willingly they would now endure all the poverty, and every harsh tribulation, in the bright air above ! But Divine Law bans their way back, the unlovely marsh holds them bound behind its doleful waters, and the nine encircling coils of Styx confine them. Not far hence are displayed the fields of Mourning, as they name them, and they stretch in every direction. Here there are secluded paths and a surrounding myrtle-wood which hides all those who have pined and wilted under the harsh cruelties of love. Even in death their sorrows never leave them. In this region Aeneas could see Phaedra and Procris and Eriphyle, grieving and showing the wounds dealt her by her brutal son and Evadne, and Pasiphae ; and with them went Laodamia, and Caeneus who had in youth for a time been made but is now a woman, having been destined again to revert to her original shape.

আর মধুসূদনের রামচন্দ্র নরকে যা দেখলেন তা চরম বীভৎস ও বিকল। ভাষা আড়ষ্ট, গতিহীন বাক্য-বিন্যাস অত্যন্ত শ্লথ এবং সম্পূর্ণ চিত্রটি শিল্প-বিচারে আপত্তিজনক এবং অহেতুক কষ্টকল্পনায় ভারাক্রান্ত। উদাহরণটি এই :

অস্থিচর্মসার দ্বারে দেখিলা স্থরথী
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি ; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা ;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্মতি
পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে

সুখাদ্য ! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি ! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা !
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে !
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাসি কাসি দিবানিশি ; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া ! ইত্যাদি—

অষ্টম সর্গের বিদেশী প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে আমি আমার আলোচনার মূলসূত্রকে অনেকটা অতিক্রম করে এসেছি। এই সর্গটি অনেকটা অহেতুক সংযোজন। মধুসূদন ইচ্ছে করলে দেবতাদের কৃপায় সহজেই লক্ষ্মণকে বাঁচাতে পারতেন, দশরথের কাছে নরকে রামচন্দ্রকে টেনে নেওয়ার কোন দরকার ছিল না। মূল রামায়ণের বিশল্যকরণী নিয়ে এলেও চলতো। মধুসূদন নিজেও তাঁর বিভিন্ন পত্রে এ সর্গ-সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেন নি। তিনি শুধু ইনিডের প্রভাবের কথাই বলেছেন—
Mr Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Aeneas.

নবম সর্গে আমরা আবার প্রকাশ্য দিবালোক দেখছি। এখানে আমরা বেদনার্ত রাবণকে পাই। পুত্রের অন্তিম কৃত্যের জন্য, রামচন্দ্রের কাছে সপ্তদিন যুদ্ধক্ষান্তির আবেদন জানাচ্ছে। কোথাও কোন গোপনতা নেই, বরঞ্চ আশ্চর্য স্পষ্টতায় শত্রু রামচন্দ্রের প্রশংসা সে করছে :

তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্তদিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম পাল, রঘুপতি !
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে

বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি,
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে;
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মধুসূদন রাবণের চরিত্রকে পরিপূর্ণ করেছেন। বিশেষ আবেগের মধ্যে তাকে জাগরিত করে এবং শক্তিমান মানসিকতার মধ্যে। তার জীবনের দৃশ্যমান বিস্তার এখানে নেই, রাবণ আপনার হৃদয়ের সত্যে আপনাকে নির্মাণ করেছে। মধুসূদন আবার অন্ধকার এবং আলোকের রূপকগত বৈপরীত্য এনেও রাবণ-চরিত্রের পূর্ণতা জ্ঞাপন করেছেন।

নজরুল ইসলাম

১

নজরুল ইসলাম : একটি মন্তব্য

মানুষের কামনা-বাসনা সাম্প্রতিক চিন্তার ঊর্ধ্বে কখনও নয়, কিন্তু তবুও কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে বর্তমানের মর্যাদাকে লঘু করে আমরা অতীতের কোনও সৌন্দর্যকে চিরদিন ব্যাপ্ত ও জাজ্বল্যমান রাখতে চাই। এর কারণ হল প্রথমত, অধুনা অত্যুগ্র বেদনার নিবৃত্তির দাবী, দ্বিতীয়ত, পশ্চাতের সম্মোহন এবং তৃতীয়ত, একটি মানসিক অভিলাষ। মুহূর্তের লাঞ্ছনা থেকে মানুষ বাঁচতে চায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, অথবা হয়তো অতীতের সৌন্দর্যকে জীবন্ত করে। এছাড়া অতীতের নিজেরও একটা দাবী আছে। যা প্রাচীন হয়েছে—তাকে ঘিরে একটি স্বপ্নময় মাদকতা আপনা থেকেই গড়ে ওঠে—তাকে আমরা সহজেই এড়িয়ে যেতে পারি না। সে আমাদের বার বার ডেকে নিতে চায় তার পরিবেশের মধ্যে। হয়তো তা বহুদিনের, হয়তো তা মলিন, কিন্তু আমাদের প্রহরে প্রহরে তার আবর্ত মিথ্যা হবার নয়। আমাদের আবার অভিলাষও জাগে অতীতকে বাঁচিয়ে তুলতে।

অতীতের মধ্যে যে-মাদকতা যে-সৌন্দর্য আছে, নজরুলকে ঘিরে আমাদের আজ সেই মাদকতা, সেই সৌন্দর্য। এটা আজ স্পষ্ট যে, তিনি আর কবিতা লিখছেন না। আকস্মিক শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার আগে থেকেই তিনি কাব্য রচনায় ক্ষান্তি দিয়েছেন। কখনো কখনো হয়তো কিছু লিখেছেন কিন্তু তাতে নিরাভরণ তথ্যেরই প্রকাশ ছিলো শুধু, অক্ষুণ্ণ কাব্যিক মাধুর্য ছিলো না। একদিন অপরিসীম উদ্দামতায় তিনি যে-জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, উদ্দামতার-তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সে জগৎও নেপথ্যে সরে গেল। স্থির প্রশান্ত আকাশে নতুন করে আর মেঘ জমলো না, ঝড়ও এলো না।

সে জগতের ইতিহাস আমাদের শুনতে ইচ্ছা হয়। অত্যন্ত পুরোনো না হলেও তাতে অতীত বস্তুর মাদকতা আছে। যখন তা জীবন্ত ছিলো, তখন তা ছিলো অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল এবং সেজন্যই

বোধহয় আজ অন্যান্য নতুন বস্তুর সম্মোহনে তা হয়েছে মলিন। ক্ষেত্র প্রস্তুত না করে অতর্কিতে যে-আলোড়ন এসে পড়ে তা কখনও দীর্ঘায়ু হয় না। আবার সে রকম অতর্কিতেই নতুন এক আলোড়ন আসে। পূর্বের উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে পড়ে, নতুনের আবির্ভাব হয় প্রাণবন্ত। নজরুলের কাব্য-প্রতিভার স্ফুরণ ও অন্তর্ধানের আড়ালে এই বেদনাদায়ক সত্য বর্তমান।

যে-জগত আমাদের কাছে আজ প্রত্যক্ষ, পরিচিতির সীমারেখায় আবদ্ধ বলে তাতে কোন মোহনীয়তা নেই। সেজন্য তো বটেই, তা ছাড়া স্বাভাবিক আকর্ষণের জন্যও আজ এই নজরুল-প্রসঙ্গের অবতারণা। নজরুলের কবি-জীবন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট ছিলো একদিন; বর্তমানের পটভূমিকায় তার পুনরাবির্ভাব না ঘটলেও সে ইতিহাসের পর্যালোচনা চলতে পারে।

একদিন স্থির প্রবহমাণ সময়কে তিনি আবর্ত-সঙ্কুল করেছিলেন। সে কাহিনী মিথ্যা হবার নয়।

চিরাচরিত কোমলতাকে তিনি আঘাত করেন নি। বেদনা ও করুণতাকে জীবন্ত করেছিলেন সংঘাত ও সঙ্কটের মধ্যে।

তাঁর আবির্ভাব একটি বিশেষ প্রবাহের কেন্দ্রে এক সময়ে একান্ত সত্য ছিলো। সে তথ্য আজও অপসৃত হয় নি।

বিবর্তমান জগতের কেন্দ্রে সত্যিকার প্রতিভাবানের আসন নিশ্চয়ই অক্ষয়, চিরদিনের জন্যই হোক বা ক্ষণিকের জন্যই হোক।

নজরুলের আবির্ভাব রবীন্দ্রযুগে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যখন অত্যন্ত প্রবল তিনি অতর্কিতে নতুন এক সুর নিয়ে এলেন বাংলার কাব্যে। তাঁর আবির্ভাব প্রতিবাদ হিসেবে নয়, স্বীকৃতি হিসেবেও নয়। কোনো বিচার-বিবেচনার মধ্যে তিনি ধরা পড়েন নি। সময়ের দাবী তিনি মেনেছিলেন। পরিবেশ যা দাবী করেছিলো, কাছের মানুষের যা ছিলো কাম্য—তিনি তাই এনে দিয়েছিলেন। বাংলার কাব্য-ইতিহাসের মধ্যে তিনি কিছু-দিনের জন্য মূল্যবান এক আবর্ত সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যুগে অন্য এক কবির আবির্ভাব ঘটেছিলো। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ। ব্যক্তুৎপ্রেক্ষণ থাকা সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ বস্তুধর্মী হতে চেয়েছিলেন এবং সেটাই ছিলো তাঁর বিশেষত্ব। নজরুল ছিলেন অত্যন্ত প্রবলভাবে আত্মমুখর। রবীন্দ্রনাথে ছিলো সর্বতোভাবে মানব-জীবনকে স্বীকার। সেজন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রাধান্য

সবার চাইতে বেশী। তাঁরই যুগরসে পরিবর্ধিত হয়ে কোনও বিশিষ্টতা কেউ অর্জন করলেও তা অক্ষয় হতে পারে নি। সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিশিষ্টতা আছে, শ্রেষ্ঠত্ব আছে, কিন্তু যেহেতু বিরাট মহীরুহের পত্রচ্ছায়ার আড়ালে লালিত হয়েছিলো তাঁদের জীবন, তাই তাঁদের স্বকীয়ত্ব স্পষ্টভাবে লোকের কাছে ধরা পড়ে নি। যে-কারণে নজরুল সকলের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন, তা হলো সাময়িক আদর্শ-বিলাস। বাংলা সাহিত্যে তারও একটা আশ্রয় আছে। এ আদর্শ-বিলাস হল প্রথমত, নিপীড়িতদের প্রতি মমতত্ববোধ, দ্বিতীয়ত, দেশের স্বাধীনতার জন্য একটি উদগ্র আবেগ।

দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য তিনি সর্বদাই করুণা প্রকাশ করেছেন। দুর্বলদের প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁর অসীম। কিন্তু তা অশ্রুতে রূপায়িত হয় নি—হয়েছে সংঘাতে আবর্তিত। নিপীড়িতদের তিনি বলেছেন বিদ্রোহ করতে, নিশ্চিন্তে বেদনাকে মেনে নিতে নয়। এ-সমস্ত কবিতায় দেখা যাচ্ছে একটি স্পষ্ট স্পৃহার প্রকাশ। যে-তথ্য অথবা দাবী অথবা যে-আকাজ্ক্ষা মনে দোলা দিচ্ছে দ্বিধাহীনভাবে তিনি তা জানিয়েছেন। কাব্যিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রইল কিনা সে চিন্তাও তিনি করেন নি। সুসঙ্গত শব্দ চয়নের দিকে তাঁর মন ছিলো না। তিনি স্পষ্ট সত্যকে, অথবা বলা যেতে পারে, মনের স্পষ্ট দাবীকে দ্বিধাহীন ভাবে প্রকাশ করেছেন। নজরুলের ত্রুটি অথবা বিশিষ্টতা এখানেই। তাঁর মমত্ববোধ অধিকাংশ সময়ই উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন ছিলো বলে তাতে কোনো মৌলিকতা আপাতদৃষ্টিতে ধরা পডে না। উচ্ছ্বাস তিরোহিত হয় যুক্তি এলেই, আবার মনের দাবীকে যুক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করা চলে না। মন বলছে এটা ভালো নয়, সুতরাং এটা নিশ্চয়ই ভালো নয়। শুধুমাত্র সূক্ষ্ম অনুভূতির উপর নির্ভরশীল যিনি তাঁর পক্ষে নিত্য মনের দাবীকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। নজরুল ছিলেন এ-রকমই একজন। তাঁর 'বারাঙ্গনা', 'নারী', 'কুলী' ইত্যাদি কবিতায় তাঁর আবেগ-প্রবণ মনের প্রকাশ লক্ষযোগ্য। সাহিত্য-সমালোচক অনেকের বিচারে এ-সমস্ত কবিতায় তথ্যের অপব্যবহার হয়েছে। এ উক্তি অবশ্য অনেকটা সত্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, লাঞ্ছিতদের প্রতি করুণাদ্রব মনের পক্ষে এ ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। বারাঙ্গনাদের প্রতি করুণাপ্রবণ হয়ে তিনি লিখেছেন,—

"কে বলে তোমারে বারাঙ্গনা মা,
কে দেয় থুথু ও গায়ে ?
হয়তো তোমারে স্তন্য দিয়েছে
সীতা সম সতী মায়ে।
অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা,
মেরী হতে পারে দেবী
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা
বিমলা সত্যসেবী ?"

বারাঙ্গনাদের প্রতি এ প্রশস্তি আমাদের ভালো লাগবে না, কিন্তু আগেই বলেছি যে, আবেগপ্রবণ মন শুধু মনের দাবীকেই জানাতে পারে, বস্তুর সত্যাসত্য অথবা মনের অবস্থা নিয়ে তর্ক তোলে না। 'কুলী' কবিতায়,

'সেদিন দেখিনু রেলে,
কুলী বলে এক বাবুসাব তারে
ফেলে দিলে দূরে ঠেলে"

এগুলোও রস-সিক্ত চরণ নয়। কাব্য হিসেবে উত্তীর্ণ হয় নি কিন্তু মনের দ্বিধাহীন আকুতির যদি মূল্য থাকে, তবে এগুলোরও মূল্য আছে।

রবীন্দ্র-যুগে, অনিচ্ছায় হলেও, রবীন্দ্রনাথের ছায়াচ্ছন্ন হয়েই নজরুল পরিবর্ধিত হয়েছিলেন। নজরুলের সত্যিকার বিশিষ্টতা খুঁজতে হবে তাই অন্য ক্ষেত্রে।

বাংলার সাহিত্যসাধনায় মুসলমানদের দান স্বল্প নয়। তাঁদের সাধনা এক বিশিষ্ট পর্যায় সৃষ্টি করেছে। সে পর্যায়ে নজরুলের দানও যথেষ্ট, স্থানও অনেক উচ্চে।

মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকগণ গতানুগতিক পথ বেছে নেন নি, আর নিয়ে থাকলেও তাতে স্বাতন্ত্র্য ছিলো কিছুটা।

প্রাচীন কালের সাহিত্য-সাধকদের কথা বলবো না, আমরা এখানে আধুনিক কালের কথাই বলছি।

আধুনিক কালে মুসলমানদের প্রথম কবি কায়কোবাদ। ঐতিহাসিক

চেতনার উন্মেষ হয় তাঁর মধ্যেই প্রথম। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক চেতনা অত্যন্ত স্থূল, তাতে রসানুভূতির প্রশ্রয় নেই। তিনি ইস্‌লামের অতীত কাহিনী স্মরণ করেছেন মাত্র। কায়কোবাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই এলেন। মোজাম্মেল হক, মীর মোশাররফ হোসেন এবং আরো অনেকে। ইস্‌লামের অতীত কাহিনী এঁদের কাব্যের উপাদান জুগিয়েছে মাত্র। মোজাম্মেল হক ছিলেন উচ্ছ্বাসপ্রবণ। মুসলমানদের দুঃখ-দৈন্যের কথা তাঁকে পীড়া দিয়েছে। বেদনার্ত কণ্ঠে তিনি সেই শোকগাথা গেয়েছেন। কাব্যগত সম্বল ছিলো তাঁর কম, ভাবের আতিশয্য ছিলো বেশী।

মোশাররফ হোসেন-সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা চলে।

এঁদের পরেই যাঁরা এলেন, নতুন ইংরেজী শিক্ষার আলোক তাঁদের মধ্যে ছিলো। তাই অতীতের দাবী মিটিয়েও নতুনকে তাঁরা মেনে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁদের কাব্যে ছিলো নিছক একটি স্পৃহার সুর। তাঁদের অনুভূতির উদ্ভব হয়েছিলো স্পষ্ট চেতনলোক থেকে। এঁদের প্রভাব বেশী দিন টিকে থাকে নি।

সব শেষে এলেন নজরুল ইসলাম। তিনি অতীতকে প্রত্যক্ষ করলেন নতুন আলোকে। স্তব্ধ মৃত যে-অতীত তার চিত্র তিনি আঁকেন নি, তিনি এঁকেছেন অতীতের প্রাণবন্ত মুহূর্তগুলোকে। পরিবেশের সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে সে অতীত জীবন্ত হয়েছে। অতীতের এ নব রূপায়ণ বিভিন্ন ধারায় নজরুলের কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে।

কোথাও আছে স্বপ্নময় ভাবালুতা, কোথাও আছে স্মরণ, কোথায় আছে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে বিচার। সমস্ত কিছু নিয়ে তিনি উজ্জ্বল এক জগতের পরিকল্পনা করেছেন। আধুনিক ইংরেজ কবিদের অনেকের মধ্যে অতীতকে জাগ্রত করবার স্পৃহা দেখতে পাই—কিন্তু অনেক সময় সে স্পৃহা বর্তমান মুহূর্তের বেদনার বিকল্প মাত্র। নজরুলের মধ্যে কোনো রিয়াক্‌শনের প্রাবল্য ততটা নেই, যতটা আছে সহজভাবে সমস্ত কিছু স্বীকার।

কোনো এক সাহিত্যিক বলেছেন যে, নজরুলের মধ্যে রোমান্টিসিজম ও রিফরমেশন ওতপ্রোতভাবে বর্তমান ছিলো। কথাটা অনেকটা সত্য। প্রাচীনের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে রোমান্টিসিজ্‌ম-এর রেশ বর্তমান, আবার

বস্তুকে নতুন করে গড়ে তোলবার মধ্যে রিফরমেশনের প্রকাশ আছে। এ দ্বৈত সুরে নজরুলের কাব্য কখনও গতিহারা হয় নি।

নজরুলই আমাদের প্রথম জাতীয় কবি। এসব ছাড়াও নজরুলের একান্ত কতকগুলো বিশিষ্টতা আছে।

তিনি সুর-শিল্পী। সঙ্গীত সৃষ্টি তাঁর স্বভাবজ। শব্দ সাজিয়ে তিনি তাতে সুর দেন নি; সুর এসেছে প্রথমে, শব্দ এসেছে তার পরিপোষক হয়ে।

ইলিয়ট যাকে বলেছেন **rhythmic animation,** নজরুলের মধ্যে তা ছিলো যথেষ্ট। গতানুগতিক ছন্দ-রচনায় তিনি হাত দেন নি, বারবার আঙ্গিকের পরিবর্তন ও নতুন আঙ্গিকের সৃজনের দিকে তিনি মনোনিবেশ করেছেন। 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' কবিতার 'আবির্ভাব' অংশ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

অত্যন্ত চঞ্চল ছিলো তাঁর চিত্ত, তাই তিনি কোনো দীর্ঘ কবিতায় ভাবগত সম্পূর্ণতা অথবা পারম্পর্য বজায় রাখতে পারেন নি। চরণের সৌকর্য অথবা স্তবকের মাধুর্যই ছিলো তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

চঞ্চল হয়েও তিনি তন্ময় ও দীপ্ত ভাবুক।

২

বিদ্রোহী

টি. এস. ইলিয়ট কবিতার তুলনা করেছেন ভগ্ন পাষাণ-ফলকের উপর নির্নিমেষ সূর্যরশ্মির সঙ্গে। প্রত্যহের সম্পদ যেখানে যুগাতীত এক অপ্রত্যক্ষ ইঙ্গিতে দীপ্ত হয়, যেখানে তার মুহূর্তের মূল্য স্বপ্নের দিগন্তে ভাস্বর হয়ে ওঠে, যেখানে বিগত, অধুনা ও আগামী কালের ঐশ্বর্য একই সঙ্গে সঞ্চিত হয়েছে—সেখানেই স্রষ্টার নয়ন উন্মীলিত হয়। **"I am today and heretofore; but something is in me that is of the morrow, and the day following, and the hereafter"**—ঠিক এ কারণেই **Waste Land**-এর নায়ক টিরেসিয়াসের কাছে অতীত অত্যন্ত পরিচিত, বর্তমান প্রত্যক্ষ এবং ভবিষ্যৎ দ্বিধাহীন সৌকর্যে স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, কথা শেষ হলেও, বলা শেষ হয় না, সত্যিকার কবিতা হচ্ছে তাই। সাধারণ পরিচিত পরিবেশের মধ্যে এক স্মরণীয় ইতিহাস সৃজন করতে হবে, যে-ইতিহাসে বস্তু ও প্রকৃতি মুখর হবে না, কিন্তু নিত্যকালের সংবাদ বস্তু-আশ্রিত হয়েও জীবন্ত থাকবে। কীট্স্ যখন বলেন—

> **"Bright star, would I were steadfast as thou art—**
> **Not in lone splendour hung aloft the night,**
> **And watching with eternal lids apart,**
> **Like nature's patient, sleepless Eremite."**

তখন সেখানে ব্যক্তির আকুতি নিত্যকালের মানবমনের সম্পদ হয়ে প্রকাশ পায়। তমসাবৃতা রজনীর নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের লক্ষ্য কবির মনে যে সম্ভাবনা জাগিয়েছে, তার স্বরূপে মুহূর্তের সত্যই শুধু উজ্জ্বল নয়, সেখানে চিরকালের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির সত্য ধরা পড়েছে। নিরবধি কালের স্বাক্ষর এখানে আমরা পাই, তাই ক্ষণকালের জীবন এখানে নেই, অনাবৃত নয়নের দৃষ্টিতে অনেকদিনের ইতিহাস স্বচ্ছ হয়েছে। অথবা—

"সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা সনাতনী!
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী।
স্বপনের মণিহারে হেরি তাঁর সীমন্ত-রচনা।
নিপুণা নটিনী নাচে, অঙ্গে অঙ্গে অপূর্ব লাবণি।
স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ? কে করে শোচনা!
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত-লোচনা।"

। মোহিতলাল।

উভয় কবিতার ভাবোন্মাদনার উৎস একই। চিরন্তনী প্রহেলিকা নারীকে কেন্দ্র করেই এখানে বিচিত্র কল্পনার উন্মেষ ঘটেছে। চিরকাল বেঁচে থাকার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুতে বিলয়ের প্রশ্ন উঠেছে কিন্তু তবুও কবি প্রিয়ার সুকুমার পয়োধরকে উপাধান বিবেচনা করে বিশ্রাম খুঁজেছেন। অনন্ত দুঃখের মধ্যেও আনন্দের অন্বেষণ ক্ষান্ত হয় নি। অথবা—

"যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশিকান্ত, সহসা ফুটিল
নব কুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে।
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে;
বিনাইনু যত্নে বেণী; তুলি ফুলরাজি,
(বনরত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে;
চির পরিধান মম বাকল, ঘৃণিনু
তাহায়! চাহিনু কাঁদি বন-দেবী পদে,
দুকুল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতা হার, কাঞ্চী কটিদেশে!
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে।
হায় রে অবোধ আমি! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু, পাইলে মধুরে,

সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী।
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি।"

। মধুসূদন ।

য-কামনা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গুঞ্জরিত হয়েছে, ব্যক্তির মধ্যেই তার নির্বাণ ঘটে নি ; তাই এককালের একজনের প্রতি নিবেদিত প্রেম সর্বকালের নারীর ব্যাকুলিত চিত্তের সম্পদ হয়েছে। পরিবেশকে ভুলে, সম্ভ্রমকে ভুলে, বিবেচনাকে অস্বীকার করে যে-মুহূর্তে মানুষ কামনার বিষবাষ্পে সর্ব-অঙ্গ জর্জরিত করে সন্ধ্যার কুহেলিকার মতো রক্তিম দিগন্তকে আচ্ছন্ন করে দেয়, এ সেই মুহূর্তের কবিতা। এ সেই মুহূর্তের সর্বনাশের কথা, যখন—

"কায়ায় কায়ায় মায়া বুলে হেথা ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ,
কমলদিঘীতে সাতশ' হয়েছে এক আকাশের চাঁদ।
শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ-ফাঁসী,
ঘাটে ঘাটে হেথা ঘট-ভরা হাসি, মাঠে মাঠে কাঁদে বাঁশী!
দু'দিনে আতশী ফেরেশ্‌তা-প্রাণ ভিজিল মাটির রসে,
শফরী চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে!
অধর আনার-রসে ডুবে গেল দোজখের নার-ভীতি
মাটির সোরাহী মস্তনা হল আঙ্গুরী-খুনে-তিতি—"

। নজরুল ইসলাম।

যদিও এখানে সৌন্দর্য সর্বত্র উচ্ছ্বসিত হয় নি, তবুও লাস্য-লীলার মোহমুগ্ধ প্রহরের একটি পরিপূর্ণ আভাস আমরা এখানে পাই, যা পরিচিত দিগন্ত অতিক্রম করে অনন্তকালের স্বপ্নের কাহিনীতে জেগে উঠেছে।

এই অক্ষয় কাব্যরস নজরুল ইসলামের রচনায় কতটা রয়েছে তা ভেবে দেখবার মতো।

যে-কারণে নজরুল ইসলাম সর্বপ্রথম খ্যাতি লাভ করেন তা হল যুগের সাময়িক প্রবাহের প্রতি উৎকণ্ঠা। বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে যে-আলোড়নের সূচনা হয়েছিলো, নজরুল ইসলাম সেই চঞ্চলতার উৎস-সলিলে অবগাহন করেছিলেন। স্নিগ্ধ মনোরম যে শান্ত স্রোতোধারা বাংলার মাটিকে চিরকাল সঞ্জীবিত করেছে, সেই স্রোতোধারার প্রবাহ-পথে তিনি উপলখণ্ডের বাঁধ রচনা করেন। এভাবে হঠাৎ প্রতিহত হওয়ায় সাময়িক-

ভাবে এই পানির নহর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। "বিদ্রোহী" সেই উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি। নজরুলের খ্যাতি এই কবিতার জন্যই। সাধারণ্যে তিনি পরিচিত হলেন এই আক্ষেপ ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যাবেন বলে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁকে স্পর্শ করে নি। ধ্বংসের সরঞ্জাম তিনি দেখেছিলেন কিন্তু সর্বনাশ ও বিলয়ের গতিবেগ ও স্ফুরণ কখনো তাঁর দৃষ্টিপথে আসে নি। তাই পরিচিত পৃথিবীতে যার রূপ দেখা দিল না, কল্পনার অস্বাভাবিক সৌন্দর্য হয়ে মানুষের গৃহীত চিন্তাধারায় তা শৃঙ্খলার ন্যূনতা ঘটালো। "বিদ্রোহী" সংযত শোভার মধ্যে এক অনাসৃষ্টি—লক্ষ্যভ্রষ্ট যৌবনের গতিচঞ্চলতা। নজরুলের পরিচয় তাই খুঁজতে হবে অন্য ক্ষেত্রে।

প্রথম জীবনের কাব্য নজরুলকে পরিচিত করেছে কিন্তু স্থৈর্য দেয় নি। তার গতিপথে বৈশাখের উচ্ছৃঙ্খলতা নেমেছে কিন্তু পরিশেষে কোনো স্বীকারোক্তি রেখে যায় নি। যে-বিদ্রোহ শুধু আবেগ, সে কোনো ইতিহাস সৃজন করে না—আবর্ত রচনা করে মাত্র। নিট্‌শে বলেছেন : **One must still have chaos in one to give birth to a dancing star,** কিন্তু যদি নবসৃষ্টির আবেদন কারো মধ্যে না থাকে তবে শুধু **chaos**—বিশৃঙ্খলায় সর্বনাশই আসে—জীবনের অর্থ থাকে না, জীবন হয় নিশ্চিন্ত প্রহেলিকা। এ আবেদন যেখানে জীবনকে ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে সেখানেই বলা সম্ভব—**"Lo, I am a herald of the lightning, and a heavy drop out of the cloud." (Nietzsche)**। "বিদ্রোহী" কবিতার শেষে যে-ইচ্ছার কথা কবি প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ উৎপীড়িতের বেদনাভারাক্রান্ত মনে যে-অভয় তিনি আনবেন, সম্পূর্ণ কবিতার শেষে তা অকস্মাৎ সংযোজিত হয়েছে।

'অগ্নি-বীণা'র সব ক'টি কবিতাই বিষয়ের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে নিঃসঙ্কোচ ও স্পষ্ট। আবেগের তীব্রতায় শব্দ উচ্চারণে যে-দ্রুততা জাগে, একটি অনন্যনির্ভরতায় ভাষা যেন সে দ্রুততা নিয়ে নিম্নগামী নদীর মতো এখানে প্রবাহিত। যৌবনের উন্মাদনার কোনও যুক্তি নেই, কোনও বিবেচনা নেই এবং পরিশেষে কোনও সহনশীলতা নেই। এ উন্মাদনা যদি নিশ্চিন্তে মুক্তি পায়, তা হলে সে হয় খরস্রোতা। যৌবনের উন্মাদনা এভাবেই খরপ্রবাহের নিশ্চিন্ততায় আপনাকে নিঃশেষ করে। এ উন্মাদনার নিজস্ব

একটা প্রকৃতি আছে, নিজস্ব সত্তা আছে, যে-সত্তা বা প্রকৃতি হচ্ছে নির্বিরোধ চাঞ্চল্য এবং একটি অসম্ভব উচ্ছ্বাসের নিশ্চিন্ততা। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার আরম্ভেই এই নিশ্চিন্ততার ইঙ্গিত আছে—

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!"

নজরুল ইসলাম উদ্ভিন্ন যৌবনের কবি। অন্য কোনও পরিণতির জন্য একটি প্রস্তুতিগত পদক্ষেপ নয়, এ-যৌবন হচ্ছে একটি অকস্মাৎ চঞ্চলতার লীলাভূমি। 'চাঞ্চল্য' ও 'বিদ্রোহ' শব্দ দু'টি সমার্থক নয়। যেখানে চাঞ্চল্য একটি নির্বিশেষ তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বাস, সেখানে বিদ্রোহ একটি বিশেষ চৈতন্য; যেখানে চাঞ্চল্য অতিক্রান্ত কৈশোরের একটি স্বাভাবিক উন্মাদনা, সেখানে বিদ্রোহ একটি বিশ্বাস ও উপলব্ধি। নজরুল ইসলাম চাঞ্চল্যের কবি। বাংলা কাব্যের একমাত্র বিদ্রোহী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'বিদ্রোহী' কবিতার নিম্নের স্তবকটি বিবেচনা করলেই আমরা নজরুল ইসলামের চঞ্চল এবং উচ্ছল মানসিকতার পরিচয় পাব—

"আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা!
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কালফণী!
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।"

উপরের চরণ ক'টির ছন্দের দ্রুত লয়, এবং শব্দের অনুপ্রাস ও স্বর-ঝঙ্কার যে-কোনও পাঠকের চিত্তে উদ্দাম আবেগ এবং আনন্দের হিল্লোল আনবে। একটি বয়সের বিচিত্র উদ্‌ভ্রান্ত ইচ্ছার অপরিমিত কল্লোল এখানকার শব্দ-বিন্যাসের মধ্যে ধরা পড়েছে। নজরুল ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের অধিকাংশ কবিতাই আবেগের কলগুঞ্জনে উচ্চকিত। গভীর আবেদন না

থাকলেও শব্দ-বিন্যাসের জন্য এবং ছন্দে স্বরাঘাতের প্রাধান্যের জন্য এ-কবিতাগুলো মোহনীয় আবর্ত সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি—

"আজ আসল উষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আসল নিকট আসল সুদূর,
আসল বাঁধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগলা গাজন উচ্ছ্বাসে!
ঐ আসল্ আশিন শিউলি শিথিল
হাসল শিশির দুব্ঘাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।
আজ জাগল সাগর, হাসল মরু,
কাঁপল ভূধর, কানন তরু,
বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছলে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজত জরায় মরা বাম পাশে!"

এ-কবিতাগুলোর একটি বিশিষ্টতা এই যে, বাংলা ভাষায় এখানেই সর্বপ্রথম একটি আবেগ এবং বিক্ষোভ নিজস্ব বাণী-ভঙ্গী আবিষ্কার করেছিলো। বিক্ষোভের একটি বহিরঙ্গ আছে যাকে তার প্রকাশরূপ বলা যায়, যে-রূপ শব্দ উচ্চারণের মধ্যেই ধরা পড়ে। যৌবনের বিভিন্ন ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা-প্রকাশের ভঙ্গির মধ্যে জড়িয়ে থাকে, তেমনি কবিতার উচ্ছ্বাসও শব্দের বিন্যাস ও ধ্বনি-ব্যঞ্জনা নিয়ে বেঁচে থাকে। কোনও প্রকার দার্শনিক বিবেচনা সেখানে সমাজ-জীবনের বঞ্চনা থেকে প্রতিক্রিয়ারূপে জাগরিত নয়; যৌবনের ইচ্ছা আপন অহমিকা নিয়ে স্বতউৎসারিত। 'বিদ্রোহী' কবিতার বিভিন্ন পঙ্ক্তিতে তার পরিচয় আছে। কয়েকটি উদাহরণ এখানে উপস্থিত করছি—

ক. আমি সন্ন্যাসী, সুর সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক!
আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।

আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড।
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দহন করিব বিশ্ব।

খ. আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য;
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর—
চির উন্নত মম শির।

গ. আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত্য করতলে,
তাজি বোর্‌রাক, আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে!
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার কলরোল-কল-কোলাহল।

উদ্ধৃতিগুলোতে অনেক ইচ্ছার প্রকাশ আছে, অনেক পরস্পর-বিরোধী বিপরীত-ধর্মী ইচ্ছা বিশৃঙ্খল মেঘপুঞ্জের মতো একত্রিত হয়েছে। তিনি কি হতে চান বারবার সে কথাই বলেছেন কিন্তু এ-সমস্ত ইচ্ছার নতুন রূপায়ণ নেই। 'বেদুঈন', 'চেঙ্গিস', 'ইস্রাফিল', 'দুর্বাসা' ইত্যাদি শব্দগুলি নতুন

কোনও অর্থব্যঞ্জনা আনে নি, এদের প্রতিদিনের পরিচয় এখানে ব্যক্ত। তিনি 'বেদুঈন' হতে চান, তিনি 'চেঙ্গিস' হবেন, 'দুর্বাসা' হবেন ইত্যাদি কথায় পাঠকের জন্য নতুন কোনো সত্য নির্মাণ করা হয় নি। কবি বেদুঈনের বিশেষ কোনো পরিচয় অথবা চেঙ্গিস খানের চরিত্রের কোনোও একটি দিক অথবা দুর্বাসার কোনোও বিশেষ মুহূর্তের উত্তেজনা উদ্‌ঘাটিত করেন নি। বেদুঈনের যে-সাধারণ পরিচয় পাঠকের জানা আছে, চেঙ্গিস খানের যে-পরিচয় ইতিহাসে বিবৃত এবং 'দুর্বাসার' যে-কাহিনী পুরাণে বর্ণিত তার অতিরিক্ত কোনো পরিচয় কবি দেন নি, এমনকি পাঠকের মনে কোনো বিশেষ পরিচয়ের প্রত্যাশাও জাগান নি।

তেমনি অন্যত্র—

"যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন—
মানে নি কখনো, আজো মানিবে না বৃদ্ধত্বের এই শাসন।
আমরা সৃজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান,
সম্ভ্রমে নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি মোদের দান।
যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বের দিয়াছি কবর মোরা তরুণ—
ওরা দিক গালি, মোরা হাসি খালি বলিব "ইন্না······রাজেউন।"

এখানে তথ্যের ছন্দোগত রূপায়ণ রয়েছে কিন্তু কাব্য নেই। ভাষণ সমৃদ্ধ নয়, আবেগ দ্বিধাহীন নয় শুধু একটা বক্তব্য দুর্বল শব্দ-বিন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। আকাশে মেঘের আস্তরণ গতিহীন, অবিন্যস্ত, কিন্তু তার প্রকাশে ঘনায়মান অন্ধকারের সহজ বৈচিত্র্য আছে। এই সহজতার জন্যই তা সুন্দর। নজরুল ইসলামের উপরের উদ্ধৃতিতে সেই সহজতা নেই। একটি আবেগ একান্তভাবে দীন শব্দব্যূহের আবরণে গতিহারা হয়েছে। যৌবনের আবেগ কোনো পরিসরকে স্বীকার করে না, তার ধর্মই হল বন্ধনমুক্ত জীবনের অভিলাষ। পাষাণ বিদীর্ণ করে যেমন অশ্বত্থতরু আকাশের দিকে তার শীর্ষ তুলে দেয়, যৌবনের আবেগও তেমনি সীমাবদ্ধ জীবনের আবেষ্টনী ভেঙে দুনিয়ার সর্বক্ষেত্রে আপনাকে বিকশিত করতে চায়। যে-ভাষায় এ আবেগ কবি প্রকাশ করবেন তারও একটা বিশিষ্ট রূপ থাকবে। তার ছন্দের তরঙ্গেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। শব্দবিন্যাস, শব্দচয়ন ও ছন্দ-তরঙ্গের

এই গোপন ইতিহাস নজরুল ইসলামের জানা থাকা-সত্ত্বেও সর্বত্র তিনি তা প্রয়োগ করতে পারেন নি। যদি পারতেন তবে তিনি লিখতেন না—

"তোদের শুভ্র গায়ে হানে ওরা আপন দেহের গলিত পাঁক,
যার যা দেবার সে দেয় তাহাই, স্বর্গের শিশু সহিয়া থাক।
শাখা ভরে আনে ফুল-ফল, সেথা নীড় রচি' গাহে পাখীরা গান
নীচের মানুষ তাই ছুঁড়ে ঢিল, তরুর নহে সে অসম্মান।
কুসুমের শাখা ভাঙে বাঁদরের উৎপাতে, হায়, দেখিয়া তাই—
বাঁদর খুশীতে করে লাফালাফি, মানুষ আমরা লজ্জা পাই!"

শুধুমাত্র দুর্বল শব্দ-সমষ্টি সংযোজনায় এই কবিতা বিপুল আবেগ প্রকাশের অন্তরায় হয়ে পড়েছে। কবি পর্বভূমক গীতিছন্দের ছয় মাত্রার দোলা এখানে আনতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রতি চরণের শেষের ছন্দোতিরিক্ত বা **hypermetric** পদের মাত্রা পাঁচ হওয়ায় প্রত্যেক সম্পূর্ণ চরণের প্রতি পর্বের দোলা আরও দ্রুত লয়ের হয়েছে। লঘু ভাব প্রকাশের জন্য ছন্দের এই দ্রুত লয় অনেক সাহায্য করে, কিন্তু বিপুল-প্রসারী কল্পনা এখানে আশ্রয় পেতে পারে না। এই ছন্দোতিরিক্ত পদ যেখানে দু'মাত্রার হয়েছে সেখানে ছন্দের লয় হয়েছে দীর্ঘ ও ভাবের ব্যঞ্জনা হয়েছে গভীর। নজরুলের রচনাতেই তার নজির রয়েছে—

"সাগর-গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে'
জীবনোদ্বেগে, তাড়া করে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মানিক আহরি আনে যারা খুঁড়ি পাতাল যক্ষপুরী;
নাগিনীর বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা হতে মণি চুরি।"

এখানে দীর্ঘলয়ের জন্য গীতিচ্ছন্দেও পয়ারের গম্ভীর চরণক্ষেপণের আভাস পাই। ছন্দের এই সৌষ্ঠবের জন্য ভাবের প্রগাঢ় সৌকুমার্য এখানে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু বক্তব্যের আবেদনের প্রকারভেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর পরিবর্তন-যে অবশ্যম্ভাবী, স্বাভাবিকভাবে এ সত্য নজরুল ইসলামের কাছে ধরা দেয় নি। নভোচারী মুক্ত বিহঙ্গমের মতো নিঃশঙ্ক গতিবেগ "বিদ্রোহী"র অনেক চরণ ও স্তবকের গঠন-নৈপুণ্যের মধ্যে ধরা পড়ে, কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতায় একটি সংহত ও সুস্পষ্ট ভাবগাম্ভীর্যের প্রকাশ ঘটে নি। যে-জীবন-চেতনা ও ভাবাদর্শ থেকে সত্যিকার কাব্যের উন্মেষ, তার অভাব এখানে

অত্যন্ত স্পষ্ট, তাই মৃত্তিকায় কিশলয়ের উদ্‌গম হয়েছে কিন্তু বৃহৎ অরণ্যানীর আভাস জাগে নি। এর চেয়ে বরঞ্চ বিদ্রোহের আদর্শ-সূচক সার্থক কাব্যপঙ্‌ক্তি "পূজারিণী"তে রয়েছে—

"জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা জ্বলন্ত পাবক।
আন্ তোর বহ্নি-রথ, বাজা তোর সর্বনাশা তুরী!
হান্ তোর পরশু-ত্রিশূল! ধ্বংস কর্ এই মিথ্যাপুরী!
রক্ত-সুধা বিষ আন্ মরণের ধর টিপে টুটি!
এ মিথ্যা জগৎ তোর অভিশপ্ত জগদ্দল চাপে হোক কুটি কুটি!"

এখানে প্রণয়ের স্বস্তির অবস্থা থেকে বিরহ-মুহূর্তের মানসিক অস্থিরতায় উপনীত হবার কাহিনীর স্বাক্ষর রয়েছে। অতিরিক্ত বেদনার বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করলে এখানে আমরা একটি আন্তরিক অনুভূতির পরিচয় পাই। আন্তরিকতার জন্যই এ কয়টি চরণ কাব্য হিসেবে গ্রহণীয় হয়েছে। বিহারী-লালও "সারদামঙ্গলে" অনেক আকাঙ্ক্ষার শেষে অপ্রাপ্তির বেদনা থেকে উদ্ভূত মানসিক বিশৃঙ্খলার কথা বলেছেন—

"আমার এ বজ্র-বুক,
ত্রিশূলেরো তীক্ষ্ণ মুখ,
দাও, দাও বসাইয়ে, এড়াই যন্ত্রণা।
সম্মুখে আরক্তমুখী,
মরণে পরমসুখী,
এ নহে প্রলয়-ধ্বনি, বাঁশরী-বাজনা।"

সমুদ্রের অশান্ত জলকল্লোল তটভূমিকে দুর্দমনীয় আবেগে অনুক্ষণ লাঞ্ছিত করে যাচ্ছে, তাতে একটা সত্য ও সৌন্দর্য আছে। সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত আবেগ তার স্বাভাবিক ধর্মেরই অনুষঙ্গী। "বিদ্রোহী"তে তেমনি যৌবনের আবেগ রূপ পেয়েছে। ঘন মেঘের স্তর-ভেদী বিদ্যুৎচমকের মতো সুন্দর কাব্য-পঙ্‌ক্তি আমাদের মুগ্ধ করে, যেমন—

"আমি কভু প্রশান্ত, কভু অশান্ত, দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী!
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল।"

অথবা—

"আমি উত্তর-বায়ু মলয়-অনিল উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র-রবি
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি !"

অথবা—

"আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য।"

এ-কয়টি উদ্ধৃতিতে শব্দ-বিন্যাসের অপূর্ব চাতুর্য আছে।

নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার ভাবাবেগ সঞ্চার করেছিলো মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' নামক স্বগতোক্তিমূলক একটি প্রবন্ধ। মোহিতলালের প্রবন্ধটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—

"আমি বিরাট। আমি ভূধরের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর, নভোনীলিমার ন্যায় সর্বব্যাপী। চন্দ্র আমারই মৌলিশোভা, ছায়াপথ আমার ললাটিকা, অরুণিমা আমার দিগন্ত-সীমন্তের সিন্দুরচ্ছটা, সূর্য আমার তৃতীয় নয়ন এবং সন্ধ্যারাগ আমার ললাট-চন্দন। ···

আমি সুন্দর। শিশুর মত আমার ওষ্ঠাধর, রমণীর মত আমার কটাক্ষ, পুরুষের মত আমার ললাট, বাল্মীকির মত আমার হৃদয়। সূর্যাস্ত-শেষ প্রায়ান্ধকারে আমি শশাঙ্কলেখা, আমি তিমিরাবগুণ্ঠিত ধরণীর নক্ষত্রস্বপ্ন। আমার কান্তি উত্তর-ঊষার ন্যায়।"

মোহিতলালের 'আমি' বিবেচনাহীন উচ্ছ্বাসের একটি দীর্ঘ তালিকা। বিভিন্ন অসম্ভবকে একত্রিত করে যে-শিশুসুলভ অবিবেচনার উদ্‌ঘাটন এখানে দেখি, তার মূলত কোনও সাহিত্যমূল্য নেই। কিন্তু ছন্দ এবং সুর-ঝঙ্কারের কারণেই নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী'র একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। নজরুল ইসলামের তালিকায় সমধর্মী এবং বিরুদ্ধধর্মী বিচিত্র নাম এবং কথা একটি বলিষ্ঠ উচ্ছ্বাসের সঞ্চয় হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। **Walt Whitman**-এর **Song of Myself**-এর কোথাও কোথাও এ-ধরনের তালিকা আছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

The pure contralto sings in the organ loft,
The carpenter dresses his plank, the tongue of his foreplane
whistles its wild ascending lisp,
The married and unmarried children ride home
to their Thanksgiving dinner,
The pilot seizes the king-pin, he heaves down
with a strong arm,
The mate stands braced in the whale-boat,
lance and harpoon are ready,
The duck-shooter walks by silent and
cautious stretches,
The deacons are ordain'd with cross'd hands
at the altar,
The spinning-girl retreats and advances to the hum
of the big wheel,
The farmer stops by the bars as he walks on a
First day loafe and looks at the oats
and rye....... .."

এ তালিকাটি নজরুলের মতো বিশ্লেষণ অথবা নামের তালিকা নয়, মানব-জীবনের বিভিন্ন চিত্রের তালিকা, যার মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন দৃশ্যের উদ্‌ঘাটন ঘটেছে। তা ছাড়া বিশেষ কৌশলে সাধারণ তালিকাতেও বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে আবেগ এবং প্রকৃতির দিক থেকে সম্পর্ক গড়বার চেষ্টা করেছেন কবি, যেমন—

"The bride unrumples her white dress, the minute-
hand of the clock moves slowly,
The opium-eater reclines with rigid head and
just-open'd lips,
The prostitute draggles her shawl, her bonnet
bobs on her tipsy and pimpled neck."

এখানে প্রথম চরণের সঙ্গে তৃতীয় চরণের সম্পর্ক ঘটেছে **unrumples** ও **draggles** এবং **white dress** ও **shawl** এ-শব্দগুলোর সমান্তরালতার কারণে ; এ ভাবেই **rigid head, tipsy, bobs, neck** শব্দগুলোর দ্বারা দ্বিতীয় চরণ তৃতীয় চরণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে। এভাবেই বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে ঐক্যতত্ত্ব আমরা আবিষ্কার করতে পারি। তা ছাড়া প্রতিটি চিত্রই এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যাতে চিত্রটিকে জীবনের স্মারক হিসেবে গ্রহণ করতে আমাদের অসুবিধে হয় না।

নজরুল ইসলাম তাঁর পত্রোপন্যাস "বাঁধন-হারাতে"তে একটি বিদ্রোহী চরিত্রের যে-বর্ণনা দিয়েছেন, "বিদ্রোহী" কবিতার আবেগের ক্ষেত্রে, তা আশ্চর্যরকম সত্য—

> "এখন ওর কাঁচা বয়েসে, গায়ের আর মনের দুই-এরই শক্তিও যথেষ্ট, তার শরীরে উদ্দাম যৌবনের রক্তহিল্লোল বা খুন-জোশী তীব্র উষ্ণ গতিতে ছুটাছুটি করছে, তার উপর আবার এই স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল বাঁধন-হারা সে,—অতএব এখন রক্তের তেজে আর গরমে সে কত আরো অসম্ভব সৃষ্টি-ছাড়া কথাই বলবে! এখন সে হয়ত অনেক কথাই বুঝেই বলে, আবার অনেক কথা না বুঝেই শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসেই বলে ফেলে।"

প্রেমের ব্যর্থতা থেকেই 'বাঁধন-হারা'র নায়কের চিত্ত-বিক্ষোভ, যে-বিক্ষোভ রূপান্তরিত হচ্ছে বিদ্রোহে। এ বিদ্রোহের অর্থ সামাজিক বিপ্লব নয়, রাজনৈতিক অসহায়তাজনিত ক্ষুব্ধতা নয় কিন্তু এক প্রকার বন্ধন-মুক্তির সাধনা। 'বাঁধন-হারা'য় সাহসিকার পত্রে এ বন্ধন-মুক্তির কথা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছ—

> "সৃষ্টির আদিম দিনে এরা সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, আর তারা ঘর বাঁধলো না; ঘর দেখলেই এরা বন্ধন-ভীতু চখা হরিণের মতন চম্‌কে ওঠে। এদের চপল চাওয়ায় সদাই তাই ধরা পড়বার বিজুলি-নীতি ভীতি নেচে বেড়াচ্ছে! এরা সদাই কান খাড়া ক'রে আছে, কোথায় কোনো গহনপারের বাঁশী যেন এরা শুনছে আর শুনছে। যখন সবাই শোনে মিলনের আনন্দ রাগ, এরা তখন শোনে বিদায় বাঁশীর করুণ গুঞ্জরণ! এরা ঘরে বারে বারে কাঁদন নিয়ে আসছে, আবার

বারে বারে বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘরের ব্যাকুল বাহু এদের বুকে ধরেও রাখতে পারে না। এরা এমনি করে চিরদিনই ঘর পেয়ে ঘরকে হারাবে আর যত পরকে ঘর ক'রে নেবে। এরা বিশ্ব-মাতার বড় স্নেহের দুলাল, তাঁর বিকেলের মাঠের বাউল-গায়ক চারণ-কবি যে এরা। এদের যাকে আমরা ব্যথা ব'লে ভাবি, হয়তো তা ভুল! এ ক্ষ্যাপার কোন্‌টা যে আনন্দ, কোন্‌টা যে ব্যথা তাই যে চেনা দায়! এরা সারা বিশ্বকে ভালবাসছে, কিন্তু হায়, তবু ভালবেসে আর তৃপ্ত হচ্ছে না! এদের ভালবাসার ক্ষুধা বেড়েই চলেছে, তাই এরা অতি সহজেই স্নেহের ডাকে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু স্নেহকে আজো বিশ্বাস করতে পারলো না এরা। তার কারণ এ বন্ধনভয়। এদের ভালবাসা এত বিপুল আর এত বিরাট যে, হয়তো তোমরা তাকে উন্মাদের লক্ষণ ব'লেই ভাবো।

......আর অগ্নির কথা? আগুন যদি না থাকবে, তবে এদের চলায় এমন দুর্বার গতি এলো কি ক'রে? এরাই পতঙ্গ, এরাই আগুন। এরাই আগুন জ্বালে, এরাই পুড়ে মরে। আগুন তো এদের খেলার জিনিস।"

Whitman-এর উল্লেখ নজরুল ইসলামের কিছু লেখায় এবং চিঠিপত্রে পাই। Whitman মানুষের কথা, বিশেষ করে, পরিশ্রমী মাটির মানুষের কথা বলেছেন। নজরুল ইসলাম বিবেচনা করেছেন যে, Keats স্বপ্নচারী এবং Whitman মাটির মানুষ। একটি পত্রে তিনি লিখেছেন যে, তিনি পাশ্চাত্য কবি Whitman-এর সুরে সুর মিলিয়ে বলতে চান—

> **"Behold, I do not give a little charity,**
> **When I give, I give myself."**

এই-যে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উপস্থিত করবার এবং এভাবেই দানপাত্রকে পরিপূর্ণ করবার যে-ইচ্ছা, নজরুল ইসলাম মনে করেছেন যে, এটা একটি স্বাভাবিক সত্যের প্রকাশ, অহমিকা নয়।

Whitman তাঁর Song of Myself-এর বিংশ অধ্যায়ে লিখেছেন—

> **"I exist as I am, that is enough,**
> **If no other in the world be aware I sit content,**
> **And if each and all be aware I sit content.**

One world is aware and by far the largest to me, and
that is myself,
And whether I come to my own to-day or in
ten thousand or ten million years,
I can cheerfully take it now, or with equal
cheerfulness I can wait.
My foothold is tenon'd and mortis'd in granite,
I laugh at what you call dissolution,
And I know the amplitude of time."

সময়ের অবাধ বিস্তৃতির কথা সম্পূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে অনুভব করেছেন বলেই পাশ্চাত্য কবির পক্ষে এ কথা বলা সম্ভবপর হয়েছে যে, তাঁর পদভারে কঠিন শিলাভূমি কম্পিত হচ্ছে। তিনি বলেছেন যে, যে-রূপে তিনি পরিচিত সেটাই তাঁর অস্তিত্ব অর্থাৎ তিনি আত্মগোপনহীন স্বপ্রকাশ। একটি বিশেষ শৃঙ্খলা এবং যুক্তি-বিচারে Whitman তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। নজরুল ইসলাম যৌবনের বিস্ময়কর অবিবেচনাকে 'বিদ্রোহী'র চরণে চরণে জুড়ে দিয়েছেন। Whitman-এর "I am satisfied—I see, dance, laugh, sing" নজরুলের কবিতায় রূপ নিয়েছে—

"আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ
আমি আপনার তালে নেচে যাই,
আমি মুক্ত জীবনানন্দ।"

বিদেশী কবির চরণটি শব্দের এবং বিরতি-চিহ্নের বিন্যাসে একটি উপলব্ধির উপস্থিতিরূপে জাগ্রত। কবি-যে চারিদিকে নির্ভাবনায় দৃষ্টিপাত করছেন, হাসছেন, গান গাইছেন, তার কারণ তিনি একজন পরিতৃপ্ত পুরুষ। নজরুল ইসলাম কিন্তু সে কথা বলছেন না। তিনি সকল নিয়ম ভেঙে নিশ্চিন্ত অবহেলায় অনেক কিছু হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মাত্র।

বিলয় ও নব-অভ্যুদয়ের সম্মিলিত বিকাশের কথা Whitman-এর শব্দ-সংযোজনায় যে ভাব-ব্যঞ্জনার রূপ নিয়েছে, নজরুল ইসলামের মধ্যে একই উক্তি একটি বিবৃতি রূপে প্রকাশ পেয়েছে। একজনের ভাষায়, "I pass death with the dying, and birth with the new-wash'd babe,"

অন্যজন সে-কথাই বলেছেন, "আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান।"

Whitman-এর ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ সার্থক হয়েছে। তিনি সেই পটভূমির সন্ধানী যেখানে মানুষের আদিম অনুভূতি স্বপ্ন রচনা করে; সেখানে সময়, পরিবেশ ও দ্বিধাহীন জিজ্ঞাসা একই সঙ্গে নতুন সম্ভাবনায় আবর্তিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ যে-ক্ষেত্রে পরিচিত ইতিবৃত্তের সমাপ্তি দেখে, তিনি সেখানে অক্ষয় মোহনীয়তা এনেছেন। "ছায়ালোকের অন্তরাল থেকে যে অপরিচিত ছবি জেগে উঠেছে সে বিনত হয়েছে আমার কাছে। দৃষ্টির শেষ-সীমায় আমি সৃষ্টির পূর্বাহ্ণের নিঃস্বতা দেখেছি। এই নিঃস্বতার মধ্যেও আমি একদিন বর্তমান ছিলাম।"

গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মানব-জীবন-সম্পর্কে অক্ষয় মমত্ববোধ ছিলো বলেই তিনি শুধু বিজয়ীর বন্দনা-গান রচনা করেন নি, বিজিতও তাঁর প্রীতির অংশ পেয়েছে। তাঁর ধারণায় পরাজয়েও অপমান নেই, কেননা "**battles are lost in the same spirit in which they are won,**" জয়ের পূর্ব-মুহূর্তের ইতিহাস পরাজয়ের পূর্ব-মুহূর্তের ইতিহাস থেকে স্বতন্ত্র নয়। সংগ্রামের পথে নতুন সৃষ্টি ও আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হওয়াটাই বড় কথা, তাই—

> **"Vivas to those who have fail'd !**
> **And to those whose war-vessels sank in the sea !**
> **And to those themselves who sank in the sea !**
> **And to all generals that lost engagements,**
> **and all overcome heroes !**
> **And the numberless unknown heroes equal to**
> **the greatest heroes known !"**

এ-আদর্শকে নজরুল ইসলাম গ্রহণ করেছেন 'সন্ধ্যা'র একটি কবিতায়। দুর্গম পথে, দুর্দমনীয় আবেগে যে-দুরন্ত পথিক অগ্রসর হলো কিন্তু জয়যুক্ত হয়ে ফিরে এলো না, তাকে কবি প্রশস্তি দিচ্ছেন—

> —"সেদিন নিশীথ বেলা
> দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা

প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি।"

Whitman-এর প্রভাব নজরুল ইসলামের উপর অত্যন্ত বেশী স্পষ্ট, দীপ্ত ও প্রত্যক্ষ। বিদ্রোহ, বিপ্লব ও যৌবনের আবেগ যেখানে তাঁর কাব্যের উপপাদ্য হয়েছে, সেখানেই তিনি Whitman-কে অনুসরণ করেছেন নিঃসঙ্কোচে।

নজরুল ইসলাম বিপ্লবাত্মক রচনার ক্ষেত্রে একই সুরকে সর্বব্যাপী অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। কখনো কখনো তাঁর স্বর কোমল স্তরে নেমে এসেছে। এ কারণে তাঁর বিপ্লবের আবেদন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে—সর্বনাশের মধ্যেও আত্মগত গীতিপ্রবণ মনের কান্নার সুর শুনতে পেয়েছি। প্রবল বাধাকে উন্মূলিত করে যে-পুরুষ নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হতে চাচ্ছে, তার চলার পথেও অতর্কিতে কোমল-নয়নার মণি-মঞ্জীর বেজে উঠেছে। তাই বার বার বিদ্রোহীর দুর্ধর্ষ সংকল্পের গতিবেগ শান্ত গীতোচ্ছ্বাসে প্রতিহত হয়েছে। যেখানে ছন্দ উদাত্ত-গভীর মূর্চ্ছনায় গম্ভীর ভাবকল্পনার উদ্‌গাতা হতে চেয়েছে, সেখানেই অলক্ষ্য থেকে বেদনার্ত আত্মার অভিযোগ শোনা গিয়েছে। সংশয়হীন চিত্ত-স্ফূর্তি জীবনের মমতাময় আহ্বানে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। ধ্বংসের লেলিহান শিখা প্রজ্বলন্ত থাকে নি, আশ্বিনের শান্ত হাওয়ায় তা নির্বাণ পেয়েছে। যদিও—

"শত সূর্যের জ্বালাময় রোষ
গমকে শিরায় গম গম।
ভয়ে রক্ত-পাগল প্রেত পিশাচেরও
শিরদাঁড়া করে চন চন!
যত ডাকিনী, যোগিনী, বিস্ময়াহতা,
নিশীথিনী ভয়ে থম্ থম্।"

তবুও কবি ভুলতে পারেন নি—

"আজ আকাশ ডোবানো নেহারি তাঁহারি চাওয়া
ঐ শেফালিকা তলে কে বালিকা চলে?
কেশের গন্ধ আনিছে আশিন হাওয়া।"

নজরুল ইসলাম প্রলয় ও বিনাশকে কামনা করেছেন প্রধানত তাদের বিপুল-প্রসারী বিশৃঙ্খলার জন্য। স্থির প্রাজ্ঞ বিশ্বাসকে আঘাত করে যে-সর্বনাশের লোলিহান শিখা পরিচিত দিগন্তকে নিশ্চিহ্ন করে দূরের আকাশে রাত্রির তারা হয়ে জ্বলে ওঠে, সেই সর্বনাশকেই তিনি কামনা করেছেন। আমাদের মুহূর্তের গতি যে-পৃথিবীতে একান্তভাবে অনিশ্চিত, সেখানে অস্থির-চিত্ত কবির পক্ষে স্বস্তি ও সম্ভ্রম দাবী করা চলে না। তিনি তাই কালবোশেখীর ঘূর্ণাবর্ত চেয়েছেন কিন্তু উদ্দাম প্রবাহের শেষে শান্ত ও স্নিগ্ধ সজল মৃত্তিকাকে গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছেন—

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন!
আস্‌ছে নবীন—জীবন হারা
অ-সুন্দরে করতে ছেদন।
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আস্‌ছে হেসে
মধুর হেসে!
ভেঙ্গে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!"

ধ্বংস ও সবনাশকে নিগূঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এ এক সম্মোহনী ভাষণ। বিরূপতা, অস্বস্তি এবং সর্বশেষে পরিপূর্ণ বিলয়ই কবির কাম্য। এদের মধ্যেই কবি স্থিতির আশ্বাস পেতে চেয়েছেন। তরঙ্গের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে সহজভাবে সংযুক্ত রাখতে চেয়েছেন। তাই সত্য তাঁর পক্ষে একমাত্র, "মাভৈঃ মাভৈঃ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে।" এ কারণেই ধূমকেতুর ক্ষণকালের ঔজ্জ্বল্যই তাঁর কাছে সত্য ও প্রাণদ। অপঘাত, দুর্দৈব এবং অনাসৃষ্টিই নিরন্তর তাঁর কাছে মোহনীয়তা এনেছে। তিনি নিজেই বলেছেন—

"আমার মন বড় বিক্ষিপ্ত। তাই কোন কথাই হয়তো গুছিয়ে বল্‌তে পারব না। যার সারা জীবনটাই বয়ে গেল বিশৃঙ্খল আর অনিয়মের পূজা করে, তার লেখায় শৃঙ্খলা বা বাঁধন খুঁজতে যেয়ো না। হয়তো যেটা

আরম্ভ করব সেইটেই শেষের, আর যেটায় শেষ করব সেইটেই আরম্ভের কথা।"

(রাজবন্দীর চিঠি—ব্যথার দান)।

নজরুলের কবি-জীবন-সম্পর্কে এর চেয়ে সত্য কথা আর নেই। ইংরেজ কবি শেলী শক্তিমত্তার যে-সুতীক্ষ্ণ আবেগ কামনা করেছেন, মুক্ত-জীবনের উন্মুক্ত আকাশ ও স্বচ্ছ মৃত্তিকাই তার লালন ভূমি। হতাশা ও হতোদ্যমের প্রশ্রয় সেখানে থাকতে পারে না। যে-জাতির জীবনে আকাঙ্ক্ষা সীমা মানে না, নিরবয়ব শূন্যও যেখানে দৃষ্টিসীমায় নীল হয়ে ভেসে ওঠে, সেখানে জীবনের গতিতে মৃত্যু নেই। তাই কবি উন্মাদ আবর্ত-সঙ্কুল প্রবাহের মধ্যেও সৃষ্টির অঙ্কুর দেখেছেন—

"Make me thy lype, even as the forest is ;
What if my leaves are falling like its own !
The tumult of thy mighty harmonies
Will take from both a deep, autumnal tone,
Sweet though in sadness. Be thou, spirit fierce,
My spirit ! Be thou me, impetuous one !
Drive my dead thoughts over the Universe
Like withered leaves to quicken a new birth
And by the incantation of this verse,
Scatter, as from an unextinguished heart
Ashes and sparks, my words among mankind !
Be through my lips to unawakened earth !
The trumpet of a prophecy ! O, wind,
If winter comes, can spring be far behind ?"

(Ode to the West Wind)

নিশ্ছিদ্র ঘন-বিন্যস্ত বিশাল অরণ্যানী বাত্যার প্রবাহে সচকিত হয়ে সঙ্গীত-মুখর হয়, কবি সেই সঙ্গীতের উৎস হতে চেয়েছেন। বাত্যাবিক্ষুব্ধ প্রহর তাঁর মানসিক অস্থিরতার দোসর হয়েছে। নব-জীবনের উন্মেষ-কামনায় বেদনার্ত চিত্ত আনন্দে কল্লোলিত হয়েছে। অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড থেকে

স্ফুলিঙ্গ যেভাবে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, কবির বাণীও সেইরূপ নবীন জন্মের ভাষণ-রূপে সমস্ত মানবমনে বিচ্ছুরিত হয়েছে। শীতের প্রহর বিশুষ্ক পত্র-পুঞ্জেই আচ্ছন্ন হয় নি, বসন্ত তার অনুগমন করেছে। তাই জীবন কোনো মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন-বিলয় নয়, সে সর্বদাই নব-সৃষ্টির অঙ্কুরোদ্গমের অপেক্ষা রাখে।

জীবনের এই পরিপূর্ণ চিত্র নজরুল ইসলামের কাছে আশা করাই ঔচিত্য-বিরোধী। তাঁর পরিচিত ক্ষেত্রের দিগন্ত আমাদের দৃষ্টির অত্যন্ত নিকটে, গ্লানি ও হতাশ্বাসই, এদেশের অনেকের মতো, তাঁরই গতিপথের সঞ্চয়। নীল আকাশ যেখানে মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হয় নিমেষে, যেখানে নিশীথের তারা মধ্যরাত্রেই নিভে আসে, সেখানকার জীবনে সৌষ্ঠব কামনা করা চলে না। নব-সৃষ্টির কল্পনাই সেখানে সম্ভব নয়। বাংলার কবির কাছে আমাদের কথা শুনেছি অনবরত, জীবনক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে নির্ভরতা সে কামনা করে, তাই সে যাচ্ঞা করে কিন্তু দাবী জানায় না।

ছন্দকে অনুসরণ করে বক্তব্য কখনও রূপ পায় না। আদর্শ কাব্যের ক্ষেত্রে আমরা ছন্দকে পাই বক্তব্যের পরিপোষক ও অনুষঙ্গী হিসাবে। বক্তব্যের গতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে কাব্যের বহিরাবরণের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। যে-দিব্যানুভূতি ও হৃদয়ের অশেষ প্রত্যাশা থেকে কাব্যের উদ্ভব, প্রকাশ-ভঙ্গীতে শব্দের সঙ্গীতেই তার রূপ ধরা পড়বে। প্রত্যেক শব্দের নিজস্ব একটা সঙ্গীত আছে, আবার একটি বাক্যের মধ্যে তার স্থান সুনির্দিষ্ট হলে পূর্বাপর অন্যান্য শব্দের সমন্বয়ে তার মধ্যে সুরের যে-আবর্ত সৃষ্টি হয়, কোনো বিশেষ ছন্দের পরিধিতে সেই আবর্ত নতুন সম্ভাবনায় জেগে ওঠে। এই সম্ভাবনাই কবিতার ভাষাকে গদ্যের ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। যিনি সত্যিকারের কবি, তিনি শব্দ-প্রয়োগের এই সূক্ষ্ম রীতি-সম্পর্কে অবহিত হবেন। শব্দ তাঁর মধ্যে দূরাগত সঙ্গীতের মতো একটা মোহনীয়তা সৃষ্টি করবে ভাবৈশ্বর্যের অকৃত্রিম বাহক হিসাবে, কিন্তু শব্দের সৌন্দর্য তাঁকে আচ্ছন্ন করবে না। যেখানে শব্দের সৌন্দর্যই মুখ্য, সেখানে বর্ণনার চাতুর্য থাকে কিন্তু ভাবের তন্ময়তা থাকে না। অথচ ভাবের তন্ময়তা ব্যতিরেকে জীবনের সত্য নির্ধারণ সম্ভবপর নয়। নিম্নে একটি ইংরেজি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। এখানে শব্দের সমন্বয়ে কোনো বিশেষ অর্থের সৃষ্টি হয় নি :

Keeping time, time, time,
In a sort of Runic rhyme,
To the tintinnabulation that so musically swells
From the bells, bells, bells, bells.
Bells, bells, bells.
From the jingling and the tinkling of the bells."

—E. A. Poe

উপরের উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে, এখানে শব্দগত অনুপ্রাসের জন্য একটি ক্লান্তিদায়ক গতির সৃষ্টি হয়েছে। তার অতিরিক্ত এখানে কিছু

নেই। ভাবকে অনুসরণ করে ছন্দের পরিধি গঠিত হয় নি—কবি এখানে বিভিন্ন শব্দের পুনরাবর্তনের মধ্যবর্তিতায় ঘণ্টার অনুরণণের একটি ক্লান্তিদায়ক গতি সৃজন করতে চেয়েছেন। তাই এখানে বর্ণনা-চাতুর্য স্পষ্ট হয়েছে—কিন্তু পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালের কাহিনী জীবন্ত হয় নি। এ সঙ্গে শেলীর একটি কবিতার অংশবিশেষের তুলনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, কবিতার রস-রূপের সঙ্গে ছন্দের সংযোগ ঘটেছে এবং ভাবানুগত ছন্দ এক বিচিত্র সীমার রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করেছে :

"From the forests and highlands,
We come, we come ;
From the river-girt islands
Where loud waves and dumb
Listening to my sweet pipings.
The wind in the reeds and the rushes,
The bees on the bells of thyme,
The birds on the myrtle bushes,
The cicale above the lime,
And the lizards below in the grass,
Were as silent as ever old Timolus was
Listening to my sweet pipings."

—P. B. Shelley

কবির মূল উদ্দেশ্য বস্তুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অথবা বস্তুর দৃশ্যমান সৌন্দর্যের রেখাঙ্কন নয়—তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মানসলোকে সেই বস্তুর আবেশ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ সেই বস্তুকেই মানসলোকের অগম্য প্রান্তে প্রাণময় করা। এডগার এলান পো'র কবিতায় এটা সম্ভবপর হয় নি, কেননা তাঁর শব্দে ও শব্দগত অনুপ্রাসে বস্তুর বিবরণ রূপ পেয়েছে—জীবনের সত্য বিবৃত হয় নি। শেলীর কবিতায় কবির সূক্ষ্ম জীবন-বোধ ছন্দে ও শব্দের বিচিত্র সজ্জায় রূপ লাভ করেছে। শেক্‌স্‌পীয়রের একটি সনেটে আছে :

"That time of year thou mayst in me behold,
When yellow leaves, or none, or few, do hang

Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruin'd choirs where late the sweet birds sang.*

—Shakespeare

মহাকবি আপন মনের প্রতিচ্ছায়া দেখেছেন শীতের পত্রপল্লবচ্যুত বিশুষ্ক বৃক্ষের মধ্যে। বিভিন্ন শব্দের সমন্বয়ে কবির মনোলোকের ইতিহাস সৃজিত হয়েছে। বাঞ্ছিতার আশায় বিরহকাতর নিঃসঙ্গ কবি বিশুষ্ক বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। আমাদের মানসদর্পণে সেই বৃক্ষের ছায়াই শুধু জেগে ওঠে না, প্রখর পৌষের নিষ্ঠুরতায় নির্জীব বিশীর্ণ তরুর সঙ্গে আমাদের মনের সংযোগ ঘটে। তার দুর্দশার মধ্যে আমরাও জেগে উঠি। সনেটের নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে গভীর আবেগ সংযত শোভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আমরা এখানে বিশ্লেষণ করে জানতে চেষ্টা করবো যে, নজরুল ইসলামের ছন্দ তাঁর ভাবাবেগকে কতটা অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাঁর ছন্দের বিশিষ্টতাই বা কোথায়। কিন্তু তার আগে বাংলা ছন্দের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় শব্দাংশের উচ্চারণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে ছন্দ গঠিত হত। একে ইংরেজিতে বলা হয় quantitative metre বা পরিমাণ-নির্ভর ছন্দ। সংস্কৃত ছন্দও একই প্রকারের। এই পরিমাণ-নির্ভর ছন্দ স্বরবর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের উপর নির্ভরশীল বলে, এই ছন্দে তরল আবেগ, শান্ত সমাহিত চিত্তের আবেদন ও ক্লান্তিময় আবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিশেষ করে সংস্কৃত কাব্যে তাই হয়েছে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সংস্কৃতে ছন্দের এই রূপ ভাষার গতির স্বাভাবিকতার অনুষঙ্গী বলে তা গ্রহণ করতে আমাদের অসুবিধা হয় না। বাংলাতে এই ছন্দই অস্বাভাবিক ক্লান্তির সৃষ্টি করে এবং ধ্বনির পরিমাণ-সম্পর্কে ধারণা না থাকলে ছন্দ-পতন ঘটতে পারে।

বাংলা ছন্দের সর্বপ্রথম বৃহৎ পরিবর্তন সাধন করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সুবিপুল কল্পনা ও দ্বিধাহীন আকাঙ্ক্ষার গতি পরিচিত পয়ারের শান্ত বিন্যাসের মধ্যে ক্রমশ নির্বাপিত হতে পারে এই ধারণায় তিনি বাংলায় মুক্তছন্দের প্রথম প্রবর্তন করেন। ইংরেজি ছন্দের শব্দাংশের ঝোঁককে বাংলায় আমদানি করে বাংলা পয়ারকে বিপুল ভাব-গাম্ভীর্যের বাহক করা

তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিলো। মাইকেলের আশ্চর্য কুশলতায় ইংরেজি সিলেবলের ঝোঁক বা stress অমিত্রাক্ষরের শব্দ-বিন্যাসের মধ্যে সহজে প্রকাশ পায়। এটা সম্ভবপর হয়েছিলো দু'টি কারণে: প্রথমত, অক্ষরগত ঝঙ্কার ও অনুপ্রাসের জন্য; দ্বিতীয়ত, ব্যঞ্জনবর্ণ ও সংযুক্ত স্বরের আধিক্যের জন্য।

১. অক্ষরগত ঝঙ্কার ও অনুপ্রাসের নিদর্শন:

ক. সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি,
লণ্ডভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল;
(তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য)।

খ. মৃদুহাসি শশীসহ নিশি দিলা দেখা (ঐ)

গ. শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে, (ঐ)

ঘ. আইলা সুচারু তারা শশী সহ হাসি,
শর্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বরে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
(মেঘনাদবধ কাব্য)।

ঙ. বন্দীসম শিলাবন্ধে বান্ধিয়া সিন্ধুরে
হে সুন্দরী, প্রভু মম রবি-কুল-রবি, (ঐ)

চ. অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি (ঐ)

ছ. সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে (ঐ)

উপরের উদ্ধৃতির মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অনুপ্রাসের জন্য শব্দের প্রত্যেক উচ্চারিত অংশে একটা আশ্চর্য ঝোঁকের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই ঝোঁক প্রত্যেক যতি ও পদভাগকে নিয়ন্ত্রিত ও আবর্তিত করছে। অনুপ্রাসের লালিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠক পূর্বেই পরিচিত ছিলো, কিন্তু অনুপ্রাসগত ঝোঁক ও তজ্জনিত সম্পূর্ণ পদভাগে একটা আশ্চর্য হিল্লোল মাইকেলের সৃষ্টি।

অনুপ্রাসের ঝোঁকে নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক যুগের ছন্দ পরবর্তী যুগের শব্দাংশগত ঝোঁকের নিয়মিত মাত্রায় পরিণত হয়। বাংলায় কিন্তু এই বিবর্তন সম্ভবপর হয় নি, কেননা মাইকেলের দীপ্ত আবেগ বিহারীলালের অনুপ্রেরণায় প্রশমিত হয়ে সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের মন্ময় অনুভূতিতে নির্বাণ

লাভ করে। মাইকেলের শব্দাংশগত ঝোঁক, রবীন্দ্রনাথে বাক্যাংশগত ঝোঁকে পরিণত হয়। নজরুল ইসলাম ইংরেজির Stress rhythm বা শব্দাংশগত ঝোঁককে বাংলায় আবার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। আমরা তা নিয়ে পরে আলোচনা করবো।

২. ব্যঞ্জনবর্ণ ও সংযুক্ত-স্বরের আধিক্যের নিদর্শন :

ক. সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে
(তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য)।

খ. মৃগাক্ষী, পীবরস্তনী, সুবিম্ব-অধরা (ঐ)

গ. দুকূল, কাঁচলি, সিঁথি, কঙ্কণ কিঙ্কিণী,
কুন্তল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে
(বীরাঙ্গনা কাব্য)।

ঘ. বেড়িল গন্ধর্ব নর শত প্রসরণে
রক্ষেন্দ্রে ;-হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমেষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী।
(মেঘনাদবধ কাব্য)।

ঙ. উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুম-কুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে। (ঐ)

চ. দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে
সুবর্ণি বারিদপুঞ্জে। (ঐ)

ছ. কেহ টঙ্কারিলা
শিঞ্জিনী ; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি ;
আস্ফালিলা শূলে কেহ ॥

উপরের উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে, ব্যঞ্জনবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্তস্বরের আধিক্যবশতঃ প্রত্যেক পদভাগে ও পূর্বযতির বৃত্তের মধ্যে

শব্দাংশগত ঝোঁক ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত করছে—এবং ভাব-গাম্ভীর্যের স্বাভাবিক বাহক হয়েছে।

নজরুল ইসলাম ব্যঞ্জনবর্ণের দ্রুত লয়ের ঝঙ্কার ও গম্ভীর ধ্বনি-মাহাত্ম্য-সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বাংলা ছন্দের সনাতন রূপকে অব্যাহত রেখেও শব্দাংশের ঝোঁক দিয়ে পর্ব, পদ ও বাক্যাংশের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন।

নজরুল ইসলামের কবিতার ভাবগত ও ছন্দগত সৌন্দর্যের প্রথম পরিচয় পাই "বিদ্রোহী" কবিতার মধ্যে। যদিও "বিদ্রোহী"র অনেক চরণে দুর্বল শব্দ-বিন্যাস ও অর্থহীন চাতুর্যের পরিচয় মেলে কিন্তু তবুও ছন্দের নতুনত্ব ও কোথাও কোথাও অন্তরাবেগের সুতীব্র স্ফূর্তির জন্য এই কবিতাটিই নজরুল প্রতিভার পথনির্দেশক হয়ে আছে। কবিতাটির আরম্ভে আছে—

> "বল বীর—
> বল উন্নত মম শির
> শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
> বল বীর—
> বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
> চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
> ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
> খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
> উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি
> বিশ্ব-বিধাত্রীর!
> মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!"

ভালো করে লক্ষ করলেই আমরা দেখতে পাব যে, "বীর", "শির", "হিমাদ্রির"র, "বিধাত্রীর" ও "জয়শ্রী"র প্রত্যেক শব্দের মধ্যবর্তী "ই" অথবা "ঈ" স্বর বিলম্বিত লয়ের হওয়া সত্ত্বেও, শব্দান্তের "অ" স্বর প্রায় অনুচ্চারিত থাকায় প্রত্যেক শব্দে একটি ঝোঁকের সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্তস্বরে বিচ্ছিন্নভাবে stress আপতিত হওয়ায় বিভিন্ন পদ-মধ্যে গাম্ভীর্যের সৃষ্টি হয়েছে।

উপরের উদ্ধৃতির মধ্যে আর একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ করবার আছে। মূলত সম্পূর্ণ স্তবকটিতে 'শ' এবং একই সঙ্গে "র"-এর অনুপ্রাস-জনিত আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এ-ছাড়া অন্যান্য বর্ণেরও অনুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তাদের গুরুত্ব এখানে ততটা নেই। কবি এখানে আশ্চর্যভাবে অনুপ্রাসজনিত ঝোঁকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। এভাবে ভাবসম্পদের গুরুত্ব-অনুসারে বিশেষ পরিধির মধ্যে একটি পরিমিত গাম্ভীর্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এই কবিতায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্ত-স্বরের অত্যধিক প্রয়োগের কয়েকটি নিদর্শন দিচ্ছি। দেখতে পাবো যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইংরেজী stress-এর মতো ঝোঁকের সৃষ্টি হয়েছে :

ক. আমি চির দুর্দম দুর্বিনীত, নৃশংস
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস

খ. আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায়, হর্দম ভরপুর মদ।

গ. আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার

ঘ. আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল-দোল্।

ঙ. আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি ভূমিকম্প

চ. আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল

এই ঝোঁকের জন্য প্রত্যেক বিরতি পর্যন্ত পদভাগের মধ্যে একটা ছন্দ-স্পন্দ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ছন্দ-স্পন্দ প্রতি চরণের মাত্রাবিন্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করছে। ইংরেজীতে যেখানে ঝোঁকের পরিমাণ গণনা করে মাত্রা নির্ধারণ করা হয়, বাংলাতে সেখানে ছন্দের স্পন্দন অনুসরণ করে মাত্রা নির্ধারিত হয়। নজরুল ইসলাম শব্দাংশগত ঝোঁকের সহায়তায় এই ছন্দ-স্পন্দ সৃজন করছেন। তিনি বাংলা ছন্দের পরিধির মধ্যে ইংরেজী ছন্দের বৈচিত্র্য এনেছেন।

অক্ষরবৃত্তের যতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন পদভাগের প্রাথমিক মাত্রায়

একটা **phrasal accent** বা বাক্যাংশগত বাঙ্‌ময় ঝোঁক সৃষ্টি করে বাংলা ছন্দের চিরাচরিত ক্লান্ত গতিতে নজরুল ইসলাম প্রাণসঞ্চার করেন। "পূজারিণী" ও "সিন্ধু" কবিতার ছন্দের এই নতুন প্রচেষ্টার পরিচয় আমরা পাই। তা নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার পূর্বে "বিদ্রোহী" কবিতার পর্ব-বিভাগ সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

"বিদ্রোহী" কবিতাটি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পর্বভাগে ঢালাই করা, কিন্তু ইংরেজীর মতো শব্দাংশগত ঝোঁকের আধিক্যবশত সমপরিমাণের মাত্রায় পর্বগুলো বিন্যস্ত হয় নি। কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

আমি। চির-দুরন্ত। দুর্মদ (২) · ৬ (৪)
আমি। দুর্দম, মম। প্রাণের পেয়ালা। হর্দম, হ্যায়।
হর্দম ভর্‌। পুর মদ (২). ৬. ৬. ৬. ৬. (৪)
আমি। হোম-শিখা, আমি। সাগ্নিক জম। দগ্নি, (২).
৬. ৬. (৩)
আমি। সৃষ্টি, আমি। ধ্বংস আমি। লোকালয়, আমি।
শ্মশান, (২) ৫. ৫. ৬. (৩).
আমি। অবসান, নিশা। বসান। (২) ৬. (৩).
আমি। ইন্দ্রানি সূত। হাতে চাঁদ ভালে। সূর্য. (২). ৬. ৬.
(৩)
মম। এক হাতে বাঁকা। বাঁশের বাঁশরী,। আর হাতে রণ। তূর্য!
(২). ৬. ৬. ৬. (৩).
আমি। কৃষ্ণ-কণ্ঠ,। মন্থন-বিষ। পিয়া-ব্যথা-বারি। ধির!
(২). ৬. ৬. ৬. (২)
আমি। ব্যোমকেশ, ধরি। বন্ধন-হারা। ধারা গঙ্গোত্রীর,
(২). ৬. ৬. ৬. (২)

বল বীর—৪
চির। উন্নত মম। শির। (২) ৬ (২)

উপরের উদ্ধৃতির পর্বভাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ছয় মাত্রার চালে ছন্দ-স্পন্দ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রত্যেক চরণের আরম্ভে একটি দু'মাত্রার

hypermetric বা ছন্দোতিরিক্ত পর্ব, পর্বের সাধারণ গতিকে কিছুটা গম্ভীর ও বিলম্বিত করেছে—এবং চরণের শেষের বিভিন্ন মাত্রার খণ্ড পর্ব সেই গাম্ভীর্যের সীমা নির্দেশ করেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম চরণের কয়েকটি পর্বে সাধারণ গণনায় মাত্রাসংখ্যা কম বলে প্রতীতি জন্মে কিন্তু শব্দাংশগত ঝোঁক সেখানে স্বল্প মাত্রায় পরিধিকে বর্ধিত করেছে তাই মাত্রায় ন্যূনতা ত্রুটির কারণ হয় নি। 'যজ্ঞ', 'সৃষ্টি' এবং 'ধ্বংস' তিনটি শব্দে ইংরেজীর মতো সিলেবল-গত তীব্র ঝোঁকের সৃষ্টি হয়েছে এবং ঝোঁকের প্রভাব চরণের শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত থেকে একটি সংহত ছন্দ-স্পন্দ সৃষ্টি করেছে। এই দুইটি চরণে পয়ারের মতো যতি নির্দেশ করে আবার ভিন্ন প্রকার ছন্দ-স্পন্দও সৃষ্টি করা যায় :

আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, । আমি অগ্নি ॥ ১০+৪
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস । আমি লোকালয় । আমি শ্মশান ॥
৮+৬+৫ ।

অবশ্য এ বিন্যাস অযথার্থ, কেননা এতে মূল কবিতার ছন্দ-রীতির সঙ্গে বিরোধ ঘটে।

Stress অথবা ঝোঁক স্বল্পমাত্রার পরিধিকে বর্ধিত করেছে, এ-ধরনের নিদর্শন "বিদ্রোহী"তে আরও আছে।

ক. আমি । অন্যায়, আমি । উল্কা, আমি । শনি (২).
৬. ৫. ২
আমি । ধূমকেতু জ্বালা । বিষধর কাল- । ফণী !
(২) ৬. ৬. ২
আমি । ছিন্নমস্তা । চণ্ডী, আমি । রণদা সর্ব । নাশী,
(২). ৬. ৫. ৬. ২
আমি । জাহান্নামের । আগুনে বসিয়া । হাসি পুষ্পের । হাসি ।
(২). ৬. ৬. ৬. ২

খ. আমি । বেদুইন, আমি । চেঙ্গিস্, (২) ৬. ৪
আমি । আপনারে ছাড়া । করি না কাহারে । কুর্ণিশ ।
(২). ৬. ৬. ৪.

আমি। বজ্র, আমি। ঈশাণ-বিষাণে। ওঙ্কার।, (২)
(২) ৫. ৬. ৪.

আমি। ইস্রাফিলের। শিঙ্গার মহা। হুঙ্কার, (২) ৬. ৬. ৪

(গ) আমি। দেবশিশু, আমি। চঞ্চল, (২) ৬. ৪

আমি। ধৃষ্ট, আমি। দাঁত দিয়া ছিঁড়ি। বিশ্ব-মায়ের। অঞ্চল।
(২). ৫. ৬. ৬. ৪.

উপরের তিনটি উদাহরণেই পাঁচমাত্রার একটি ক'রে পর্ব রয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও শব্দাংশগত ঝোঁকের জন্য মাত্রার স্বল্পতা ঘটে নি।

মোহিতলাল যাকে পদ-স্বচ্ছন্দ পয়ার বলেছেন, "পূজারিণী" কবিতাটি সেই ছাঁচে ঢালাই করা। এই কবিতাটির পদগুলো অসমান এবং তাদের সংখ্যারও স্থিরতা নেই। চরণে চরণে মিল আছে কিন্তু চরণগুলোর মাপ এক নয়। শব্দাংশগত ঝোঁক এখানে অনুপস্থিত কিন্তু **phrasal accent** বা বাক্যাংশগত ঝোঁকের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ঝোঁক প্রতি পদের আরম্ভে শ্রুতিগোচর হয়। কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধৃত করছি :

ক. দিনান্তের প্রান্তে বসি আঁখি-নীরে তিতি,
আপনার মনে আনি তারি দূর দূরান্তের স্মৃতি—
মনে পড়ে বসন্তের শেষে আসা ম্লান মৌন মোর
আগমনী সেই নিশি
যেদিন আমার আঁখি ধন্য হল তব আঁখি চাওয়া
সনে মিশি।

খ. জন্ম জন্ম ধরে চাওয়া তুমি মোর সেই ভিখারিণী
অন্তরের অগ্নি-সিন্ধু ফুল হয়ে হেসে উঠে। কহে
চিনি! চিনি!
বেঁচে ওঠ্ মরা প্রাণ। ডাকে তোরে দূর হতে সেই
যার তরে এত বড় বিশ্বে তোর সুখ শান্তি নেই!

গ. আন্ তোর বহ্নি-রথ। বাজা তোর সর্বনাশা তূরী!
হান তোর পরশু-ত্রিশূল! ধ্বংস কর এই মিথ্যাপুরী!

রক্ত-সুধা-বিষ আন ! মরণের ধর টিপে টুটি !
এ মিথ্যা জগৎ তোর অভিশপ্ত জগদ্দল চাপে
হোক কুটি কুটি !

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি নির্দেশ করতে গিয়ে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসন এক সময় যে-উক্তি করেছিলেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, **My own suggestion is that Bengali phrasal accent, instead of being final as in French, is chiefly (though not always) initial, and this quality is the basis of Bengali metre".** এই উক্তি যে কতটা সত্য নজরুল ইস্‌লামের উপরের উদ্ধৃতির পদ-বিন্যাস ও ঝোঁক-নির্দেশক চিহ্ন দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো।

ব্যঞ্জনবর্ণের আধিক্য ও ঘন ঘন যুক্তাক্ষর-বিন্যাস এই উভয় কারণেই ইংরেজী ছন্দের মতো বাংলা ছন্দেও নজরুল ইস্‌লাম প্রবল আঘাত-মূলক ছন্দ-স্পন্দের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আবার পর্বান্ত হসন্তবর্ণ যতদূর সম্ভব বর্জন করে স্বর-প্রসারণের সুযোগ না দিয়েও বাংলা ছন্দে শব্দাংশগত ঝোঁক আনতে পেরেছিলেন, যেমন—

"ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন !
দুর্বল ! ভীরু ! চুপ রহো, ওহো খামকা ক্ষুব্ধ মন !
ধ্বনি উঠে রণি' দূর বাণীর,—
আজিকার এ খুন্ কোরবানীর !
দুম্বা-শির রুমবাসীর
শহীদের শির-সেরা আজি। রহমান কি রুদ্র নন ?"

এটা পড়তে হবে এভাবে :

ওরে হত্যা-নয়াজ সত্যাগ্রহ শক্তিরুদ্বোধন।
দুর্বল ! ভীরু, চুপ্রহো খামকা-ক্ষুব্ধ-মন।
ধ্বনি উঠে রণি' দুর্বাণীর,—
আজিকারে-খুন-কোর্বানীর।
দুম্বা-শির রুম্বাসীর।

এখানে স্বর-প্রসারণের কোনো অবকাশ না দিয়ে কবি অপূর্ব ছন্দ-স্পন্দের সৃষ্টি করেছেন।

নজরুল ইসলাম ছন্দ ও মিলের বিচিত্র চাতুর্য দেখিয়েছেন "ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম" কবিতায়। ভাবগত সৌন্দর্য প্রায়ই অনভিব্যক্ত থেকেছে, অন্যপক্ষে শব্দ ও সুরের মোহময়তায় কবির মন অত্যন্ত বেশী আচ্ছন্ন রয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ছন্দের বৈচিত্র্য দেখবার জন্যই যেন কবিতাটির মিলের ও ছন্দের বৈচিত্র্য নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

ক. মিলের বৈচিত্র্য—

"নাই তাজ!
তাই লাজ?
ওরে মুসলিম্ খরজুর শীষে তোরা সাজ!
ক'রে তস্‌লিম্ হর্ কুর্নিশে শোর্ আওয়াজ।"

এখানে প্রতি চরণে অন্তস্থিত মিল ছাড়াও চরণে পর্বগত এমন কি শব্দগত মিলও রয়েছে। প্রথম চরণের "নাই", পরবর্তী চরণের একই স্থানস্থিত "তাই"-এর সঙ্গে মিল সৃষ্টি করেছে; তৃতীয় চরণের প্রথম শব্দ চতুর্থ চরণের প্রথম পর্বের সঙ্গে, প্রথম পর্বের সঙ্গে প্রথম পর্বের এবং এভাবে অন্যান্য শব্দ, পর্ব ও চরণের মিল সৃষ্টি হয়েছে।

শুধু ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের সংলগ্ন-প্রয়োগে ছন্দ-স্পন্দের সৃষ্টি—
উর্‌জ্ য়্যামেন নজ্‌দ হেযায তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান তিহারান—স্মরি কাহার বিরাট নাম
আজি বান্দা যে ফের্‌উন্ শাদ্দাদ্ নম্‌রুদ মারোয়ান্
এ্ শাম্‌সোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কামারোজ্জা সালাম
রোয়ে ওযযা হোবল্ ইবলিস খারেজিন।

অক্ষরগত ও ঝঙ্কারগত অনুপ্রাসের প্রয়োগ—
দূরে ঘূর্ণীর তালে সুর বুনে হূরী ফূর্তির   র
ঝুরে স্বর্ণীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরাণী তুরাণী তুর্কীর   র
শোন্ দামাম্ কানান্ তামাম্ সামাম
নির্ঘোষি কার নাম   ম ন

শব্দের দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের প্রকৃতি ও ধ্বনি প্রকাশ করবার চেষ্টা 'ঝড়' কবিতায় পাওয়া যায়। ঝড়ের অনুভূতি নয়, ঝড়ের আলোড়ন ও গতি তিনি শব্দ-বিন্যাসের মধ্যে তুলে ধরতে চেয়েছেন।' ঝড়ের প্রথম অবস্থায় ক্ষুব্ধ প্রকৃতির আকস্মিক মত্ততা, ঝড়ের দুরন্ত দুর্যোগ এবং বৃষ্টির অবিরল ধারায় প্রকৃতির শান্তশ্রী শুধু শব্দ-বিন্যাসের মধ্যেই কবি তুলে ধরেছেন। ঝড়ের পরিচয় কবি দিয়েছেন এভাবে :

"ঝড় ঝড় ঝড় আমি—আমি ঝড়—
শন্-শন-শনশন শন্ কড়ক্কড় কড়
কাঁদে মোর আগমনী আকাশ বাতাস বনানীতে।
জন্ম মোর পশ্চিমের অস্তগিরি-শিরে,
যাত্রা মোর জন্মি আচম্বিতে
প্রাচী'র অলক্ষ্য পথ-পানে।
মায়াবী দৈত্য-শিশু আমি
ছুটে চলি অনির্দেশ অর্ন-সন্ধানে!"

ঝড়ের উদ্দামতার পরিচয় স্পষ্ট করতে চেয়েছেন নিম্নোক্ত কয়েকটি ছত্রে :

"ঝড়—ঝড়—উড়ে চলি ঝড়
মহাকায় পক্ষীরাজে চড়ি'
পড়—পড় আকাশের ঝোলা সামিয়ানা
মম ধূলি-ধ্বজা সনে করে জড়াজড়ি।
প্রমত্ত সাগর-বারি-অশ্ব মম তুফানীর খর-ক্ষুর বেগে
আন্দোলি' আন্দোলি' ওঠে ফেনা ওঠে জেগে
ঝটিকার কশা খেয়ে অনন্ত তরঙ্গ-মুখে তার!"

বৃষ্টির শেষে প্রকৃতির প্রশান্ত অবস্থার পরিচয় ছন্দের ক্লান্ত গতিতে প্রকাশ করেছেন :

"সজল কাজল-পক্ষ কে সিক্ত-বসনা একা ভিজে—
বিরহিণী কপোতিনী, এলোকেশ কালোমেঘে পিঁজে।
নয়ন-গগনে তার নেমেছে বাদল, ভিজিয়াছে
চোখের কাজল,

মলিন করেছে তার কালো আঁখি-তারা বায়ে-ওড়া
কেতকীর পীত পরিমল !"

এখানে ছন্দের ও শব্দ-বিন্যাসের চাতুর্য আছে যে ধরনের চাতুর্যের পরিচয় আমরা ইংরেজ কবি টেনিসনের নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে পাই :

"Sweeter thy voice, but every sound is sweet ;
Myriads of rivulets hurrying thro' the lawn,
The moan of doves in immemorial elms,
And murmuring of innumerable bees."

দ্বিতীয় চরণে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোতের প্রবাহকে, তৃতীয় চরণে ঘুঘুর ক্লান্ত স্বরকে এবং সর্বশেষ চরণে মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনিকে শব্দের ঝঙ্কারের মধ্যে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই কুশলতার অভাব নজরুল ইস্‌লামের মধ্যে কখনও হয় নি, কিন্তু কুশলতার আতিশয্য ঘটলে যে সর্বনাশ হয়, তাকে তিনি দূরে ঠেলতে পারেন নি। আবার যেখানে অনুভূতিকে অনুসরণ করে ছন্দ ও ভাষা রূপ লাভ করেছে সেখানে আমরা পরিপূর্ণ জীবনবোধের পরিচয় পাই। যেমন :

"দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ !
শীর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি কর পান ! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ।"

অথবা :

"নিরন্ধ্র মেঘে অন্ধ আকাশ, অন্ধ তিমির রাতি
কুহেলি-অন্ধ দিগন্তিকার হস্তে নিভেছে বাতি,
চলে পথহারা অন্ধ দেবতা ধীরে ধীরে এরি মাঝে,
সেই সাথে ফেলে চরণ—যে পথে কঙ্কাল পায়ে বাজে !"

অথবা :

> "প্রাণ-প্রবাহের প্রবল বন্যা, বেগে খর-স্রোতা নদী
> ভেঙেছে দু কূল, সাথে সাথে ফুল ফুটায়েছে নিরবধি।
> জলধির মহা-তৃষ্ণা জাগিছে যে বিপুল নদী-স্রোতে,
> সে কি দেখে, তায় স্রোতে কে ডুবিল,
> কে মরিল তার পথে?"

উপরের কয়েকটি উদ্ধৃতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শব্দ-বিন্যাসের, পর্বের ও পদভাগের মধ্যে বিশিষ্টতা রয়েছে, কিন্তু কোথাও ইচ্ছাপ্রসূত চাতুর্যের পরিচয় নেই। অনুভূতি আপন গতিপথ আপনিই সৃজন করে নিয়েছে। ছন্দ ভাবানুসারী এবং সে-কারণে বক্তব্যও পূর্ণাঙ্গ; প্রকাশের দীপ্তি অন্তরের সৌকর্যের প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের প্রাণশক্তি যেমন প্রতিনিয়ত বর্ণে, গন্ধে, রূপে, রসে বোধের জাল বিস্তার করে চলেছে, আমাদের ভাষাও তেমনি সৃষ্টি করছে, কত ছবি, কত রস—তার ছন্দে, তার শব্দে কত রকমের তার যাদুশক্তি। মানুষ যখন কালের নেপথ্যে অন্তর্ধান করে তখনো তার বাণীর লীলা সজীব হয়ে থাকে ইতিহাসের রণভূমিতে। আলোকের রঙ্গশালায় গ্রহতারার নাট্য চলেছে অনাদিকাল থেকে। তা নিয়ে বিজ্ঞানীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। দেশকালে মানুষের ভাষারঙ্গের সীমা তার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ কিন্তু বাণীলোকের রহস্যের বিস্ময়করতা এই নক্ষত্রলোকের চেয়ে গভীর ও অভাবনীয়। নক্ষত্রলোকের তেজ বহু লক্ষ তারাচলার পথ পেরিয়ে আজ আমার চোখে এসে পৌঁছল, কিন্তু তার চেয়ে আরো অনেক বেশি আশ্চর্য যে, আমাদের ভাষা নীহারিকাচক্রে ঘূর্ণ্যমান সেই নক্ষত্রালোককে স্পর্শ করতে পেরেছে।"

এই নক্ষত্রলোককে স্পর্শ করবার দুঃসাহস কখনও কখনও নজরুল ইস্‌লামের কাব্যকে নীতিবোধহীন আবেগের উন্মত্ততায় নৃত্যরত করেছে, আবার কখনও কখনও দৃষ্টির অন্তরালের এক মোহনীয় আলোকে উদ্ভাসিত করেছে। নজরুল ইস্‌লামের ছন্দে ও শব্দ-বিন্যাসে আমরা এই দুই বিরুদ্ধ আবেগেরই পরিচয় পাই।

নজরুল ইস্‌লামের ছন্দ-সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য

প্রণিধানযোগ্য। মোহিতলালের মন্তব্য অবশ্যই মূলতঃ প্রশস্তি। নজরুল ইসলাম ছন্দকে রক্ষা করে তার মধ্যে আবেগকে যে প্রবহমাণ রাখতে পেরেছেন, বর্তমান যুগের কাব্যক্ষেত্রের অব্যবস্থার দিনে তা যে কতটা অপূর্ব তাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। মন্তব্যটি উদ্ধৃত করছি—

"কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ-ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ-ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কণ্ঠ-ভারতীর ভূষণ না হইয়া প্রাণের আকুতি ও হৃদয়স্পন্দনের সহচর না হইয়া ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণ-প্রীতিকর প্রাণহীন বাক্‌চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানবকণ্ঠের স্বর-সপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতউৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী। 'খেয়াপারের তরণী'-শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্বত্র মূলত এক হইলেও, মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটা অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে —কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই—এই কবি-শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর শব্দবিন্যাস ও ছন্দঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩২৭ সালের ভাদ্রের "মোস্‌লেম ভারত"-এ। ইস্‌লামের কাব্য-প্রতিভার ক্রমবিকাশের দিক থেকে বিচার করলে এই মন্তব্যের যথেষ্ট মূল্য আছে।

ভাঙ্গার গান

প্রত্যেক জাতির জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন সে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় সাহিত্য করতে পারে না। যুগ এবং পরিশেষের কাম্য বস্তুকে সে পরিবেশন করতে চায়। কখনও এ পরিবেশন প্রাত্যহিক জীবনের আবেষ্টনীর দ্বিধা অতিক্রম করে বৃহত্তর সত্যকে স্বীকার করে, আবার কখনও বা মুহূর্তের প্রাপ্য মিটিয়েই সে স্বস্তি পায়। অধিকাংশের পক্ষে এই স্বস্তি পাওয়াটাই স্বাভাবিক এবং নির্ধারিত। জীবনের উপজীব্য যেখানে অনাকাঙ্ক্ষ প্রহরের দাবী মেটানো, যেখানে মানুষ অধিকারের প্রশ্ন তোলে না, যেখানে মানুষের সমস্ত চিন্তার গতি শ্লথ মন্থরতায় স্বল্লায়ু জীবনের কামনা-বাসনার আবর্তে বিলীন হয়, সেখানে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু আশা করা চলে না।

নজরুলের 'ভাঙ্গার গান' এই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কাব্য। দুর্দশাগ্রস্ত জাতির জন্য এ গান মুক্তির গান নয়—এ গান শাসনক্ষেত্রে অধিকারীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভের গান। এখানে নতুন নির্দেশ নেই, জয়ের সঞ্চয় নেই, পুঞ্জীভূত হতাশ্বাসের প্রশ্রয় ও প্রকাশ রয়েছে—

"অন্ধকার! অন্ধকার!
নিশ্বাস আজি বন্ধ মার
অপমানে নির্মম লাজে,
তাই দিকে দিকে ক্রন্দন বাজে,
দীপ নেবাও! দীপ নেবাও!
আপনার পানে ফিরিয়া চাও
ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী,
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।"

কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা

জীবন-ক্ষেত্রে লাঞ্ছনা ও গ্লানি যখন কবিকে বিক্ষুব্ধ করেছে, তখন প্রশান্ত জীবনের শাসন তিনি স্বীকার করেছেন—

"নহি মোরা ভীরু সংসারী
বাঁধি না আমরা ঘরবাড়ী!
দিয়াছি তোদের ঘরের সুখ,
আঘাতের তরে মোদের বুক।"

কিন্তু এ বিক্ষোভ অতিরিক্ত হয়ে যখন মানুষের স্থির বিশ্বাস ও শালীন চিন্তাধারায় আঘাত করে, তখন কাব্যক্ষেত্রে তা মানসিক বৈকল্যের পরিচয় আনে। এক বিশেষ ইচ্ছার দ্বিধাহীন প্রকাশ, স্পষ্ট ভাষণ হতে পারে কিন্তু কাব্য হয় না। তবুও ক্ষণকালের জন্য তার মূল্য রয়েছে যথেষ্ট। "দুঃশাসনের রক্তপান" কবিতায়:

"ভয়ে-ভীরু ওরে ধর্মবীর!
আমরা হিংস্র চাই রুধির!
শয়তান মোরা? আচ্ছা তাই!
আমাদের পথে এসো না ভাই।
মোদের রক্ত-রুধির-রথ,
মোদের জাহান্নামের পথ,
ছেড়ে দাও ভাই জ্ঞান-প্রবীণ,
আমরা কাফের ধর্মহীন।"

এ-কয়টি চরণ কাব্য-ক্ষেত্রের কোনো গ্রহণীয় সঞ্চয় নয়। এখানে কবি আপনার লাঞ্ছিত মনের দুর্ভরতার সৌষ্ঠব বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোনো নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত আনেন নি।

বাংলাদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য, সুগন্ধ, আনন্দ এবং মধুরতা কবির অনেক বক্তব্যের আশ্রয় হয়েছে, যেমন—

"স্বর্গ হইতে জননী তোমার
পেতেছেন নামি মাটিতে কোল।
শ্যামল শস্যে হরিত ধান্যে
বিছানো তাহারই শ্যাম আঁচোল।

তাহারি স্নেহের করুণ গন্ধ
নবান্নে ভরি উঠিছে ঐ।
নদীস্রোত-স্বরে কাঁদিছেন মাতা
'কই রে আমার দুলাল কই?'

মানব মনের যে পর্যায়ে বিনাশের ইতিহাসই একমাত্র সত্য, "ভাঙ্গার গান" তারই আবর্ত-সঙ্কুল কাহিনীর বিন্যাস।

যুগবাণী

সাহিত্য ও মানুষের জীবন যুগের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হতে পারে না, কিন্তু পূর্ণভাবে রাজনৈতিক আক্ষেপ ও উচ্ছ্বাসের উপর নির্ভরশীল হলেও সাহিত্যের মূল্য থাকে না। যে রাজনৈতিক অনুভূতিতে সামাজিক চিন্তাধারা বিবর্তিত হচ্ছে এবং সে-সঙ্গে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের রূপ নির্ধারিত হচ্ছে—সে অনুভূতিতে নিষিক্ত হয়েই সাহিত্যের আবেদন হয় গভীর এবং ইঙ্গিত হয় সর্বকালের জন্য। কিন্তু এই সর্বকালের আবেদনের কথাতেই যত অনর্থের সৃষ্টি হয়। আজকার সত্য আগামী কালের জন্যও সত্য থাকবে কি? পৃথিবীর দিকে না তাকিয়ে ধ্যানলোকে পরম সত্যকে অনুধাবন করা চলে না; বাইরের আলোতেই অন্তর উদ্ভাসিত হবে এবং পৃথিবীর মাটির উপর পা রেখেই আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো। অবশ্য এ-সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, মানব-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো রাজনৈতিক আদর্শই সাহিত্যের উপাদান হতে পারে না, প্রচারপত্রের কুক্ষিগত হয়েই তার মৃত্যু ঘটে। মিল্‌টনের **Areopagitica** আজও মিথ্যে হয় নি, তার কারণ যুগ যুগ লাঞ্ছিত ব্যক্তি-মানসের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও উক্তি-স্বাধীনতার জন্য কবির মর্মস্পর্শী আবেদন চিরকালের জন্য সহৃদয়তার আস্বাদ এনেছে। কিন্তু তাঁর **Reason of Church Government**-এর অকালমৃত্যুর জন্য আমাদের দুঃখ নেই।

নজরুল ইস্‌লামের "যুগবাণী"র আবেদন একটি বিশেষ সময়ের মানুষের প্রচলিত চিন্তাধারার উপর নির্ভরশীল বলেই কালোত্তীর্ণ হতে পারে নি, কিন্তু তবুও এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় অনাচার, সামাজিক কুসংস্কার এবং মানুষের বদ্ধমূল দাস্যবৃত্তির বিরুদ্ধে এমন কতগুলো কথা আছে যা আজকের দিনেও অনিবার্য ভাবে সত্য।

বিদেশী আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের যুগে 'যুগবাণী'র প্রবন্ধগুলো লিখিত। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আমাদের দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে রুশের নবজাগরণের সংবাদ তারা শুনেছে, ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে পরিচয়

তাদের যথেষ্ট স্পষ্ট, উপরন্তু প্রত্যক্ষভাবে গুরুতর বিপদের মধ্যে জড়িত থাকায় মাদকতাও আছে। এ-সব বিভিন্ন কারণে দেশব্যাপী এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। উপস্থিত বিক্ষুব্ধতাতেই তারা সন্তুষ্ট ছিলো, কিন্তু ভবিষ্যতের করণীয়-সম্পর্কে তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় নি। এই বিক্ষোভে যাঁরা ভাষা, ছন্দ ও বাণী দিয়েছিলেন, নজরুল ইস্‌লাম তাঁদেরই একজন। তাঁর সঙ্গে সুরসংযোজন করেছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। এটা মনে করলে কিন্তু ভুল করা হবে যে, সে-সময়কার কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলনের মূল-তত্ত্বের প্রতি এঁদের কোন প্রকার মোহ ছিলো না। নীতিহীন ও নির্দেশহীন বিপ্লব উচ্ছৃঙ্খলতার মাদকতাতেই নিমজ্জিত ছিলো, তাই এখানে-ওখানে অঘটন ঘটলেও শোষকের জন্য কণামাত্রও সর্বনাশ এলো না। প্রত্যক্ষ উদ্দামতা মানুষের স্থির বুদ্ধিকে নির্যাতন করেছিলো ; কিন্তু শুধুমাত্র ভাষায় ও ছন্দে আবেগময় উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্যা এনেছিলেন নজরুল ইস্‌লাম। সেদিনকার বিপ্লবের মূল্য থাকে নি ; কিন্তু নজরুলের ভাষণ আহত ও নির্যাতিত মনের জন্য এখনও পরম অমোঘ।

সে সময় সবাই একই সুরে কথা বলেছিলো। একই আবেগ প্রত্যেকের মনকে দোলা দিয়েছিলো, তাই তাদের তথ্য ও ভাষা একই উচ্ছ্বাসে আবর্তিত হয়েছিলো। সকলের সঙ্গে সুর-সঙ্গতির জন্যই খ্যাতিলাভে নজরুল ইস্‌লামের বিলম্ব ঘটে নি, কিন্তু আকস্মিক উচ্ছ্বাস সহজেই স্তিমিত হয়ে পড়লো। যে-ভাষায় নজরুল ইস্‌লাম কথা বলেছিলেন—সে ঐ যুগেরই বিশিষ্ট ভাষা। একই ভাষায় কথা বলেছিলেন একই আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ ও আরও অনেকে। তখনকার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকগুলো একই সুরে কণ্ঠ মিলিয়েছিলো।

"সৎ-সঙ্গী"র প্রথম সংখ্যায় (১৩২৭ সাল) বারীন্দ্রকুমার বাংলার সাধনার কথা বলতে গিয়ে লিখলেন :

"আজ আবার অসাধ্য সাধনের যুগ এলো, কালের অপার থৈ থৈ নীল জলে এ-জগতের কমলে কামিনী জীবনের পবনে আবার বুঝি জগৎ জুড়িয়ে দুলবে। ওরে সাত শ বছরের মড়া, তোদের এবার বুঝি নতুন করে বাঁচবার পালা, এমনতর করে যথাসর্বস্ব খুইয়ে, মরে বুঝি তোমরা জন্মের শোধ অমৃত-ধনের পরম অধিকারী হতে চল্লে।

"মরণ-মন্ত্রই শিখেছিলে যদি, তবে এবার নিবিড় মরণও মরে দেখ, সব দিকে কি করে বেঁচে যেতে হয়, ওগো জীবের বিনাশে কি করে প্রতি ঘট ভরে তড়িদুজ্জ্বলা শিবশক্তির উদয়, তাই এবার জগৎকে দেখাও। সমর্পণ-যোগের যোগী আত্মশক্তির এই রত্নাকর জলে ডুব দে, দেখ পাতাল কত দূর। যা করা যায় তা তো সবাই করে। যা মানুষে পারে না, এবার যে তোমাদের সেই খেলা খেলতে হবে, পাষাণ ভরে জীবনের ফুল ফোটাতে হবে।"

মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখলেন, 'মোসলেম-ভারত'-এ (আশ্বিন ১৩২৭): "গাছের পাতা এতটুকুও নড়িতেছে না। সমস্ত আকাশ ঘোর কালো মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; এখনি নামিবে বিশ্ব-বিধ্বংসী ঝড় আর বৃষ্টি। মাঝি বসিয়া ভাবিতেছে, এ উত্তাল সমুদ্রে তরীর পাড়ি দিই কি না দিই। কেন পাড়ি দিবে না, মাঝি? তোমার যে পাড়ি দেওয়াই কাজ। ঝড়, বৃষ্টি, দুর্যোগকে আর যে ভয় করে করুক, মাঝি তুমি; তোমার ভয় করিলে চলিবে কেন?

"সত্য বটে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে এই কালো সমুদ্র ভয়ঙ্কর, বড় ভীষণ; সত্য বটে, সমুদ্রের ঢেউ বড় প্রচণ্ড, বড় শক্তিশালী, কিন্তু তাই বলিয়া সমুদ্র কি কেহ পার হয় না ভাই? কোথায় ছিল আমেরিকা কোন অজানার রাজ্যে, মানুষ কি উহাকে আবিষ্কার করে নাই ভীষণ সমুদ্র পার হইয়া? তরঙ্গের প্রচণ্ডতা ও শক্তিমত্তাকে দলিত করিয়া জাহাজ কি চলে না ভাই সমুদ্রে? আমরা কর্তব্যের আহ্বান শুনিয়াছি; সব বাধা, সব বিঘ্নকে আমরা উপেক্ষা করিয়া চলিব। দুর্যোগের ভিতর চলিয়া চলিয়া আমাদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, আমরা আর ভয় করি না! ঝড়-বৃষ্টি নামিয়া আসে আসুক, চল্ মাঝি ভাই, আমরা দুর্যোগের পাড়ি দেই, দে ভাই, তরীর বাঁধন মুক্ত করিয়া। ঐ শোন্ কবি গাহিতেছে:

'আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে?"

'প্রবর্তক' পত্রিকায় লেখা হলো—

"বিশ্বস্রষ্টার অসীম করুণায় অনন্ত প্রেরণাপুঞ্জ মাথার উপরে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে—উহাকে স্বতঃপ্রকাশ করিতে হইবে। আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তোল, সিদ্ধি তো আজ একজনের জন্য নয়, একজনের সার্থকতা

সহস্রজনকে গিয়া পরিপ্লুত করিবে, সহস্রজনের সিদ্ধশক্তি কলকল বিপুল তরঙ্গে সকলকে ভরাইয়া তুলিবে—চিন্তাকে গভীরে, হৃদয়কে অসীমে প্রসারিত করিয়া দাও, দিগন্তবিস্তৃত হৃদয়সমুদ্রের উপর চিত্র-বিচিত্র অপূর্ব জীবন-কৌশল ক্রীড়া করুক—বাকশ্রান্ত, লেখনী আমার চলিয়া চলিয়া চলিয়া পড়িল, বাঙ্গালী আমার মর্মকথা কি অন্তর দিয়া বুঝিবে না?"

এই সমস্ত কথাই একই সূত্রে গাঁথা। ভাষা, ভাষণ ও তথ্য সমগ্রভাবে একই সংবাদ পরিবেশন করছে। সমুদ্র-তরঙ্গের ফেনপুঞ্জের মতো সে যুগের উচ্ছ্বাস ক্ষণকালের জন্য উচ্ছ্বসিত হয়েই চিরকালের জন্য নির্বাপিত রইলো। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই উচ্ছ্বাস একটি পর্যায় সৃষ্টি করেছিলো এবং ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা সে কথা স্মরণ করবো। কিন্তু সাহিত্যের অক্ষয় আনন্দের ভোজে সে-সব কথার কয়টি পঙ্‌ক্তি দেদীপ্যমান থাকবে তা নিশ্চিন্তে বলা যায় না। নজরুল ইস্‌লাম এই ক্ষণ-উজ্জ্বল অগ্নিশিখা নিয়েই মেতে উঠেছিলেন, বৈশ্বানরের বিশ্ব-বিধ্বংসী লীলায় উন্মাদ করতালি দিয়ে উঠেছিলেন—তরুণ সম্প্রদায় যুক্তি-তাপিত চিন্তার তিরোধানে উল্লসিত হয়েছিল কিন্তু এ-ভাবে অক্ষয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হয় নি। তবুও নজরুল ইস্‌লাম আমার স্মরণীয়—অন্যায়ের প্রতি তাঁর দৃপ্ত বিরুদ্ধাচরণের জন্য। এই বিরুদ্ধাচরণের পরিচয় "যুগবাণী"তে আছে।

তৎকালীন "নবযুগ"-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত প্রবন্ধগুলো গ্রথিত করে "যুগবাণী" সাজানো হয়েছে। কতগুলো রচনা অত্যন্ত বেশি সাময়িক, যেমন 'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য,' 'মুহাজেরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি', 'লাট-প্রেমিক আলী ইমাম', 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', 'ছুঁৎমার্গ', 'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'। কিন্তু এগুলো ছাড়া আরও কতগুলো লেখা আছে, যেগুলোর সত্যতা আজকের দিনেও নিষ্ঠুরভাবে সত্য। জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তিরিশ বছরের আগেকার অন্ধকার আজও তিমিরাঞ্চল বিছিয়ে রেখেছে।

মরু-ভাস্কর

'মরু-ভাস্কর' নজরুল ইস্‌লামের সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ, কিন্তু রচনাকালের দিক থেকে বিচার করলে 'নতুন চাঁদ'-এর অনেক পূর্ববর্তী। প্রকাশের সঙ্গে কবির সম্পর্ক না থাকায় অনেক ত্রুটি ও শিথিলতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ত্রুটি স্পষ্ট হয়েছে ছন্দ ও বাণী-বিন্যাসে। অবতরণিকা অধ্যায়ে অতর্কিতে পঞ্চম পৃষ্ঠায় ছন্দোগত বিশৃঙ্খলা ঘটেছে। এখানে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ছয় মাত্রার তিনটি পর্ব এবং সর্বশেষে দু'মাত্রার খণ্ড পর্ব, যেমন—

'নহে আরবের, নহে এশিয়ার
বিশ্বে সে একদিন,
ধূলির ধরার জ্যোতিতে হ'ল গো
বেহেশ্‌ত জ্যোতিহীন।'

কিন্তু একই গতি ও বিন্যাসের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে নিম্নরূপ—

'অভিনব নাম শুনিল রে ধরা
সেদিন —'মোহাম্মদ'।
এতদিন পরে এল ধরার
'প্রশংসিত ও প্রেমাস্পদ।'
চাহিয়া রহিল সবিস্ময়
ইহুদী আর ঈশাই সব,
আসিল কি ফিরে এতদিনে
সেই মসীহ মহামানব?'

যে কোনো কবিতা-পাঠকের কাছে ছন্দোগত এ বৈষম্য সহজেই ধরা পড়বে। রচনাগত শিথিলতার পরিচয় আছে, যেমন, 'এই কি নিয়ম? এই কি নিয়তি? নিখিল জননী জানে, সৃষ্টির আগে এই সে অসহ্য প্রসব-ব্যথার মানে।'

নিম্নের চরণ দু'টি নিছক গদ্যাত্মক—

'এমনি আঁধার ঘনতম হ'য়ে
ঘিরিয়া ছিল সেদিন,

উদয়-রবির পানে চেয়েছিলো
জগৎ তমসালীন।'

অথবা—

'ফারানের পর্বত-চূড়া পানে
ভাববাদী বিশ্বের
কর-সঙ্কেতে দিল ইঙ্গিত
ইহারি আগমনের।'

অথবা—

'নসবার দূষিত ছিল বড় বায়ু
মক্কাপুরীর,
নিঃশ্বাসে ছিল বিষের আমেজ
হাওয়ায় সুরীর।

কহিলেন দাদা মুত্তালিব,
"গো হালিমা শুন,
মরু-প্রান্তরে লয়ে যাও মোর
চাঁদেরে পুনঃ!

আবার যেদিন ডাকিব,
আনিবে ফিরায়ে এরে,
মাঝে মাঝে এনে দেখাইয়া যেয়ো
মোর চাঁদেরে!"

'উপরের ছ'টি চরণে, বিশেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে, অমার্জনীয় শিথিলতার পরিচয় আছে। শেষের দিকে ঘটনা-বিন্যাসে বিচ্যুতির পরিচয় আছে। শেষের ক'টি অধ্যায় যে-পরম্পরায় সজ্জিত হয়েছে, তাতে ঘটনার ক্রমধারা বর্তমান নেই। 'শাদী মোবারক', 'খদিজা', 'সম্প্রদান', 'নও-কাবা',—এভাবে পরপর এ অধ্যায়গুলি আসতে পারে না। 'খদিজা', 'সম্প্রদান,' 'শাদী-মোবারক' ও সবশেষে 'নও-কাবা'—অধ্যায়গুলি এভাবে

পারম্পর্য রক্ষা করে পরিকল্পিত হলে ঘটনা-বিন্যাস অর্থপূর্ণ হত। এ-ত্রুটি নিছক সম্পাদনার।

প্রকাশের পূর্বে রচনাগত যে-পরিমার্জনার প্রয়োজন ছিলো, এ গ্রন্থের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নি। আমি এখানে 'মরু-ভাস্কর'-এর উপমা বা রূপালঙ্কার-সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। নজরুল ইসলামের কাব্যে তিন প্রকারের উপমার পরিচয় পাওয়া যায়। এক ক্ষেত্রে অতীত ইতিহাস বা পুরাণ, রূপকের উপাদানে পরিণত হয়। কবি বর্তমানের কোন বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে আমাদের বোধকে তীক্ষ্ণতর করবার জন্য অথবা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আমাদের নিবেদন-বাণীকে অতিরিক্ত বিনত বা গভীর অর্থজ্ঞাপক করবার জন্য, অতীতের ইতিহাসের বা পৌরাণিক ঘটনার সঙ্গে তাকে উপমিত করেন। কবি-কল্পনায় এহেন অতীত স্থায়ী সম্পদযুক্ত, চিরন্তন আদর্শদীপ্ত। 'ইন্দ্র-পতনে' চিত্তরঞ্জনের প্রশংসা ব্যপদেশে বলছেন—

'আজ শুধু জাগে তব অপরূপ
সৃষ্টি-কাহিনী মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ
বাণীর কমল বনে!
কখন তোমার বীণা ছেয়ে গেল
সোনার পদ্ম-দলে,
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন
তোমার ললাট-তলে!
লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি,
বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি
কণ্ঠে গরল দানি,
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা,
যশোদা-দুলাল বাঁশী,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর,
মৃগাঙ্ক দিল হাসি।"

অবশ্য এখানে পৌরাণিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যথার্থ রূপক

হিসেবে নয়, কিন্তু সুনির্দেশ্য লক্ষ্য হিসেবে। অতীতের ঘটনা রূপক হিসেবে স্পষ্ট হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত কাব্য-স্তবকে—

"জয়নাল সম মোরা সবাই
শুইয়া বিমারী খিমার মাঝ,
আফসোস করি কাঁদি শুধু
দুশমন করে লুটতরাজ!
আব্বাস সম তুমি হে বীর
গেণ্ডুয়া খেলি অরি-শিরে
পঁহুছিলে একা ফোরাত-তীরে,
ভাসালে মশক প্রাণ-নীরে।"

'মরু-ভাস্কর'-এ আছে:

"জুলেখার মত অনুরাগ জাগে
হৃদয়ে কেন?
মনে মনে ভাবে, এই সে তরুণ
য়ুসোফ যেন!
দেখি নি য়ুসোফ, তবু মনে হয়
ইহার চেয়ে
সুন্দরতর ছিল না সে কভু
বেহেশ্‌ত বেয়ে
সুন্দরতম ফেরেশ্‌তা আজ
এসেছে নামি,
এল জীবনের গোধূলি লগনে
জীবন-স্বামী।"

এ-ধরনের উপমায় কাব্য-কুশলতার সুযোগ বিশেষ নেই। বস্তু অথবা ঘটনার শিল্পমূল্য নির্ধারণের জন্য অথবা সৌন্দর্য পরিচর্যার জন্য এহেন উপমার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। এগুলো প্রাচীন ঘটনার এক প্রকার পরোক্ষ উল্লেখ মাত্র—ইংরেজী allusion-এর মতো।

কখনও কখনও কবি বর্তমান অবস্থা, জীবন বা আদর্শকে নবতম পরিকল্পনায় সংস্থাপিত করেন। পুরাণ বা ইতিহাসের সংস্পর্শে সে ক্ষেত্রে পরিবেশ নব-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে দীপ্তি পায়। অতীতের মূল্য সেখানে নিছক ইঙ্গিতের জন্য নয়, কিম্বা সাধারণ উল্লেখ হিসেবেও নয়, অতীত সেখানে বর্তমান মুহূর্তের মধ্যে জীবন্ত এবং পরিবেশের সঙ্গে সৌন্দর্য-সম্পর্কে সম্পর্কিত। 'ইন্দ্র-পতন'-এর যে-অংশে চিত্তরঞ্জনের চিতা-ভস্ম গ্রহণ করে ভাগীরথীধারা ধন্য হয়েছে বলে কবি কল্পনা করছেন, অথবা শবদেহ স্পর্শ করেছে বলে শুচিতর ভেবেছেন অগ্নিকে, অথবা সুগন্ধতর ভেবেছেন অগুরু-পুষ্প-চন্দনকে শবদেহের সঙ্গে প্রজ্বলিত হয়েছে বলে, সে অংশ নতুন অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে। এখানে আমরা নতুন পরিকল্পনার পরিচয় চাই। উপমেয়কে গভীরতর ব্যঞ্জনাদীপ্ত ও প্রস্ফুটিত করবার জন্যই উপমানের প্রয়োজন ও সার্থকতা। এ প্রকারের উপমা নজরুল-কাব্যে যথেষ্ট, বিশেষ করে সে ধরনের কবিতায় যেখানে হিন্দু-পৌরাণিক তথ্যের সঞ্চয় আছে। 'মরু-ভাস্কর'-এর পরিবেশ এ ধরনের উপমার জন্য অনুকূল নয়। তা'ছাড়া বিষয়বস্তুই যেখানে অতীত ইতিহাসের, ধর্মাবেগের এবং উপমানের উৎস, সেখানকার রূপকের পরিকল্পনা ইতিহাস- বা পুরাণ-গত হতে পারবে না।

কখনও কখনও সৌন্দর্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রূপকালঙ্কারে বক্তব্যকে সুসজ্জিত করেছেন। বস্তুকে রূপে সাদৃশ্যযোগে ফুটিয়ে তুলেছেন। নজরুল ইস্‌লামের কবি-কর্মের সার্থকতা এ-ক্ষেত্রে অসাধারণ। 'মরু-ভাস্কর'-এ এ ধরনের উপমার প্রাচুর্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করছি :

"অদূরে স্তব্ধগিরি মৌনী অটল তপস্বী প্রায়,
পায়ে তার পুষ্প-তনু-কন্যা যেন উপত্যকায়।
শিরে তার উদার আকাশ,
ব্যজনী দুলায়ে বাতাস।
বয়ে যায় গন্ধ শিলায় ঝর্ণা নহর লহর লালায়,
যেয়ে সে খোশবু পানি ছিটায় ফুলের ফুল-মহলায়!"

অথবা—

"জাগিলেন যবে পূর্ব চেতনা লয়ে,
হেরিলেন চাঁদ পড়িয়াছে খসি যেন রে তাঁহার কোলে,
ললাটে শিশুর শত সূর্যের মিহির লহর তোলে।"

অথবা—

"সাগর শুকায়ে হ'ল মরুভূমি এরি তপস্যা লাগি,
মরু-যোগী হ'ল খর্জুর তরু ইহারি আশায় জাগি'।
লুকায়ে ছিল যে ফল্গুর ধারা মরু-বালুকার তলে
মরু-উদ্যানে বাহিরিয়া এল আজি ঝর্ণার ছলে।
খর্জুর বনে এলাইয়া কেশ সিনানি সিন্ধু-জলে
রিক্তাভরণা আরব বিশ্ব-দুলালে ধরিল কোলে!"

অথবা—

"জরীদার নাগরা পায়ে গাগরা কাঁখে ঘাঘ্‌রা ঘিরা
বেদুইন-বৌরা নাচে মৌ-টুস্‌কির মৌমাছিরা।
শরমে নৌজোয়ানীর নুইয়ে ছিল ডালিম-শাখা,
আজি তার রস ধরে না, তাম্বুলী ঠোঁট হিঙ্গুল মাখা।
আরবের উঠ্‌তি-বয়েস ফুল-কিশোরী ডালিম-ভাঙা
বিলিয়ে রঙ কপোলের আপেল-কানন করছে রাঙা।"

কখনও কখনও উপমানকে বিস্তৃত করেছেন, প্রসারিত করেছেন, ইংরেজীতে যাকে বলে **"In order to dilute rather than to concentrate"**। বস্তু এবং রূপকের মধ্যে পার্থক্য এখানে এই যে, বস্তুর সৌন্দর্য অথবা দীপ্তি নির্ণয়ের জন্য রূপকের প্রয়োজন, কিন্তু রূপকও এ ক্ষেত্রে মেঘমুক্ত শশীর মতো ক্রমান্বয়ে আপনাকে বিকশিত করছে। যেমন—

"পূর্ণ শশীরে ঘিরিয়া যখন সাগরে জোয়ার লাগে,
উথলায় জল যত কলকল তত আনন্দ জাগে!
তেমনি পূর্ণ শশীরে বক্ষে ধরি
আমিনার চোখে শুধু জল ওঠে ভরি।"

অথবা—

"হিয়ায় মিলিল হিয়া,
নদীস্রোত হল খরতর আরো পেয়ে উপনদী প্রিয়া।
স্রোতাবেগ আর রুধিতে পারে না, ছুটে অসীমের পানে,
ভরে দুই কূল অসীম-পিয়াসী কুলুকুলু কুলু গানে।
কোথা সে সাগর কতদূর পথ কোন দিকে হবে যেতে
জানে না কিছুই, তবু ছুটে যায় অজানার দিশা পেতে।"

মনঃকল্পিত কাব্যশোভাও যে কখনও কখনও নিছক অলঙ্কার নয়, কিন্তু অনির্বচনীয়কে চিত্রিত করিবার একটি উপায়, তার পরিচয় আমরা নজরুলের অনেক উৎকৃষ্ট উপমায় পেয়েছি। বস্তু ও রূপকের পাস্পরিক সম্পর্ক-নির্ণয় করে তিনি রসিকচিত্তকে পরিতৃপ্ত করেছেন।

বন-গীতি

নজরুল ইসলামের 'বন-গীতি' গানের বই। অধিকাংশ গানগুলিই হৃদয়াবেগের বিচিত্র পরিচয় বহন করছে। এ আবেগ প্রেমকে, স্বদেশানুরাগকে এবং ভক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গানের বক্তব্যে প্রায়ই একটা গতানুগতিকতা থাকে, বিশেষ করে বাংলা গানে। শিল্পী কথার জগৎ গড়ে তোলেন না, প্রচলিত সুরের লহরীতে, অর্থপূর্ণ বিন্যাসে কতকগুলি শব্দকে সাজিয়ে যান। কবিতায় আবেগের অফুরন্ত রহস্যের সঙ্গে শব্দের যে-সম্পর্ক থাকে, গানে সেই আবেগ ধরা পড়ে সুরের বিচিত্র কল্লোলে। আধুনিক গান শব্দের বোঝায় সঙ্কুচিত হয়ে অগ্রসর হয়, কিন্তু প্রেম এবং ভক্তির ক্ষেত্রে এ সমস্ত শব্দ নতুন বাণীমূর্তি তৈরী করে না। কথাগুলি কেমন যেন অর্থের দিক থেকে দীন এবং বিশীর্ণ। রেকর্ডের গান বা ফিলমের গান শুনলেই এ সত্য আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। রবীন্দ্রনাথের বাণী এর ব্যতিক্রম। সাধারণ শব্দও নবতম ধ্বনি ও ব্যঞ্জনায় অপূর্ব হয়ে উঠেছে। নজরুল ইস্‌লামের গান রেকর্ডের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিখিত হলেও অনেক সময় শব্দে, উপমায়, বর্ণে ও বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের গানের মতই প্রাণোচ্ছল। স্বল্প-রেখায় সম্পূর্ণ চিত্রও যেমন ইঙ্গিতে পরিচ্ছন্নভাবে ফুটে ওঠে, গানের শব্দমূর্তির পরিসরেও জীবনের বিশেষ অবস্থাকে পূর্ণতা-দ্যোতক ভাবেই পাই।

'বন-গীতি'র অনেকগুলি প্রেমের গানে কল্পনার দিন-রাত্রিতে তন্দ্রাবিমুক্তা প্রিয়তমার চাঞ্চল্য ও শিহরণের সংবাদ আছে। কল্পনার সত্য আন্তরিকতার স্পর্শে মর্যাদাবান হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ একটি গান উদ্ধৃত করছি। অধিকারের দাবী থেকে উদ্ভূত নিশ্চিত বিশ্বাস এবং উদাসীন মনের শান্ত বিহ্বলতা গানের সুরের বিলম্বিত লয়ের মধ্যে ধরা পড়েছে। গানটি এই—

'পাষাণের ভাঙালে ঘুম
কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়।

গলিয়া সুরের তুষার
গীতি-নির্ঝর বয়ে যায় ॥
উদাসীন বিবাগী মন
যাচে আজ বাহুর বাঁধন,
কত জনমের কাঁদন
ও পায়ে লুটাতে চায় ॥
তোমার চরণ-ছন্দে মোর
মুঞ্জরিল গানের মুকুল,
তোমার বেণীর বন্ধে গো
মরিতে চায় সুরের বকুল।
চমকে ওঠে মোর গগন
ঐ হরিণ চোখের চাওয়ায় ॥'

অন্য একটি গানে কবি বলছেন যে, হৃদয়ে যার অবস্থান তাকেই তিনি হারিয়েছেন, তাই 'গানের প্রদীপ' জ্বেলে তাকে অন্বেষণ করতে হচ্ছে। সে এসেছিলো একদিন 'স্নিগ্ধ-জ্যোতি' নিয়ে আর আজ তাকে অন্বেষণ-ব্যাকুল দৃষ্টি দিয়ে সন্ধান করতে হচ্ছে অসীম অন্ধকারে। চিরকালই দেখা যায় যে, মিলন-বেলাভুমেই "বিরহের রোদন-ধ্বনি" উচ্চারিত হয়।

আর একটি গান উদ্ধৃত করছি। গানটিতে একটি সজল স্নিগ্ধতা আছে:

'কে এলে মোর চির-চেনা
অতিথি দ্বারে মম।
ফুলের বুকে মধুর মত
পরাগে সুবাস সম ॥
বর্ষা শেষে চাঁদের মতন
উদয় তোমার নীরব গোপন,
জ্যোৎস্না-ধারায় নিখিল ভুবন
ছাইয়া অনুপম ॥
হৃদয় বলে, চিনি চিনি
আঁখি বলে, দেখি নি তায়,
মন বলে, প্রিয়তম ॥'

কয়েকটি গানে আবার গতানুগতিকতা অত্যন্ত বিমর্ষভাবেই মূর্ত হয়েছে। যেমন—

'কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল।
টগর যুঁথি, বেলা মালতি
চাঁপা গোলাপ বকুল।
নার্গিস ইরাণী গুল্॥'

অথবা—

'কোকিল, সাধিল কি বাদ
নিশি অবসান হ'ল
না মিটিতে সাধ॥'

অথবা—

'দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়,
কে আজি সমাধিতে মোর।
এত দিনে কি আমারে
পড়িল মনে মনোচোর॥'

উপমা ও রূপকের সাহায্যে রহস্যঘন চিত্র নজরুল ইস্‌লাম এঁকেছেন অনেক কবিতায় ও গানে। রূপ ও অরূপ, বস্তু ও কল্পনা এবং সত্য ও স্বপ্ন ওতপ্রোত রয়েছে ভাষায় ও ভাব-রূপে। সত্যিকারের রূপক যে নিছক অলঙ্কার নয়, বরঞ্চ কবি-কল্পনার ভাব এবং ভাষার মিলিত বিগ্রহ, নজরুল ইস্‌লামের রচনায় কখনও কখনও তার পরিচয় পাই। একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে—

'ও-পারে লুকায়ে আঁধার
গভীর মন বন-ছায়,
আকাশে হেলান দিয়ে
আলসে পাহাড় ঘুমায়।
ঘুমায় দূরে সে কোন গ্রাম
বাসরে পল্লীবধূর প্রায়।
ও-পারে ধূধূ বালুচর
যেন নদীর আঁচল লুটায়।

ছাড়ি, এ সুখ-বাস
চলেছ কোথায় গো নেমে ॥'

একটি ভক্তিভাবের গানের উল্লেখ করে 'বন-গীতি' প্রসঙ্গ শেষ করব। ইস্‌লামের নিশ্চিত বিশ্বাসবাদ এবং পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে গানের কথাগুলি অবশ্য অত্যন্ত আপত্তিজনক। কবি হিন্দুদেবী কালীকে মানব-জীবনের স্থিতি, সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের প্রতীক বলে কল্পনা করেছেন। এখানে পরম আন্তরিক একটি সঙ্কোচহীন বাণী-মূর্তির প্রকাশ লক্ষ করি। নিকষে সোনার রেখার মতো 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' কবি আলোর খেলা দেখেছেন। গানটি এই—

'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন ॥

আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু, রবি-শশী দোলে—
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক
ঐ স্নিগ্ধ-বিরাট নীল-গগন ॥

পাগলী মেয়ে এলোকেশী
নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ,
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায়
লীলার রে তার নাইকো শেষ ॥

সিন্ধুতে ঐ বিন্দুখানিক
তার ঠিকরে পড়ে রূপের মাণিক
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না
মা আমার তাই দিগ্‌বসন ॥'

রূপ ও রূপকের এবং নিষ্ঠা ও হৃদয়াবেগের এত চমৎকার মিলন ভক্তিভাবের গানেও বড় একটা দেখা যায় না।

জুলফিকার

নজরুল ইসলামের 'জুলফিকার'-এর গানগুলি ইসলাম-সংক্রান্ত। কবি মুসলমানদের বর্তমান বিমর্ষ ও হতচেতন অবস্থার কথা চিন্তা করে ব্যাকুল হয়েছেন। যে-কারণে এক সময় সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য তাদের এসেছিল, সে-কারণগুলি বর্তমানেও স্পষ্ট হোক—কবির কাম্য তাই। নিছক কাব্য-সৌন্দর্যের দিক থেকে বিচার করতে গেলে এ প্রকৃতির মনোভাবে সমৃদ্ধিমান কাব্যগত আবেগ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ প্রকৃতির মনোভাব জীবনতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে জীবনের উপর আরোপিত ধর্মাদর্শ বা রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সাধারণত সম্পর্কিত হয়। আমরা উদাহরণ-স্বরূপ হেমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ-প্রকাশক কবিতাগুলোর উল্লেখ এখানে করতে পারি। 'জুলফিকার'-এর কয়েকটি গানের আংশিক উদ্ধৃতি দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে, যেমন—

"দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ্ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল॥

গাজী মুস্তাফা কামালের সাথে
জেগেছে তুর্কী সুর্খ্-তাজ,
রেজা পহ্লবী সাথে জাগিয়াছে
বিরাণ মুলুক ইরানও আজ,
গোলামী বিসরি, জেগেছে মিসরী
জগলুল সাথে প্রাণ মাতাল।"

অথবা—

"কোথায় সে বীর খালেদ,
কোথায় তারেক মুসা,
নাহি সে হজরত আলী
জুলফিকার নাহি॥"

অথবা—

"জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান।
করিল জয় যে তেজ লয় দুনিয়া জাহান॥"

অথবা—

"আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়॥
আমার কিসের শঙ্কা
কোরআন আমার ডঙ্কা,
ইস্লাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়॥"

এগুলো পাঠ করলে মনে হয় যে, কবির শুধু কতকগুলো বক্তব্যই আছে এবং সে বক্তব্যগুলির সঙ্গে শব্দ-বিন্যাস, ধ্বনি এবং উপমা-রূপকের আবেগগত কোন সম্পর্ক ঘটে নি। তবে প্রচারমূলক সঙ্গীতে কথাটি প্রধান এবং এ কথাকে স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ করবার জন্য কবি বিশেষ কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। এ শব্দগুলো এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে শ্রোতা সাধারণ কোন প্রকার চিন্তা না করে এবং সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় আচ্ছন্ন না হয়ে সহজেই বক্তব্যের দ্বারা উদ্দীপ্ত হতে পারে। বক্তব্যের সে উদ্দীপনা নজরুল ইসলামের এ গানগুলোতে আছে, যেমন আছে মোজাম্মেল হকের 'জাতীয় ফোয়ারা'য় অথবা ইসমাইল হোসেন শিরাজীর 'অনল-প্রবাহ'-তে।

'জুলফিকার'-এর কিছু গান মুর্শিদী-মারফতী ধরনের, যেমন :

"আমার মনের মসজিদে দেয়
আজান হাজার মোয়াজ্জিন্,
প্রাণের 'লওহে' কোরান লেখা
রুহ্ পড়ে তা রাত্রিদিন॥"

অথবা—

আহ্মদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ্ মন।
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন॥"

এ গানগুলোর কাব্য-বিচার না করাই সঙ্গত। এগুলোর মূল্য তত্ত্ব-রসিকদের কাছেই।

কতকগুলো গানে অনিবার্যভাবে আমাদের বাংলাদেশের সমাজ, সংসার এবং পরিবেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং সে কারণেই সেগুলো মধুর হয়েছে। যে-জীবন কবির কাছে অত্যন্ত সত্য এবং নিবিড়ভাবে অনুভূত, সে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আপন ধর্মাবেগকে প্রকাশ করেছেন। যেমন:

"তোরা দেখে যা, আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে ॥
যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে ॥"

মধু পূর্ণিমার চাঁদ অথবা সকালবেলার সূর্য আমাদের কাছে যত সুন্দর ও তৃপ্তিসঞ্চারী অন্য কোনও দেশের অধিবাসীর কাছে ততটা নয়। মনে রাখা দরকার যে, আরব দেশে সূর্য কখনও সুন্দরের প্রতীক হতে পারে না।

অন্য এক ক্ষেত্রে কবি বলছেন,

"পথ সে দেখায় ঈদের চাঁদের পিদিম নিয়ে হাতে
হেসে হেসে দাঁড় টানে চার আসহাব তার সাথে।
নামাজ রোজার ফুল ফসলে শ্যামল হ'ল মরু
প্রেমের রসে উঠ্‌ল পুরে নীরস মনের তরু।
খোদার রহম এলরে আখেরি নবীর বেশে ॥"

এখানে নৌকার রূপক এবং প্রদীপ ও ফুল-ফসলের রূপকের মাধ্যমে কবি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, আনন্দ এবং সজীবতার পরিচয় সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এগুলো হওয়ার কারণ-সম্বন্ধে কবি বলছেন,

"দূর আরবের স্বপন দেখি বাঙলা দেশের কুটির হ'তে
বেহুঁশ হ'য়ে চলেছি যেন কেঁদে কেঁদে কাবার পথে।"

একটি গানে বাংলাদেশের গ্রাম্যজীবনের কর্মধারা এবং পরিবেশকে কবি পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছেন আপন তত্ত্বজিজ্ঞাসায়:

"আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে
ফল্‌বে ফসল বেচ্‌ব তারে কিয়ামতের হাটে ॥

পত্তনীদার যে এই জমির
খাজনা দিয়ে সেই নবিজীর
বেহেশ্‌তেরই তালুক কিনে বস্‌ব সোনার খাটে ॥

মস্‌জিদে মোর মরাই বাঁধা হবে না'কো চুরি।
'মনকের' 'নকির' দুই ফেরেশ্‌তা হিসাব রাখে জুড়ি।
রাখব হেফাজতের তরে
ইমানকে মোর সাথী ক'রে
রদ্ হবে না কিস্তি, জমি উঠ্‌বে না আর লাটে ॥"

আর একটি গানের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি, যেখানে ইংরেজীতে যাকে বলে **element of surprise** অর্থাৎ বিস্ময়বোধ, সেই বিস্ময়বোধের মধ্য দিয়ে এবং অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কবি প্রগাঢ় উপলব্ধির ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছেন,

"পু'ড়ে মরার ভয় না রাখে,
পতঙ্গ আগুনে ধায়,
সিন্ধুতে মেটে না তৃষ্ণা,
চাতক বারি-বিন্দু চায়।
চকোর চাহে চাঁদের সুধা,
চাঁদ সে আস্‌মানে কোথায় ;
সুরুয্ থাকে কোন্ সুদূরে,
সূর্যমুখী তারেই চায় ;
তেমনি আমি চাহি খোদায়
চাহি না হিসাব ক'রে ॥"

ফণি-মনসা

'ফণি-মনসা'-পাঠকালে যে-কোনো পাঠকের মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এটা কি কাব্যগ্রন্থ না অন্য কিছু? কবি কি করতে চেয়েছেন এবং কিই বা করতে চান নি? সাধারণত আধুনিক কাব্যবিচারে আমরা যে-সমস্যার সম্মুখীন হই, এক্ষেত্রে সমস্যাটি তার বিপরীত। দুর্বোধতার অভিযোগ থেকে আধুনিক কবিকে আমরা যেখানে রক্ষা করতে চাই, নজরুল ইসলামকে আমাদের সেখানে রক্ষা করতে হবে তরলতা এবং অতি স্বচ্ছতার অভিযোগ থেকে। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছেন বলে আধুনিক কবিদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ যথেষ্ট; কিন্তু নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ তার সাংবাদিকতার জন্য। মানুষের অতি সাধারণ সমষ্টিগত অনুভূতির কাছেই তিনি আবেদন এনেছেন।

নজরুল ইস্‌লামের অনেক কবিতা সাময়িক, বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের এবং যুগের প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আজকের ঘটনার সঙ্গে বা আবেগের সঙ্গে যে-কাব্যের সম্পর্ক নেই তাকে অস্বীকার করবার প্রবণতা কখনো কখনো দেখা যায়, কিন্তু বিগত দিনের ঘটনার সঙ্গেই যে-কাব্যের একমাত্র সম্পর্ক তাকে আমরা সর্বমুহূর্তেই অস্বীকার করি। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যয়-সাহচর্যের জন্য কখনো কখনো কোনো কবিতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু ভবিষ্যতে কবিতা যদি পঠিত হয়, তবে এ সাহচর্য ব্যতিরেকেই পঠিত হবে। রাজনৈতিক যে-আদর্শের সঙ্গে আমাদের মতের ঐক্য নেই, সে আদর্শ যদি কোনো কবিতায় ব্যাখ্যাত হয় তবে সে কবিতাকে আমরা মূল্য দেব না। অধিকাংশ পাঠক কবিতায় ইম্‌পীরিয়ালিজম্ বা সোস্যালিজম্-এর সন্ধান করে না। এখানে প্রকৃত প্রস্তাবে জিজ্ঞাস্য এ নয় যে, ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িক, কিন্তু জিজ্ঞাসা মূলত এই যে, কোনটা লোকোত্তীর্ণ এবং চিরস্থায়ী। আপন যুগের সঙ্গে যে-কবির কোনো সম্পর্ক নেই, তাঁর বক্তব্যও মূল্যবান এবং শ্রুতিগ্রাহ্য হতে পারে; অন্যপক্ষে যে-কবি শুধু সাময়িক ধারণা-বাসনার সঙ্গেই সম্পর্কিত তাঁর সব রচনাই মূল্যহীন হয়তো হবে না। টেনিসন তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা সার্থক প্রতিনিধিরূপে যুগের উৎকণ্ঠা, বিশ্বাস

এবং ধর্ম-জিজ্ঞাসাকে 'In Memoriam'-এ রূপ দিয়েছেন। সে যুগের সন্দেহ বা বিশ্বাস তাঁর কাব্যে অবিনশ্বরতা পেয়েছে, যদিও পরবর্তী যুগে এ সন্দেহ-বিশ্বাসকে মানুষ অতিক্রম করেছে বা হয়তো তার প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে।

নজরুল ইসলামের 'ফণি-মনসা'র কবিতাগুলোর সম্পর্কে এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এগুলো কবিতা নয়। নিছক সাময়িক এবং ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার নিয়েই এগুলো লেখা, এ ছাড়া শিল্প-সাধনার দিক থেকে মহত্তর কোনো উদ্দেশ্যই কবির নেই। বিস্মিত হবার ব্যাপার এই যে, সত্যিকারের কবিতা লিখবার ভানও কবি করেন নি। কিন্তু তবুও যেন কবির অজ্ঞাতসারেই কবিতা লিখিত হয়েছে, প্রসঙ্গক্রমে হঠাৎ যেন কাব্য-সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—

"ঊষায় যারা চম্‌কে গেল তরুণ রবির রক্ত রাগে,
যুগের আলো! তাদের বল, প্রথম উদয় এম্‌নি লাগে!
সাতরঙা ঐ ইন্দ্রধনুর লাল রংটাই দেখল যারা,
তাদের গাঁয়ে মেঘ নামায়ে ভুল ক'রেছে বর্ষা-ধারা।"

[যুগের আলো]

উদ্ধৃত অংশে গভীরতর উৎস থেকে, রাজনীতির আচ্ছন্নতা ভেদ করেই প্রাণের বাণীর পরিচয় এসেছে।[1]

আমি এখানে ইংরেজ কবি কিপ্‌লিং-এর কিছু কবিতার উল্লেখ করবো, যে-সমস্ত কবিতার উপলক্ষ হচ্ছে সাময়িক কোনো দুর্যোগ এবং রাজনীতি বা সমাজনীতি। প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংস এবং সে-সময়কার চিন্তাগত বিপর্যয়ের পরিচয় তিনি দিয়েছেন Epitaphs of the War (1914-18) নামক কাব্য-কথায়। এখানকার কবিতাগুলোতে মৃত্যুর স্তব্ধতা জীবনকে যে-নতুন মূল্যমান দিয়েছে, বিস্ময় ও বেদনার মধ্যে তার পরিচয় আছে। যেমন—

"My name, my speech, myself I had forgot.
My wife and children came—I knew them not.
I died. My mother followed. At her call
And on her bosom I remembered all."

কবিতাটির নাম 'Shock'—মানসিক আঘাত বা বিহ্বলতা। যুদ্ধে যে-সৈনিক এসেছে, যুদ্ধের ভয়াবহতায় সে বিস্মৃত হয়েছে সমস্ত কিছু, আপন অস্তিত্বকেও। তাঁর মৃত্যু হল এবং সন্তানের মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে না

পেয়ে মাতাও তার অনুগমন করলেন। মৃত্যু-দেশে মাতার বক্ষোলগ্ন হয়ে তার স্মরণে এলো আপন পরিজন এবং সমস্ত সংসারের কথা। কবি এখানে দুর্লভ মানবীয় বোধের পরিচয় দিয়েছেন দুই বিরুদ্ধ আবেগের সংঘর্ষে, বৈপরীত্যে এবং বেদনায়।

অন্য একটি কবিতায় পথহীন বিজন প্রান্তরের একটি কবর, পক্ষতাড়নারত পেলিকানকে লক্ষ করে বলছে,

> "The blown sand heaps on me, that none may learn
> When I am laid for whom my children grieve—
> O wings that beat at dawning ye return
> Out of the desert to your young at eve!"

এখানকার স্থির-স্থায়ী আবেগ হচ্ছে সন্তান-বাৎসল্য। সন্তান তার পিতার বালুকাকীর্ণ কবরের সন্ধান পাবে না, তাই পেলিকানকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যেন সে সন্ধ্যায় তার আপন সন্তানের কাছে ফিরে যায়। সন্তান-বাৎসল্যে তার দোসর আছে, এই তৃপ্তিতেই মৃত সৈনিক যেন আপন কবরের নিশ্চিহ্নতাকেও মেনে নিতে পারবে।

কিপলিং-এর অন্য একটি কবিতার উল্লেখ এখানে করবো। কবিতাটির নাম 'Recessional'। এ-কবিতাটিতে কবি সাম্রাজ্যবাদিতাকে আবেগের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন; কিন্তু অধিকার-লিপ্সা সাম্রাজ্যবাদের প্রধান শক্তি হলেও এবং এ কারণে সাম্রাজ্যবাদ মুক্তিকামী পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে গ্লানিকর এবং ঘৃণ্য বলে গৃহীত হলেও শুধুমাত্র আত্মনিবেদনের আন্তরিকতা এবং গীর্জায় উচ্চারিত স্তোত্রের বাণীভঙ্গীর জন্য, এ কবিতাটি সাময়িকতার ঊর্ধ্বে উঠেছে। কবিতাটির অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি—

> "God of our fathers, known of old,
> Lord of our far-flung battle-line,
> Beneath whose awful Hand we hold
> Dominion over palm and pine—
> Lord God of Hosts, be with us yet,
> Lest we forget—Lest we forget!"

কিপলিং-এর এই অবিনশ্বর আবেগ পরিপূর্ণভাবে না হলেও এবং

সর্বক্ষেত্রে না হলেও কিছুটা লঘুভাবে কোথাও কোথাও নজরুল-কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে নজরুল ইস্‌লামের কাব্যে সাময়িকতা মূল্যহীন হয় নি এ কারণে যে, এখনো তার পরিবর্তন ঘটে নি। অসাম্য, ভেদবুদ্ধি এবং ক্ষেত্র-ভেদে মানুষের প্রতি অবহেলা বা শ্রদ্ধা আজও নৈমিত্তিক সত্য, তাই সাধারণের কাছে শুধুমাত্র সাময়িকতার জন্যই নজরুল ইস্‌লামের অনেক কবিতা মূল্যবান বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে। যেমন 'ফণি-মনসা'র 'শ্রমিক-মজুর', 'রক্তপতাকার গান', 'জাগরূক-তূর্য'—এ সমস্ত কবিতা। তবে মনে রাখতে হবে, এ কবিতাগুলো প্রচারের উদ্দেশ্যেই লিখিত। মানুষের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গেই এ-কবিতাগুলোর সম্পর্ক, গভীরতর ব্যঞ্জনা এসব ক্ষেত্রে কোথাও নেই। আমি পূর্বেই বলেছি যে, এগুলো যে কবিতা নয়, তা ভাবার চাইতে একথা ভাবাই ভাল যে, এখানে কবিতা লিখবার ভানও কবি করেন নি। 'শ্রমিক-মজুর' থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করলে কথাটি স্পষ্ট হবে :

> "ভদ্র সমাজে শ্রমিকের কথা 'কমিক' গানের মত
> ভব্যের মত মোরা নহি সু-সভ্য সংযত।
> আচারে পোষাকে আমাদের নাহি ভদ্রের মতো চাল,
> চা'ল চুলা নাই দারিদ্র্যে দুখে নাচার ও নাজেহাল।
> আমাদের বাসা আমাদের ভাষা নিতা নোংরা, দাদা!
> তবুও বলিব, বাহিরে আমরা নোংরা, ভিতরে সাদা।
> ভিতরের কালি ঢাকিতে তোমার পর হ্যাট, প্যাণ্ট, কোট,
> শ্রমিকেরে যারা গরু বলে, মোরা তাদের বলি 'হি-গোট'।

সময় এবং কালের বিস্তৃত প্রসার-সম্পর্কে কবির সচেতনতা থাকা বাঞ্ছনীয়, কেননা সত্যিকারের কবি একই সঙ্গে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবেন। 'ফণি-মনসা'য় নজরুল ইস্‌লামের এ সচেতনতা আছে বলে মনে হয় না। তিনি এখানে ছন্দোবদ্ধ পদরচয়িতা, ইংরেজীতে যাকে বলে **verse** সেই **verse**-এর স্রষ্টা। নিছক **verse**, যা বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের ক্ষেত্রে একান্ত মূল্যবান, 'ফণি-মনসা'য় নজরুল ইস্‌লাম তারই কবি।

ঈশ্বর গুপ্ত
বিহারীলাল
রবীন্দ্রনাথ
কায়কোবাদ
এবং অন্যান্য

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু আঠারো শতকেই এ শহর অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে ভারতের রাজধানী হবার মর্যাদা পায়। ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে কলকাতা সরকারী-রাজস্ব বিভাগের কেন্দ্র হয়। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতাকে আমরা সম্পূর্ণ আধুনিক শহররূপে পাই। কলকাতা তখন দেশের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র হয়েছে; সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনেরও উৎসমূল হয়েছে।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা, এবং শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা কলকাতাকে দেশের প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র রূপে মর্যাদা দিল। উনিশ শতকের সর্বপ্রকার ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষাগত এবং সাহিত্য-আন্দোলনের কেন্দ্র হল কলকাতা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য গ্রাম্য পরিবেশে প্রধানত গ্রাম্য কবিদেরই রচনা। যে সময় এ সাহিত্য রাজ-আনুকূল্যে সমৃদ্ধিমান হচ্ছিলো তখনও এর মৌলিক গ্রাম্য দেশজভাব নষ্ট হয় নি। কিন্তু উনিশ শতকের নতুন সাহিত্য নাগরিকজনের জন্য লেখা। সাহিত্যিক এবং কবিরাও ছিলেন নাগরিক সংস্কৃতিপুষ্ট। নাগরিক সংস্কৃতিপুষ্ট বলেই উদার এবং প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁরা সাহিত্য-সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। পরিমার্জিত রুচি-সঙ্গত সহজ ভাষায় তাঁরা নতুন সাহিত্য-সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করলেন।

নতুন সাহিত্য গড়ে উঠতে লাগলো সমাজ এবং মানবজীবনকে কেন্দ্র করে। পূর্বেকার সাহিত্যে মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মের কাহিনী পেয়েছি। নতুন সাহিত্য প্রধানত জীবনমূলক হল কিন্তু ধর্মও-যে তার প্রতিপাদ্য রইলো না তা নয়, কিন্তু তা মনসা-চণ্ডীর সাহিত্য হল না। গ্রাম থেকে শহরে এলো সাহিত্য এবং এ-কারণে সাহিত্যের কিছুটা সরলতা নষ্ট হল। তবে এর পরিবর্তে সাহিত্যে এল নতুন স্বাদ এবং নতুন কৌতূহল। নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠলো গ্রাম্যজীবনের পূর্বতন সমৃদ্ধিকে ভেঙে

দিয়ে, গ্রামের কুটিরশিল্প ভেঙে পড়লো, দেশের সমস্ত পুঁজিই জমা হল শহরে।

গ্রামের সামন্ত প্রথা এবং উন্নত কৃষি-জীবনের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে নগরে ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী এবং নতুন শ্রেণীর বিত্তশালী মহাজনদের সৃষ্টি হল। নগরে নগরে নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠলো। বলদৃপ্ত মধ্যবিত্ত সমাজ আপনাদের 'ভদ্র' নামে আখ্যাত করলো এবং নতুন মধ্যবিত্ত সভ্যতার গোড়াপত্তন করলো। এটা অবশ্য হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-বিকিরণকেন্দ্র কলকাতায় এ সমাজের প্রতিপত্তি ছিলো যথেষ্ট। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে প্রতীচ্য আদর্শ দ্বিধাদ্বন্দ্বহীনভাবে এ দেশে প্রসার লাভ করে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং কিছু পরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ। যা হোক, ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে যে-সমস্ত কবি সাহিত্যিককে আমরা পাচ্ছি, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন প্রতিপত্তিসম্পন্ন হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ-সম্ভূত।

মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের প্রত্যক্ষ জাগরণ ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে আমরা পাই না। এই সালে নবাব আবদুল লতীফ কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' (Mohamedan Literary Society) নামে একটি সাহিত্য-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

নতুন আদর্শের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আদর্শেও পোষকতা যে না চলছিলো তা নয়। কিন্তু তা প্রাণময় হতে পারে নি, তার কারণ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিতক্ষেত্র থেকে অবলম্বন করবার মতো কিছু এ-পথের যাত্রীদের ছিলো না। প্রাচীন সাহিত্য আর জাগ্রত ছিলো না। কবি-গানের মধ্যেই তার বিমর্ষ পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এ-সময়কার একটি বিশেষ ঘটনা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। তা হচ্ছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রকাশ। শ্রীরামপুর মিশনারীদের চেষ্টায় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিলো। জন ক্লার্ক মার্শম্যান এর সম্পাদক ছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁর সহকারী ছিলেন। 'সমাচার দর্পণ'-এর দ্বারাই বাংলা সাংবাদিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটে। এর পূর্বে

অবশ্য ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'বাঙ্গাল গেজেট'-নামক ক্ষণস্থায়ী একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিলো। খ্রীস্টানধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারী-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বলে 'সমাচার দর্পণ'-এর পৃষ্ঠায় হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু সমাজের বিরূপ সমালোচনা ছাপা হতো। এর প্রতিবিধানের জন্য রাজা রামমোহন রায় এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের চেষ্টায় ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে 'সংবাদকৌমুদী' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এবং ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে নীলরতন হালদারের সম্পাদনায় যথাক্রমে 'সমাচারচন্দ্রিকা' এবং 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর' প্রকাশিত হয়।

কলকাতার নতুন সাহিত্য-জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর দান যথেষ্ট। একদিন 'প্রভাকর' বাংলা সাহিত্যের দিক্-নির্দেশ এবং নীতি-নির্ধারণ করতো। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনাকে অবলম্বন করে 'প্রভাকর'-এ নতুন নতুন রসপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এছাড়া প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং সে সঙ্গে তাঁদের জীবনী 'প্রভাকর'-এ ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'প্রভাকর'-এর অন্য এক কীর্তি নতুন লেখক সৃষ্টি। বাংলাদেশের অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক 'প্রভাকর'-এ শিক্ষানবীশ ছিলেন। রঙ্গলাল, অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রভাকর'-এর নিকট বিশেষ ঋণী।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পিতার নাম হরিনারায়ণ দাস। তিনি তাঁর পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর জন্ম হয় ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে (বাংলা ১২১৮ সালে) কলকাতার নিকটস্থ কাঁচড়াপাড়া গ্রামে। কলকাতার জোড়াসাঁকোয় তাঁর মাতামহের নিবাস ছিলো। সুতরাং শৈশব, কৈশোর এবং ক্রমান্বয়ে জীবনের সমস্তকাল তিনি কাটিয়েছিলেন কলকাতায় এবং তার আশেপাশে। ঈশ্বরচন্দ্র নাগরিক সভ্যতায় লালিত-পালিত। নাগরিক জীবনে উল্লাস যেমন থাকে, বিকারও থাকে তেমনি। বরঞ্চ অধিকাংশ সময় বিকারই অধিকতর দৃশ্যমান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র আজীবন নাগরিক সভ্যতার এ-বিকারকে ব্যঙ্গ করেছেন।

স্কুল-কলেজে নিয়মতান্ত্রিক বিদ্যাচর্চা ঈশ্বরচন্দ্র করেন নি। অমনোযোগী এবং অনাবিষ্ট বালক ঈশ্বরচন্দ্র পূর্বপুরুষদের সঙ্গীত-রচনার দক্ষতা পেয়েছিলেন। এ ক্ষমতাকে সম্বল করে বাংলা কাব্যক্ষেত্রে তিনি যে-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার তুলনা নেই। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, 'বলিতে গেলে শিক্ষা যাহাকে বলে ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কিছুই পান নাই; ইংরাজী শিক্ষা তো হইলই না, বাঙ্গালা নিজেও পড়িয়া যাহা শিখিলেন তাহাই একমাত্র সম্বল হইল। কিন্তু এই সম্বল লইয়াই তিনি অচিরকালমধ্যে বাঙ্গালার সুকবি ও সুলেখকরূপে পরিচিত হইলেন।'

ঈশ্বর গুপ্তের কর্মজীবনের পরিচয়সূত্রে আমরা জানতে পারি যে, পাথুরিয়া-ঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে তিনি ২৮-এ জানুয়ারী ১৮৩১ সালে 'সংবাদপ্রভাকর' প্রকাশ করেন। 'সংবাদপ্রভাকর' প্রথমে সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। ২৫-এ মে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুতে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে পত্রিকাটি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের সাপ্তাহিক 'সংবাদরত্নাবলী'র সম্পাদকও তিনি ছিলেন। 'রত্না-বলী'র প্রকাশের তারিখ ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের ২৪-এ জুলাই। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রভাকর প্রেস থেকে ঈশ্বর গুপ্ত 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রকাশ করেন। 'পাষণ্ডপীড়ন' অল্পকাল পরেই বন্ধ হয় এবং তার স্থান অধিকার করে 'সংবাদ-সাধুরঞ্জন'।

সাময়িক ঘটনা নিয়ে ব্যঙ্গরসাশ্রিত যথেষ্ট চটুল কবিতা তিনি লিখেছেন। তা ছাড়া নৈতিকতা, দেশপ্রেম, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর অনেক কবিতা আছে। কিন্তু এ সমস্ত কবিতা সাংবাদিকতার ঊর্ধ্বে ওঠে নি। ব্যবসা-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সাংবাদিক, কার্যক্ষেত্রেও তাই। অনুপ্রাস, যমকালংকার ইত্যাদির প্রয়োগেও তাঁর আদর্শ ছিলো ভারতচন্দ্র, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতো সুচারু শিল্পী তিনি ছিলেন না। গ্রাম্য পাঁচালী এবং শহুরে কবিগান থেকে প্রধানতঃ ঈশ্বর গুপ্ত আপন বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পরিহাস-রসিকতা গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা, যুবা বয়সে তিনি 'খেউড়' ও 'হাফ-আখড়াই'তে যোগ দিতেন।

বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে সমাজসচেতনায়,

প্রতিদিনকার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা-সমৃদ্ধি সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশের মধ্যে, শব্দ ব্যবহারের বিচিত্র কৌশলের মধ্যে এবং মাতৃভূমি-প্রীতিতে। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে এ সমস্ত-কিছু অল্প-বিস্তর আমরা পাই। কবিতায় কথ্য বাচনভঙ্গীর প্রয়োগ এবং প্রতিদিনের বাক্যালাপকে কবিতায় গ্রহণ করবার প্রথম সার্থক চেষ্টা আমরা ভারতচন্দ্রের রচনায় দেখি। ভারতচন্দ্র প্রবাদ-বাক্য, সুভাষণ, কুশলী বাক্-চাতুর্য—নাগরিক জীবনের সকল সময়ের সংলাপ থেকে এ-সমস্ত আহরণ করেছিলেন এবং দক্ষতার সঙ্গে কবিতায় প্রয়োগ করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে-কৌশলের প্রথম সূত্রপাত, ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে তারই বিস্তারিত পরীক্ষা আমরা লক্ষ করি। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতায় এ-ভাষা অসাধারণ ক্ষমতায় সবল হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক ভাষার শব্দে অর্থ আছে আবার ধ্বনি আছে। ঈশ্বর গুপ্ত প্রাকৃত-বাংলা শব্দের ধ্বনি নিয়ে শিল্প রচনা করেছেন, যার ফলে সাধারণ মানুষের প্রাণের সহজ ভাষায় তাঁর সমস্ত বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য লক্ষযোগ্য :

"ব্যঙ্গ কবিতায় এ-ভাষার জোর কত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা থেকে তার নমুনা দিই। কুইন ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করে কবি বলেছিলেন,

তুমি মা কল্পতরু,
আমরা সব পোষা গোরু
শিখি নি শিঙ-বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না ;
আমরা ভুষি পেলেই খুশি হব
ঘুষি খেলে বাঁচব না।

কেবল এর হাসিটা নয়, এর ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ্য করে দেখবার বিষয়।"

ঈশ্বর গুপ্তের পরিহাসের বিষয় ছিলো সাধারণত সমসাময়িক সমাজ। বিশেষ করে সমাজে যে নতুন রীতিনীতির আমদানি হত তাকে তিনি নির্বিচারে ব্যঙ্গ করেছেন। পাশ্চাত্য আদর্শের বিকৃত অনুসরণকে তিনি

এদেশের জন্য গ্লানিকর মনে করেছেন। এ আদর্শকে তিনি পরিহাস করেছেন সত্য কিন্তু সে পরিহাস অনেকটা উচ্চহাস্যের মতো। এর পশ্চাতে অস্বীকার করবার প্রবণতা ছিলো না। তিনি যুগের গতিধারার বিরুদ্ধতা করেন নি, কিন্তু নির্বিকার ঔদাসীন্যেও তাকে গ্রহণ করেন নি। তাঁর পরিহাসে এটাই স্পষ্ট হয় যে এ নতুন সংস্কৃতি তাঁর রুচিসম্মত নয়। কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজ-যে এটাকে অবলম্বন করবেই তাও তিনি জানতেন। এ-কারণেই তাঁর পরিহাসে বিদ্বেষ নেই, কারো প্রতি কোনো প্রকার অনিষ্ট কামনা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র একে বলেছেন 'ঘোর ইয়ারকি'। এ-পরিহাস নিছক রঙ্গ-কৌতুক এবং আনন্দ। গভর্নর জেনারেল, লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্নর, কাউন্সিলের মেম্বার থেকে মুটে, মাঝি, উড়ে বেহারা সবাইকে তিনি ঠাট্টা করেছেন। এ-ধরনের ব্যঙ্গ-পরিহাসের দিক থেকে ঈশ্বর গুপ্তকে উর্দু কবি আকবর এলাহাবাদীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। ইংরেজী 'নববর্ষ' কবিতায় আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের সাহেবীয়ানাকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে, অর্থসঙ্গতি নেই অথচ সাহেব সাজবার চেষ্টা আছে পুরোপুরি। এ সাহেব-রাজ্য যে কতটা ন্যক্কারজনক ও হাস্যকর তা নিম্নরূপে ব্যক্ত করেছেন,

"যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ভবের টপে, চ্যাপলেতে যাব॥
কাঁটা ছুরি কাজ নাই, কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভরে খাব থাবা থাবা॥
পাতরে খাব না ভাত গো টু হেল কাল।
হোটেলে টোটেলে নানা সে বরণ ভাল॥
পুরিবে সকল আশা ভেবো না রে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে রাখিব না ক্ষোভ॥'

অন্য এক কবিতায় বলেছেন হুজুগে পড়ে বাইরে এরা সাহেব সাজছেন আবার রাতের বেলা আপন দীনতার কথা ভেবে গোপনে ক্রন্দন করছেন,

"এদিকে দুঃখের দায়ে মনে ঝোলে ফাঁসি।
বাহিরে প্রকাশ করে চড়কীর হাসি॥
ছেঁড়া পচা কাযেজ তাহার নাই হাথা।
তাই পরে বাবু হন খালি করে মাথা॥

ভাঙা এক টেবিলেতে ডিস সাজাইয়া।
ইণ্ড ভাবে খানা খান, বাহু বাজাইয়া ॥
মনে মনে খেদ বড় কান্না হয় রেতে।
পরমান্ন পিঠাপুলি নাহি পান খেতে ॥"

মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্তুতি করে যারা আপন জীবনকে চরিতার্থ করতে চায়, তাদের তিনি বিদ্রূপ করেছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের মাতৃভূমি-প্রীতির পরিচয় 'স্বদেশ' কবিতাটিতে পাওয়া যায়—

"জান না কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ॥
ভূমিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পুরাও আশ
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি ॥
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চলিতেছে দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ ॥"

ঈশ্বর গুপ্ত একই সঙ্গে গদ্যে এবং কবিতায় তিনটি দীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'প্রবোধ-প্রভাকর' প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে, 'হিত-প্রভাকর' ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে এবং 'বোধেন্দুবিকাশ' ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে। শেষের দু'টি গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থে পিতা-পুত্রের সংলাপের মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে আনন্দলাভ এবং দুঃখ-নিবৃত্তির কৌশল বর্ণিত হয়েছে। 'হিত-প্রভাকর' গ্রন্থ সংস্কৃত 'হিতোপদেশ'-এর অনুসরণে লিখিত। 'বোধেন্দুবিকাশ' ছয় অঙ্কে সমাপ্ত একটি তত্ত্বমূলক নাটক। নাটকটি কৃষ্ণ মিশ্রের সংস্কৃত নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-এর অনুকরণ মাত্র। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যে মানুষের যে-সংগ্রাম তাই এ-নাটকের বিষয়বস্তু। পর পৃষ্ঠায় 'বোধেন্দুবিকাশ'-এর পদ্যাংশ থেকে একটি নমুনা দেওয়া হল :

"হ্যাদে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে, আজো এরা মরে নি ?
এত সাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটে মরে,
এখনও এদের ঘরে—যম এসে ধরে নি ?
এই সব জামাজোড়া, এই সব গাড়ীঘোড়া
এসব টাকার তোড়া—চোরে কেন হরে নি ?
আরে ওরে ভাগ্যবান, বাড়িয়াছে বড় মান,
গোলাভরা আছে ধান—লক্ষ্মী আজো সরে নি ?
মর এটা যেন হাতি, দশহাত বুকে ছাতি,
করিতেছে মাতামাতি—জ্বরে কেন জ্বরে নি ?
হ্যাদে মাগী কালামুখী, ঠিক যেন কচি খুকী,
পতিসুখে বড় সুখী—ঠেটি কেন পরে নি ?
মর্ মর্ ওই ছুঁড়ি, পরেছে সোনার চুড়ী
বেঁকে চলে মেরে তুড়ি—কুল তবু ঝরে নি !
দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলিপিঠে,
এখনো এদের ভিটে—ঘুঘু কেন চরে নি।"

বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের স্থান মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের সংযোগ-ক্ষেত্রে। মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধি ভারতচন্দ্র এবং আধুনিক যুগের প্রথম প্রধান প্রতিনিধি মাইকেল মধুসূদন—এ উভয়ের মাঝখানে আমরা ঈশ্বর গুপ্তকে পাই। কবিওয়ালাদের শেষ প্রতিনিধি তিনি, আবার আধুনিকতাও তাঁর মধ্যে নেই এমন কথা বলা চলে না। সমসাময়িক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিলো, কেননা তিনি সংবাদপত্রসেবী ছিলেন।

তাঁর স্বদেশপ্রীতি-বিষয়ক কবিতা বাংলা সাহিত্যে একেবারে নতুন। পরবর্তী কালে অনেক কবির মনে তা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। যে-সময় বাঙালী যুবা-সম্প্রদায় দেশজ সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে আপন ভিত্তিমূল হারিয়ে ফেলছিলো, ঠিক সে-সময়েই ঈশ্বর গুপ্ত জাতীয় সংস্কৃতি-এবং সাহিত্য-সম্পর্কে তাদেরকে সচকিত করেন। তাঁর স্বদেশপ্রীতি ভাবালুতা মাত্র ছিল বললে অন্যায় হবে।

কবি বিহারীলাল

'বঙ্গ-সুন্দরী' গ্রন্থটি বিহারীলালের কবিত্ব-উন্মেষের প্রথম পাদের কিয়ৎ-পরবর্তী সময়ে লিখিত। একটি সার্থক কবিত্ব-প্রয়াস না হলেও এর ভাবরূপে বিহারীলালের কাব্যিক আদর্শের মূলতত্ত্ব অন্তর্লীন। গ্রন্থটি নারী-বন্দনা। দ্বিতীয় সর্গের সমাপ্তিতে কবি বলছেন—

"বাঁচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার,
যে-কদিন বাঁচি তবু গো নারী ;
উদার মধুর মুরতি তোমার
যেন প্রাণ ভরে আঁকিতে পারি।"

এই বাসনার ব্যত্যয় বিহারীলালের কাব্যসৃষ্টিতে কখনও হয় নি। তাঁর বক্তব্য সর্বত্রই নারীকে কেন্দ্র করে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থদ্বয় 'সারদা-মঙ্গল' ও 'সাধের আসন' মুখ্যত নারী-প্রশস্তিই। প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যেও এই ভাবাদর্শ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা কাব্য' যে-অর্থে নারী-বন্দনা, একমাত্র 'বঙ্গসুন্দরী' ব্যতিরেকে অন্য কোনটার ক্ষেত্রেই সেই অর্থ গ্রাহ্য নয়। 'মহিলা' কাব্যের বিষয়বস্তু নারী এবং এই বিষয়বস্তু সমস্ত গ্রন্থে আশ্চর্যভাবে মুখর এবং উজ্জ্বল। 'সারদা-মঙ্গল'-এর প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যথিত, সম্মোহিত ও হর্ষোচ্ছল কবি-মানস, সারদা একটা বিশেষ যন্ত্রের মত কবির মনে বিভিন্ন ভাব-অনুভাব আনয়নের সহায়তা করেছে মাত্র।

বিহারীলালকে কেউ কেউ মিস্টিক গীতিকার বলেছেন। মিস্টিক শব্দটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে বলে মনে হয় না। সত্য-দীপ্তিতে মন যখন উদ্ভাসিত তখন অতর্কিতে বহির্জগতের সমস্ত অবাঞ্ছিত গুঞ্জন থেমে যায় এবং সেই মুহূর্তে অবাঙ্‌মানসগোচর সত্তার জাজ্বল্যমান্ স্বরূপ কবির মানসাকাশে স্বপ্নের মত ভেসে ওঠে। কিন্তু এই সত্তার প্রকাশ সহজে সম্ভব নয়। অনেক বেদনা, অনেক ব্যর্থতা, অনেক সংশয়ের পর কবি একে উপলব্ধি করেন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। এটাকে বলা হয়—"It is the act of prayer, when we are really

praying, and feel that our prayers are really heard." এটা হচ্ছে সাধনার ক্ষেত্রে বস্তু-জগৎসিদ্ধ জ্ঞানমার্গের সাধারণ চৈতন্যের বিলুপ্তির পর এক দিব্যানুভূতির উন্মেষ। এই দিব্যানুভূতি বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রিয়া করতে পারে—ভক্তি, প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্যপূজা সমস্ত ক্ষেত্রেই। বিহারীলালের কাব্যে ভক্তি ও প্রেমের একাঙ্গরূপের প্রকাশ দেখি, উভয়েই একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এক অপরূপ তন্ময়াবস্থার সৃষ্টি করেছে। নারীর মাতৃ-রূপ বন্দনাতেও সাধারণ কবিসুলভ সহজ প্রশস্তি নেই, কল্পনার আনন্দময় উপলব্ধি রয়েছে। "সাধের আসন"-এ যোগেন্দ্র-বালার বর্ণনায় শাশ্বত মাতৃরূপের উদ্বোধন ঘটেছে—

"পীনোন্নত পয়োধরে
কোটি চন্দ্র শোভা হরে,
বিন্দু বিন্দু ক্ষীর ক্ষরে, স্নেহে স্নিগ্ধ চরাঁচর ;
আর্দ্রিয়া হিমাদ্রিমালা
সুরধুনী করে খেলা,
সুধা করে
সুধা ক্ষরে
পিয়া প্রাণে বাঁচে প্রাণী, অমর, দানব, নর।"

এই সহজ ভক্তি-প্রণামের পর কবি জননী-নারীর একটি দিব্যস্তরের উদ্বোধন করতে চেয়েছেন যেখানে সমস্ত বিশ্বব্যাপী কান্তিকে একের মধ্যে উপলব্ধি করবার একটি প্রয়াস লক্ষিত হয় :

"তরল দর্পণ-ভাস,
দশ দিক্ সুপ্রকাশ ;
দশ দিকে কার সব হাসিমাখা প্রতিমা
রাজে যেন ইন্দ্রধনু ;
তোমার মতন তনু,
তোমার মতন কেশ,
তোমার মতন বেশ,
তোমারই মতন দেবী, আনন-মাধুরিমা।

তোমার এ রূপরাশি
আকাশে বেড়ায় ভাসি,
তোমার কিরণ জাল
ভুবন করেছে আলো,
গ্রহ তারা শশী রবি,
তোমারি বিম্বিত ছবি ;
আপন লাবণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি।
মোহিত হইয়া দ্যাখে ভক্তিভাবে ধরণী।"

এখানে কবি বিশ্বমোহন কান্তির মূলীভূত ঐক্যস্বরূপকে যোগাবস্থায় উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। বিহারীলাল সর্বংসহা কল্যাণী জননী-নারীকে ধ্যানের দৃষ্টি-প্রদীপে প্রত্যক্ষ করেছেন—

"কপোলে সুধাংশু-ভাস,
অধরে অরুণ-হাস,
নয়ন করুণাসিন্ধু—প্রভাতের তারা জ্বলে।"

"শরৎকাল" গ্রন্থস্থিত "নিশান্ত" সঙ্গীতের প্রেয়সী-বন্দনায় কবি আপন প্রিয়জনকে সর্বভূতে বিরাজমান দেখতে পাচ্ছেন। বিহারীলালের ভাবনা-বাসনা আরম্ভ হয়েছে প্রেয়সীকে কেন্দ্র করে—

"প্রতিদিন উঠি ভোরে
আগে আমি দেখি তোরে,
মন প্রাণ ভরি ভরি সাধে করি দরশন।
বিমল আননে তোর
জাগিছে মুরতি মোর,
ঘুমন্ত নয়ন দুটি যেন ধ্যানে নিমগন।"

কিন্তু পরিমিত এই প্রণয় পূর্ণবিকাশ লাভ করেছে বিশ্ব-প্রণয়ে—

"তোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া ভালবেসে সুখী হই।

ভালবাসি নারী-নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই !"

ধ্যান-দৃষ্টি-সম্ভূত এহেন প্রেমারতিকে Platonic বলা যেতে পারে। অবশ্য বিহারীলাল প্লাটোনিক প্রেমাদর্শকে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। 'Symposium' গ্রন্থে Plato-র প্রেমাদর্শ ব্যাখ্যাত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের বিশ্লেষণে জনৈক ইংরেজ লেখকের বচন উদ্ধৃত করছি—

"In Symposium love is not merely the feeling usually so called, but the mystical contemplation of the beautiful and the good. The same passion which may wallow in the mire is capable of rising to the loftiest heights—of penetrating the inmost secret of philosophy. The highest love is the love not of a person, but of the highest and purest abstraction. This abstraction is the far-off heaven on which the eye of the mind is fixed in fond amazement. The unity of truth, the consistency of the warring elements of the world, the enthusiasm for knowledge when first beaming upon mankind, the relativity of ideas to the human mind, and of the human mind to ideas, the faith in the invisible, the adoration of the eternal nature are all included consciously, in Plato's doctrine of love."

প্লাটোর প্রেম-পরিকল্পনা বস্তুচেতনাহীন। যে-আদর্শের ধ্যান তিনি করেছিলেন, একমাত্র শেলী ব্যতিরেকে অন্য কোন কবির ক্ষেত্রে তা সার্থক হয় নি। Episychidian-এ দেখতে পাই ইমিলীর মধ্যবর্তিতায় বিশ্ববিমোহন কান্তিকে কবি অনুভব করতে চেয়েছেন। বিহারীলাল ও শেলীর মূল লক্ষ্যে পার্থক্য তাই স্বতই স্পষ্ট। যে-উত্তুঙ্গ ভাববিভোরতা শেলীতে প্রাপ্তব্য, বিহারীলালে তার ক্ষীণ প্রকাশও নাই। শেলী Intellectual Beauty-র ধ্যানে নিমগ্ন, বিহারীলাল আপন প্রেয়সীর। ক্ষেত্রভেদে প্রেমেরও প্রকার-ভেদ হয়েছে। বিহারীলালের প্রধান এবং শেষ লক্ষ্য আপন প্রিয়া। প্রেমের সার্থকতায় উৎফুল্ল হয়েই তিনি বিশ্ববাসীকে ভালবাসতে চেয়েছেন, বিশ্বপ্রেম তাঁর মূল কাম্য নয়। শেলী তাঁর প্রণয়কে বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান নি, তাঁর আত্মা অনন্তাভিসারী। কিন্তু নির্বিশেষকে উপলব্ধি করবার জন্য

মানুষ প্রতীকের সাহায্য নিয়ে থাকে। Episychidian-এর 'ইমিলী' অথবা Alastor-এর 'আরব কুমারী' ক্ষেত্রবিশেষে সেই প্রতীকের কাজ করছে। বিহারীলাল একের মধ্যে অনন্তকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সুতরাং বিশেষকে নিয়েই তাঁর প্রণয়-প্রশ্ন। বিহারীলাল তাঁর অন্তর-লক্ষ্মীকে দেখেছিলেন—

"প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা।"

'সারদামঙ্গল' কাব্য-সম্পর্কে বিহারীলাল লিখেছেন—

"মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি 'সারদামঙ্গল' রচনা করি।

"সর্ব্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্যন্ত রচনা করিয়া বাগেশ্রী রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম; সময় শুক্ল-পক্ষের দ্বি-প্রহর রজনী, স্থান ছাদের উপর। গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ববর্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতী-মূর্তি রচনান্তর আমার চির-আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট, কখন অস্পষ্ট, কখন বা তিরোহিতভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই বিষাদ-ময়ীর মূর্তির সহিত বিরহিত মৈত্রী-প্রীতির ম্লান করুণামূর্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সরস্বতী-বন্দনার অন্তরালে কবির অন্তর-লক্ষ্মীর স্বরূপের উদ্‌ঘাটন ঘটেছে এই কাব্যে। সরস্বতী ও কবিপ্রিয়া একীভূত হয়ে কবির অন্তরে এক তন্ময়াবস্থার সৃজন করেছে। যে-প্রেমের কথা এই গ্রন্থে বলা হয়েছে তা ধ্যানগত উপলব্ধির ফল।

প্রথম সর্গের আরম্ভ পরিপূর্ণভাবেই সারদাস্তুতি—সাধারণ মানস-উদ্ভূত সারদা নয়, কবি-কল্পনার বিশ্ব-বিমোহন কান্তি। সর্ববিশ্বে পরিব্যাপ্ত যে-সৌন্দর্য সুষমা তাকেই কবি মূর্তিমতী করতে চেয়েছেন। এই সৌন্দর্য অনুভববেদ্য। বিহারীলালের নিকট এই সৌন্দর্যই চরম নয়, এতে অন্তর্লীন হয়ে আছে আনন্দ-স্বরূপ প্রেমের পরিচয়। উভয়েই একই পরম তত্ত্বের দ্বৈত রূপ। এই মূলীভূত তত্ত্বকে বিহারীলাল আদি-দেবতা বলেছেন। সৃষ্টির

সত্তা তাঁরই সত্তায় অনুরঞ্জিত হয়ে বিকাশলাভ করেছে পরম সৌন্দর্যে। অন্তরে এই একই সত্তা আপনাকে প্রকাশ করে প্রেমরূপে ; বাইরে কান্তিরূপে ও অন্তরে প্রেম রূপে—এটাই আদিদেবতার দ্বৈতরূপ।

বেদনা, করুণা ও প্রেমাকুলতা থেকে এই সারদার উন্মেষ হয়েছে, প্রথমে কবি এটাই প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। বাল্মীকির তপোবনে তিমিররাত্রি ভেদ করে যখন প্রফুল্ল ঊষার অভ্যুদয় হল, অতর্কিতে তখন শবরের বাণে বিদ্ধ হয়ে রক্তাপ্লুত ক্রৌঞ্চ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল এবং—

"ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে,
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা-জড়িত মন
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়,
সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে।"

এই হল সারদার এক রূপ, ভিন্ন অর্থে তিনি সৌন্দর্যরূপিণী। কবি কল্পনা করছেন যে, সারদার স্থিতি ব্রহ্মার মানস-সরোবরের স্বর্ণ পদ্মের উপর। তাঁর আলেখ্য বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ব্রহ্মার মানস-সরোবরে স্থিতি দ্বারা কবি এই বোঝাতে .য়েছেন যে, সারদা অর্থাৎ বিশ্ববিমোহন কান্তি অনন্তে পরিব্যাপ্তা।

প্রথম সর্গ কবি সমাপ্ত করেছেন সারদাকে লাভ করবার জন্য কাতরতা প্রকাশ করে। সর্গ-শেষে এই আকাঙ্ক্ষা অনেকটা ব্যক্তিগত হয়ে পড়েছে। অনন্ত, বিশেষে পর্যবসিত হয়েছে এবং সীমাতীতের জন্য যে-আকুলতা ছিল তা বিশেষের মধ্যে রূপলাভ করতে চাচ্ছে এবং বিশেষ থেকে উৎসারিত হতে চাচ্ছে—

"অদর্শন হ'লে তুমি
ছাড়ি লোকালয় ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড়-গহনে ;

হেরে মোরে তরুলতা
বিষাদে কবে না কথা
বিষণ্ণ কুসুম-কুল বন-ফুল-বনে !"

এই বেদনার অনুভূতি ব্যক্তি-চেতনার দ্বারা লালিত।

এই ব্যক্তি-চেতনার পরিচয় অন্যান্য সর্গেও প্রকাশমান। দ্বিতীয় সর্গে বিরহী মানবাত্মার উন্মেষ রয়েছে। সারদা-প্রাপ্তির জন্য কবির আকুতি ক্রমশঃই তীব্র হচ্ছে কিন্তু ব্যর্থতার বেদীমূলে প্রায়শঃই এর আহুতি কবির মনে এই বিশ্বাসই সুদৃঢ় করছে যে, তাঁর আপনার মধ্যেই প্রেমের পরিপূর্ণতা ঘটে নি, সার্থক প্রেমিক-পুরুষের গুণাবলী তাঁর মধ্যে প্রকট হয় নি, লিপ্সাহীন যথার্থ প্রেমের ব্যঞ্জনা তাঁর ক্রিয়া-কর্মে প্রকাশ পায় নি। এটা নিরাশার অভিব্যক্তি। ব্যক্তিগত জীবনে ব্যর্থ-প্রণয়ের যে-বেদনা ছিল এটা তারই রূপায়ণ—

"সে মহাপুরুষ-মেলা
সে নন্দন বন-খেলা,
সে চির-বসন্ত বিকশিত ফুলহার,
কিছুই সেথায় নাই,
মনে মনে ভাবি তাই,
কি দেখে আসিতে মন সরিবে তোমার !"

এটা অনুরক্ত ভক্তের উক্তি নয়, বিরহী প্রেমিকের উক্তি। কবি নিজেই এ ভাব ব্যক্ত করেছেন সারদাকে "দুখে দুখী অশ্রুমুখী প্রাণ-প্রতিমা" বলে অভিহিত করে। সর্বত্র কবি আবার এই মানবীয়তাকে অব্যাহত রাখতে পারেন নি। অনেক ক্ষেত্রে, "প্রাণ-প্রতিমা" নয়, 'সত্যরূপা সরস্বতী'ই জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে—

"অয়ি, হা, সরলা সতী
সত্যরূপা সরস্বতী !
চির অনুরক্ত ভক্ত হ'য়ে কৃতাঞ্জলী
পদ-পদ্মাসন কাছে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে
কি করিবে, কোথা যাবে, দাও অনুমতি !"

এভাবে বিবিধ ভাবনা-বাসনার একীভূত প্রকাশে কবিতার ভাবগত পারম্পর্য রক্ষিত হয় নি। হৃদয়াবেগের প্রাবল্যই এর কারণ। অধৈর্য আত্মাকে শান্ত হতে বলে কবি এই সর্গ সমাপ্ত করেছেন—

"ধর আত্মা, ধৈর্য ধর,
ছি ছি! একি কর,
মর যদি, মরা চাই মানুষের মত!
থাকিবা প্রিয়ার বুকে
যাইবা মরণ-মুখে!
এ আমি, আমিই রব, দেখুক জগত।"

তৃতীয় সর্গ সম্পূর্ণরূপেই ধ্যানগত উপলব্ধির ফল। বহির্জগতকে বিস্মৃত হয়ে অন্তর্লোকে প্রেমরূপা সরস্বতীর অন্বেষণ চলছে। এই কল্পনায় কবি সারদার সাক্ষাৎ পেয়েছেন বলেছেন কিন্তু পেয়েছেন বিষণ্ণতার প্রতি-মূর্তি হিসাবে। স্থান, কাল ও পরিবেশের কোন পরিবর্তন হয় নি, প্রেমেরও বৈলক্ষণ্য ঘটে নি কিন্তু অহেতুক এক অস্বাচ্ছন্দ্য উভয়ের মিলনকে অসহ করে তুলছে—

"সেই আমি, সেই তুমি
সেই এ স্বরগ-ভূমি,
সেই সব কল্পতরু, সেই কুঞ্জবন;
সেই প্রেম, সেই স্নেহ,
সেই প্রাণ, সেই দেহ,
কেন মন্দাকিনী তীরে দু-পারে দু-জন।"

আপনাতে আপনি মানুষ পরিপূর্ণ থাকতে পারে না, সে নিজেকে বিকাশ করতে চায় অপরের মধ্যে। দেহী মানব দেহধারিণীর সঙ্গম কামনা করে কিন্তু দেহধারীর সঙ্গে বিদেহীর মিলন সম্ভব নয়। বিহারীলালের আকুতিও তাই সর্বাংশে **contemplation of the abstract** নয়। মোহিতলাল যাকে বলেছেন, "দেহের মাঝারে দেহাতীতের ক্রন্দন" বিহারীলালের "সারদা-মঙ্গল"-এ তারই পরিচয় দেবার চেষ্টা আছে। স্থানে স্থানে তাই দেখতে পাই যে, কল্পনার প্রাপ্তিকে কবি চরম বলে মেনে নিতে পারছেন না,

সাক্ষাৎ-সান্নিধ্যই তাঁর কাম্য নিম্নোদ্ধৃত চরণত্রয়ে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন ?—

"হৃদয়-প্রতিমা লয়ে
থাকি থাকি সুখী হ'য়ে
অধিক সুখের আশা নিরাশা শ্মশান !"

এখানে "অধিক সুখের আশা" কোন্ অর্থবাচক ? মনে হয় যেন পৃথিবীর মাটিকে না ভুলবার কথঞ্চিৎ প্রয়াস এখানে রয়েছে। তবুও এই সুর এই সর্গে ততখানি প্রবল নয় যতখানি প্রবল বিচিত্র সেই "মত্তদশার" সুর। বাইরের কান্তির বিস্মরণ ঘটেছে, অন্তরে জেগেছে অনন্ত প্রভাশালিনী জ্যোতির্ময়ী পরম-প্রিয়া সারদার উন্মেষ।

কিন্তু অন্তরের আনন্দময় উপলব্ধির স্থিরতায় যদি বহিঃপ্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা-আবর্তের সংঘাতে বাধা পড়ে, তবে সেই আন্তরিক চেতনাকে তুচ্ছ বলে অস্বীকার করা যায় না। কোনটা সত্য—জীবজগতের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, না অন্তরের আনন্দময় উপলব্ধি ? যদি মিথ্যা হয়, তবে অন্তরের কোনও রসানুভূতি উদগ্র হয়ে উঠতে পারে কি ? অথচ তাই হয়েছে বিহারীলালের ক্ষেত্রে। সুতরাং আন্তরিক উপলব্ধিকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না এবং অনৃত বলে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। এই উপলব্ধিকে লক্ষ্য করেই কবি বলেছেন—

"বিচিত্র এ মত্ত-দশা
ভাব-ভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে !"

এই উপলব্ধির নিবিড়তায় বাস্তব চেতনা অন্তর্হিত হয়েছে, শুধুমাত্র **abstract** অনুভূতি নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। তাতে ফল এই হয়েছে যে, সারদার মূলীভূত তত্ত্ব স্থির থাকতে পারে নি, অবলম্বন না পেয়ে তা নিত্যরূপে বিকাশমান হয় নি। কবির মনে তাই বিবিধ প্রশ্ন জেগেছে— "নাই কি প্রেমের মূল", স্বপ্নে যা দৃশ্যমান তা কি অসত্য ? যদি অসত্যই

হবে, তবে সেই অলীক ছায়া দেখে মন কেন আনন্দে আকুল হয়, প্রাণে কেন প্রণয়-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়? এর উত্তর কবি নিজেই দিয়েছেন—

"এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী,
এ এক নেশার ভুল,
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল
স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী।"

অর্থাৎ কবির বক্তব্য এই যে, ধ্যানের অবস্থায় মনে নানাপ্রকার রসানুভূতির উন্মেষ হয়, পার্থিব বিচারে তা যদি সম্মান না-ও পায় তবু কবি তাতেই নিমজ্জিত হয়ে থাকতে চান। একথা তিনি বলেছেন বটে কিন্তু প্রকৃত স্বস্তি আসছে না। এই যে বেদনাময় সংশয় এবং আনন্দময় বিস্ময়ের মধ্যে দোলায়মান অবস্থা এটা অপরিসীম অতৃপ্তির। এ অপেক্ষা মৃত্যুর মধ্যে নির্বাণও পরম কল্যাণের। তৃতীয় সর্গের সমাপ্তিতে কবি এ কথাই বলছেন।

এটা একটি স্বাভাবিক সত্য যে, আমাদের মনে যখন বেদনার প্রাবল্য থাকে তখন তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমরা ভিন্নগোত্রীয় একটি কার্যে লিপ্ত হতে চাই। বেদনাকে বিস্মৃত হবার প্রাণান্ত প্রয়াস মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি। 'সারদা-মঙ্গল'-এর চতুর্থ সর্গেও এর পরিচয় পাই। সারদা-অপ্রাপ্তির বেদনা নিবৃত্তির জন্য চতুর্থ সর্গে কবি হিমালয়ের বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় হিমালয় জীবন্ত হয়ে উঠেছে আপন সহজতা, স্তব্ধতা, মৌন অবিচল শান্তিকে নিয়ে। কোথাও দার্শনিকতা করবার প্রয়াস নেই, সহজ ভাষায় সমস্ত কিছুই অভিব্যক্ত হয়েছে। শিশুর সারল্য নিয়ে ধ্যান-গম্ভীর হিমালয়ের মাধুর্য কবি উপভোগ করেছেন, তাই বর্ণনার যাথার্থ্য নিরূপণের প্রয়াস ততটা নেই যতটা আছে আপন মনের প্রাথমিক অবিকৃত ভাবনার প্রকাশ। হিমালয় দেখে কবি বলছেন—

"বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে!
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান ব্যাপার।"

এটা মৌলিক চিন্তার দ্বারা ব্যাহত নয়, দার্শনিকতার দ্বারা বিকৃত নয়। এটা যেন শিশু-হৃদয়ের স্তম্ভিত অবস্থার শব্দময় রূপ। "কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান ব্যাপার"—হিমালয়ের ধ্যাননিবিড়, স্তব্ধ অবিচল মহিমার অত্যন্ত সুন্দর প্রশস্তি।

বৃক্ষলতা পশুপক্ষী—হিমালয়ের সমস্ত জৈব ও অজৈব পদার্থ কবির দৃষ্টিতে অপরূপ মোহনীয়তা এনেছে। তিনি দেখেছেন ও মুগ্ধ হয়েছেন। হিমানী-আবৃত উজ্জ্বল শৈল-শিখর, পাদদেশে নিকুঞ্জশোভা, কটিদেশে গুল্ম-তৃণ, ইতস্ততঃ সঞ্চরমান চমর-চমরী সমস্ত মিলে এক রোমাঞ্চকর, মনোমুগ্ধকর রাজ্যের সৃষ্টি করেছে। কোথাও অতিভাষণ নেই, স্বল্প-ভাষণও নেই; কবিমানসের সম্মোহিত আনন্দোজ্জ্বল স্বরূপের উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে প্রতি স্থলেই। আশ্চর্য সাবলীল ও সহজ এই ছত্রগুলি অথচ কত সুন্দর—

"কাছে কাছে স্থানে স্থানে,
নীচ-মুখে উচ-কানে
চড়িয়া বেড়ায় সব চমর-চমরী,
সুচিকন শুভ্র কায়,
মাছি পিছলিয়া যায়,
চলিলে চামর চলে চন্দ্রিমা-লহরী।"

"মাছি পিছলিয়া যায়" এই একটি ছত্রে মসৃণতাকে যেন চাক্ষুষ করা হয়েছে। অন্যত্র দেবদারু বৃক্ষের বর্ণনায় কবি বলেছেন—"দেদার চলিয়া যায় কাতারে কাতার।" এখানেও দেবদারুর বৃক্ষবিন্যাসের অবিকল স্বরূপ যেন আমাদের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে।

এই সর্গে কবি প্রকৃতি-পূজারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন কিন্তু এই প্রকৃতি-বন্দনা নির্বিশেষে আত্মারতি নয়—প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপের বিকাশ।

পঞ্চম সর্গ স্বস্তি-বচন। ধ্যানালোকে সারদার যে-মূর্তি মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে মুহূর্তেই মিলিয়ে গিয়েছিল, অপ্রাপ্তি-জন্য নিবিড় বেদনার পর কবির মানসে তাঁর শুভ স্থিতি ঘটেছে আজ। সংশয়ের নিরসন হয়েছে, সংক্ষুব্ধ হৃদয় স্থির হয়েছে, প্রণয়-প্রাবল্যে এই বিশ্বাসই কবির হয়েছে যে,

হৃদয়ে যাঁর অক্ষয় আসন, বাইরের ঘটনাবর্ত তাঁকে দূরে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই তিনি শান্তি-বারি সিঞ্চন করেছেন এই কথা বলে—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোক্ গে এ বসুমতী যার খুশী তার।"

এই শান্তিবাণী বেদনার্ত চিত্তের পক্ষে চরম অমোঘ।

রবীন্দ্রনাথের সেঁজুতি

মৃত্যুবন্দনা রবীন্দ্রনাথ অনেকবার করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মৃত্যুর প্রান্তবর্তী সময়ে নয়। যখন জীবনের শক্তি ছিল সজাগ, বেদনা ও আনন্দ উভয়ই ছিল অজস্র, সীমাহীন পরিবর্তনের আবর্তে জীবনের গতি হচ্ছিল নিয়ন্ত্রিত, তখনই তিনি মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন দ্বিধাহীন অকুণ্ঠভাবে। সে আমন্ত্রণে লেশমাত্র সঙ্কোচ ছিল না, কেননা, বর্তমান তখন কবির জন্য এত উজ্জ্বলভাবে সত্য যে, দুর্ভোগ ও বেদনা, এমন কি বিনাশ পর্যন্ত তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। মৃত্যুকে তিনি করেছিলেন আপন হাতের ক্রীড়নক। যৌবনদীপ্ত জীবনে মৃত্যু কোনো কুয়াশার কালো ছায়া টেনে আনতে পারে নি।

কিন্তু যখন মৃত্যু সত্যিই এসেছে অনেক নিকটে, যখন প্রতিদিনকার অনুভূতিতে তা ধরা দিয়েছে স্পষ্টভাবে, তখন কবির মনে আকুলতা জেগেছে পৃথিবীকে স্বীকৃতির চরমমূল্য দেবার। বারবার জানিয়েছেন যে, এ-পৃথিবীকে তিনি খুব ভালবেসেছিলেন। আজ বিদায়ের মুহূর্তে এতদিনকার ভালবাসাকে তিনি শেষ বারের মতো পর্যবেক্ষণ করতে চান, —"আমি যে বেঁচে আছি—তা কেবল এই পৃথিবীকে ভালোবেসেছি ব'লে। এতো ভালোবেসেছি যে বলতে পারি নে। যাবার সময় এ কথাই বলে যাবো যে, ভালো লেগেছিল, ভালোবেসেছিলুম পৃথিবীকে, এমন ভালো কেউ কোন দিন বাসতে পারে না।"

['আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬]

একই কথা আরও জোরের সঙ্গে বলেছেন একটি চিঠিতে—"মানুষকে ভালোবেসেছি মর্মান্তিক তীব্রতার সঙ্গে। সেই সংবেগ ঠেলা দিয়েছে পালের হাওয়ার মতো কল্পনার তরীতে, কখনো এ বাঁকে কখনো ও বাঁকে, কিন্তু পুঁথিগত আইনের সীমানা থেকে দূরে।"

[প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪৪]

'সেঁজুতি' গ্রন্থ আরম্ভই হয়েছে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পৃথিবীর প্রতি শেষ তীব্র ভালোবাসা জানিয়ে—

"ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে "ভালোবাসিয়াছি"।
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালোবাসা
সব ক্ষয়ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট রবে; তার ভাষা
হয়তো হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লান স্পর্শ লেগে
তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে
মৃত্যুপরপারে। তারি অঙ্গে এঁকেছিল পত্রলিখা
আম্রমঞ্জরীর রেণু, এঁকেছে পেলব শেফালিকা
সুগন্ধী শিশিরকণিকায়; তারি সূক্ষ্ম উত্তরীতে
গেঁথেছিল শিল্পকারু প্রভাতের দোয়েলের গীতে
চকিত কাকলীসূত্রে; প্রিয়ার বিহ্বল স্পর্শখানি
সৃষ্টি করিয়াছে তার সর্ব দেহে রোমাঞ্চিত বাণী,—
নিত্য তাহা রয়েছে সঞ্চিত। যেথা তব কর্মশালা
সেথা বাতায়ন হতে কে জানি পরায়ে দিত মালা
আমার ললাট ঘেরি সহসা ক্ষণিক অবকাশে—
সে নহে ভৃত্যের পুরস্কার; কী ইঙ্গিতে, কী আভাসে
মুহূর্তে জানায়ে চ'লে যেত অসীমের আত্মীয়তা
অধরা অদেখা দূত; ব'লে যেত ভাষাতীত কথা
অপ্রয়োজনের মানুষেরে॥"

কবির মনে হচ্ছে যে, মৃত্যুর আমন্ত্রণ তাঁর এ ভালোবাসাকে আরো তীব্র করেছে। মৃত্যুর আমন্ত্রণ অশুচি নয়, কবি পাবেন যাত্রার ইঙ্গিত "মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে নূতন অরুণ-লিখা" নিয়ে। অজ্ঞাত প্রদেশে যাত্রার প্রারম্ভে কবি নির্ভয় হতে চেষ্টা করছেন এই ভেবে যে, তাঁর ভালোবাসার

সঞ্চয় কখনো ব্যর্থ হবে না। মৃত্যুতে বিনাশ ঘটবে তাঁর দেহের, কিন্তু দেহের অতীত যে-মানুষ সে থাকবে অক্ষয় হয়ে। সুন্দরের যে-নৈবেদ্য তিনি সাজিয়েছেন এতদিন, কোন ক্ষয়ক্ষতি তাকে স্পর্শ করতে পারে না—

"যদি মোরে পঙ্গু কর, যদি মোরে কর অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন কর নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধ বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দিরবেদিতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে—তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব॥"

কবির কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দুর্বল ও ক্লান্ত। তিনি যতই বলুন না কেন যে, মৃত্যু তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি প্রতিনিয়ত অনুভব করেছেন যে, শক্তি তাঁর আর নেই। সমস্ত উক্তির শেষে শুধু এই কথাই প্রকাশ পেয়েছে—

"বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে,
শেষ-প্রহরের ঘণ্টা; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।"

যুবা-মন কখনও অভয় চায় না, সংঘাতও তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়; কিন্তু জরাক্লান্ত মন যদিও নানাভাবে সঙ্কটকে ভুলতে চেষ্টা করে, তবু সে তা ভুলতে পারে না। আরও প্রত্যক্ষ হয়ে পড়ে তার ভীতি। 'সেঁজুতি' তে এর পরিচয় আছে। এ গ্রন্থে আছে, উজ্জ্বল-অতীত-সমন্বিত অথচ অধুনা-জরাগ্রস্ত এক প্রতিভাবানের মানসিক বৈকল্য থেকে রক্ষা পাবার প্রয়াস। মানুষের ব্যক্তিগত ইতিহাসের যদি কোনো মূল্য থাকে, তবে 'সেঁজুতি'র আত্মমুখর ভাষণগুলিরও মূল্য আছে।

মৃত্যু-চিন্তা কবিকে আশ্চর্য রকমে আচ্ছন্ন করেছে। নানা প্রশ্ন জাগ্ছে মনে, উত্তর মিলছে না একটিরও—

"কী আছে জানি না দিন অবসানে মৃত্যুর অবশেষে;
এ প্রাণের কোনো ছায়া
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রং অস্তরবির দেশে,
রচিবে কি কোনো মায়া।

জীবনের যাহা জেনেছি, অনেক তাই,
সীমা থাকে থাক্ তবু তার সীমা নাই।
নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেকে জানে।"

আরো স্পষ্ট করে বলেছেন—

"যখন সমাপ্তি হবে তখন চরম সমাপ্তি কিনা, যা সমুখে আর যা পিছনে, আমার কাছে সে উভয়ই অস্তিত্ববিহীন। কেবল বর্তমানটুকুই সত্য, সত্য মানে প্রত্যক্ষ। কিন্তু যা প্রত্যক্ষ নয় সেও সত্য হতে পারে। অতীত আমার কাছে নিশ্চিন্ত, কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়তো সে নয়। ভবিষ্যৎ আমার কাছে অজানা, কিন্তু সেও আছে।"

('মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', পৃষ্ঠা ১৫)

এগুলো দার্শনিক চিন্তা নয়, গভীর তত্ত্বও এতে নেই। প্রকৃতপক্ষে এগুলো এক বয়স্ক ব্যক্তির কতগুলো জিজ্ঞাসামাত্র। তত্ত্বসমৃদ্ধ না হলেও মানবিক মূল্য এদের যথেষ্ট। এ মানবিকতার জন্যই রবীন্দ্রনাথ কবি, অন্য কারণে নয়। যেখানে জিজ্ঞাসা আছে শুধু নির্বিশেষ তথ্য নির্ধারণের জন্য, সেখানে জিজ্ঞাসার মূল্য খুব কম, কিন্তু যেখানে প্রত্যেক জিজ্ঞাসাই মনের আকুলতার প্রকাশ, সেখানে জিজ্ঞাসা কবি-মানসের সত্যিকার অভিব্যক্তিমাত্র।

কবি পৃথিবীকে ভালোবেসেছেন খুব বেশি, তাই তো বিদায়ের পূর্বাহ্নে অজানা ভবিষ্যতের কথা ভেবে নানা প্রশ্ন জাগছে মনে। জীবন চলে যাক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তার সঙ্গে অন্তর্হিত হোক যা ভঙ্গুর আর যা অর্থহীন। ভালোবাসায় যা প্রদীপ্ত, প্রেমের স্বীকৃতিতে যার মূল্য উজ্জ্বল ছিল, তার কোনো বিনাশ নেই। শুধু অর্থহীন বস্তুর তিরোধান ঘটুক—

"যাক এ জীবন,
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লোটে ধূলি পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা রেখে যায় শুধু ফাঁক।
যাক এ-জীবন পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক।"

কিন্তু চিরন্তন থাকবে প্রাণস্পন্দন, যা নিয়ত কবির মনকে উদ্বেলিত করেছে, দোলা দিয়েছে ভালোবাসায়, আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে—

"অসীম আকাশে যে প্রাণ-কাঁপন
অসীম কালের বুকে
নাচে অবিরাম, তাহারি বারতা
শুনেছি তাদের মুখে।
যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা
ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে।
সেই সত্যের ছবি
তিমিরপ্রান্তে চিত্তে আমার
এনেছে প্রভাতরবি।"

পৃথিবীর প্রতি কবির যে-ভালোবাসা, সে ভালোবাসাই সার্থক হয়ে থাকবে চিরদিন। একটা চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

"এই শীতের দুপুর বেলায় সামনের জান্‌লা খুলে মুকুলে ভরা ঐ আম বাগানের দিকে চেয়ে প্রায়ই ভাবি—জন্মেছি এই পৃথিবীতে, খুব খুশি হয়েছি—প্রকাশ করেছি নিজেকে আপনা হতে নানাভাবে নানা ভঙ্গিতে, তাতে মশ্‌গুল করেছে—বাস্‌ এখানেই থামা যাক—আর তো কিছু দরকার নেই—পালা তো শেষ হবেই, তারও পরেকার পালার হিসেব কল্পনা করতে চশমা আঁটে ভিতরকার একটা লোভী পাগল—তাঁর সেই হিসেবের উপর আজ আর আস্থা নেই। এতদিন যেমন যেমন খুশি হয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সংস্কার জন্মেছে, খুশি করবার যোগান বুঝি হাতে হাতে দিয়ে গেলুম। সেটা স্থায়ী সত্য না হবারই সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু কে-ই বা স্থায়ী, কী-ই বা স্থায়ী। অনিশ্চিত দখলের দাবী নিয়ে তবে এত তীব্র ঝগড়া কেন। রাগারাগি কী জন্যে, লোভই বা কিসের? মরীচিকার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে আদালতে নালিশ?" (প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪৫)

অত্যন্ত সহজ নিরাসক্ত মনে কবি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছেন, কেননা তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস যে, মৃত্যুতে তাঁর ভালোবাসার বিরতি ঘটবে না, কেননা—

"আমি হলুম শ্যামলা ধরণীর বরপুত্র। শ্যামল মাটির সঙ্গেই আমার সম্পর্ক বেশী। সেখানেই আমার গভীর টান।"

('আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', পৃষ্ঠা, ২৫)

মাটির প্রতি এ ভালোবাসাই কবিকে কখনো কখনো সম্পূর্ণ ভীতিহীন করেছে। মৃত্যু তাঁকে শঙ্কিত করতে পারে নি, কেননা এ বিশ্বাস তাঁর সুদৃঢ় যে,

"যে দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো,
নাম-না-জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো,
যে দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভবে ॥"

এখানে শঙ্কা যে তাঁর মনে সত্যিই নেই, এ চটুল ছন্দোবদ্ধ ভাষণেই তার প্রমাণ হচ্ছে। কিন্তু ভোলবার জন্য দার্শনিকতা করেছেন কখনো, সমাপ্তির কথা চিন্তা করে বিবিধ প্রশ্ন তুলেছেন, আবার কখনো ক্লান্তমনে মৃত্যুর হাতে ধরা দিয়েছেন। মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রত্যেক পর্যায় যেন এখানে ধরা পড়েছে।

এ গ্রন্থের সবচেয়ে সুন্দর কবিতা 'স্মরণ'। এখানে দুঃখ আছে, দুঃখকে ভোলবার চেষ্টা আছে; পৃথিবীর প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় আছে, পরিচয়বিহীন হয়ে থাকবার আকাঙ্ক্ষা আছে। মানবিক মূল্য এর যথেষ্ট। আরম্ভে বলেছেন যে, যদি তাঁকে কারো স্মরণ করবার দরকার পড়ে তবে প্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের দিকে সে যেন তাকিয়ে দেখে—যে ঐশ্বর্যকে কবি একদিন আপন করে নিয়েছিলেন। কবির ভাষণ এই—

"যখন রব না আমি মর্তকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন,
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন ॥"

হয়তো প্রকৃতি তার এ পূজারীকে মনে রাখবে না কিন্তু নিশ্চিন্তে কবি-

যে আপনাকে তার হাতে সমর্পণ করতে পেরেছিলেন সেখানেই তো তাঁর জীবনের সার্থকতা। কবি তাই বলছেন—

"দিই নাই, চাই নাই, রাখি নি কিছুই
ভালোমন্দের কোনো জঞ্জাল ;
চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভুঁই
আসন পেতেছে মোর ক্ষণকাল।
সেইখানে মাঝে মাঝে এল যারা পাশে
কথা তারা ফেলে গেছে কোন্ ঠাঁই ;
সংসার তাহাদের ভোলে অনায়াসে,
সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।
বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে-আমি চায় নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার—
সে-আমারে কে চিনেছ মর্তকায়ায়।
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না, ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন॥"

কারো সাথে কোনো নিবিড় বন্ধনে তিনি আপনাকে জড়াতে চান নি, প্রণয়ের সম্ভারে পরিপূর্ণ করেছিলেন প্রকৃতিকে। খ্যাতির দাবি ছিল না, ভাবনা ছিল না অগাধ। সহজ ভাবেই দেয়া-নেয়া চলছিল সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে নিজের—

"সেদিন ভুলিয়াছিনু কীর্তি ও খ্যাতি,
বিনা পথে চলেছিল ভোলা মন,
চারিদিকে নামহারা ক্ষণিকের জ্ঞাতি
আপনারে করেছিল নিবেদন।

সেদিন ভাবনা ছিল মেঘের মতন,
কিছু নাহি ছিল ধরে রাখিবার ;.
সেদিন আকাশে ছিল রূপের স্বপন,
রঙ ছিল উড়ো ছবি আঁকিবার।
সেদিনের কোনো দানে, ছোটো বড়ো কাজে
স্বাক্ষর দিয়ে দাবি করি নাই—
যা লিখেছি, যা মুছেছি শূন্যের মাঝে
মিলায়েছে, দাম তার ধরি নাই॥"

'সন্ধ্যা' কবিতায় বলছেন যে, জীবন যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন আর বসে থাকতে ভালো লাগে না। মৃত্যুর সঙ্গে যত শীঘ্রই পরিচয় হয় ততই মঙ্গল—

"দিনের আলো সবার আলো
লাগিয়েছিল ধাঁধা—
অনেক সেথায় নিবিড় হয়ে
ছিল অনেক বাঁধা।
নানান কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে
হারানো আর পাওয়ায়
নানান দিকে ধাওয়ায়।
সন্ধ্যা ওগো কাছের তুমি,
জানিয়ে এসো প্রাণে,
আমার মধ্যে তারে জাগাও
কেউ যারে না জানে।"

অবশ্য উপরি-উক্ত উদ্ধৃতির শেষ চরণের তত্ত্বটি অর্থহীন। কবিত্ব হিসেবে তো বটেই, ভাববিলাসিতা হিসেবেও ওটা আমাদের মনকে দোলা দেয় না। মৃত্যুভয় মানুষ সর্বদা দূর করতে চায়, সেজন্য মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যত শীঘ্র সম্ভব বাস্তব জীবনের বিরতি ঘটুক মৃত্যুর পূর্বাহ্নে

দাঁড়িয়ে সে এ প্রার্থনাই করে। অনেক সংশয়, অনেক কল্পনা তার মনে জাগে। সে ভাবে কখনো কখনো যে, মৃত্যু থেকে উদ্বোধন ঘটবে নব-জীবনের, নতুন এক জগতের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটবে। যে-পৃথিবীকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবুও ভাবতে মন চায় যে, নিশ্চয়ই তা আলোকে আলোকময়।

ভাগীরথীর কথা উল্লেখ করে কবি বলেছেন—

"মানুষের মুখ্য ভয় মৃত্যু-ভয়,
কেমনে করিবে তারে জয়,
নাহি জানি ;
তাই সে হেরিছে ধ্যানে
মৃত্যু-বিজয়ীর জটা হতে
অক্ষয় অমৃত স্রোতে
প্রতিক্ষণ নামিছে ধরায়
পূর্ণতীর্থতটে সে যে তোমার প্রসাদ পেতে চায়।"

কবিতাটির নাম 'ভাগীরথী'। এর শেষের দিকে কিছুটা ছন্দের দৌর্বল্য ও শিথিলতা আছে। চিন্তা স্বচ্ছপথ ধরে চলে নি, তাই ভাষাও দুর্বল গতিতে অগ্রসর হয়েছে।

বৃদ্ধা "তীর্থযাত্রিণী"র ক্লান্ত যাত্রায় তিনি আপনার স্বরূপকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। যৌবন-মুখর অতীতের যাত্রা আজ ব্যর্থ হয়েছে—

"যে পথে সে করেছিল যাত্রা একদিন
সেখানে নবীন
আলোকে, আকাশ ওর মুখ চেয়ে
উঠেছিল হেসে।
সে পথে পড়েছে আজ এসে
অজানা লোকের দল,
তাদের কণ্ঠের ধ্বনি ওর কাছে ব্যর্থ কোলাহল।

যে যৌবনখানি
একদিন পথে যেতে বল্লভেরে দিয়েছিল আনি
মধুমদিরার রসে বেদনার নেশা
দুঃখে সুখে মেশা ;
সে রক্তের রিক্ত পাত্রে আজ শুষ্ক অবহেলা,
মধু গুঞ্জনহীন যেন ক্লান্ত হেমন্তের বেলা।"

আজ মৃত্যুর সান্নিধ্যে এসে ভাবছে, হয়তো পরপারে 'দুর্মূল্য' কিছু মিলছে—

"পরিত্যক্ত একা বসি, ভাবিতেছে পাবে বুঝি দূরে
সংসারের গ্লানি ফেলে স্বর্গ-ঘেঁষা দুর্মূল্য কিছুরে॥"

এ কল্পনাই মানুষকে মৃত্যুর ভীতি থেকে রক্ষা করে। চলে যেতে হবে, চলে যেতে হবে অনেক দূরে আত্মীয়-পরিজনহীন দেশে, বার বার কবি বলেছেন তাই—

"এ বাসার মেয়াদের শেষে
যেতে হবে আত্মীয়পরশহীন দেশে
ক্ষমাহীন কর্তব্যের ডাকে।"

সবশেষে—

"পথিক চলিল একা
অচেতন অসংখ্যের মাঝে।
সাথে সাথে জনশূন্য পথ দিয়ে বাজে
রথের চাকার শব্দ হৃদয়বিহীন ব্যস্ত সুরে
দূর হতে দূরে॥"

কিন্তু তবুও মনে পড়েছে—

"বহু দিনরজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।"

পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছেন, অথচ পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ তাঁর পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত থাকছে।

পৃথিবীকে তিনি ভলোবেসেছিলেন, ভালো লেগেছিল তাঁর কাছে অপূর্ব সুষমা। এ ভালো লাগাটি তিনি পেছনে ফেলে যাচ্ছেন।

বিদায়ের আগে তিনি জানিয়ে দিতে চান যে, পৃথিবীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা অক্ষয় ছিল, তিনি পৃথিবীর অজস্র পথযাত্রীদেরই একজন। যৌবনে দ্বিধাহীনভাবে চলেছিলেন পৃথিবীর পথে, লোকের জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি—

"একদিন তরীখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে
বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে।
তোমরা শুধায়েছিলে মোরে ডাকি,
"পরিচয় কোনো আছে না কি,
যাবে কোন্‌খানে।"
আমি শুধু বলেছি, "কে জানে।"

সেদিন যৌবনের বেদনায় হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছিল, প্রেমাপ্লুতা তরুণ-তরুণী তাঁকে আপনার বলে গ্রহণ করেছিল—

"নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান,
একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান।
সেই গান শুনি
কুসুমিত তরুতলে তরুণতরুণী
তুলিল অশোক,
মোর হাতে দিয়া তারা কহিল, "এ আমাদেরি লোক।"
আর কিছু নয়,
সে মোর প্রথম পরিচয়।"

আজ বিদায়ের পূর্বাহ্নে পৃথিবীর লোকেরা তাঁকে চিনতে পারছে না, কিন্তু তবুও তিনি তাদেরই একজন বলে খ্যাত হতে চাচ্ছেন—

"ভাঁটার গভীর টানে
তরীখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে।

নতুন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়ে
 সুধাইছে দূর হতে চেয়ে,
"সন্ধ্যার তারার দিকে
 বাহিয়া চলেছে তরণী কে।
সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
 গাহিলাম আরবার,
মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
 আমি তোমাদেরি লোক,
 আর কিছু নয়—
 এই হোক শেষ পরিচয়।"

পৃথিবীর প্রতি এ ভালোবাসাই শেষপর্যন্ত কবিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। দুর্দশা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। দুর্দিনে মৃত্যু তাঁকে লাঞ্ছিত করতে পারে নি, প্রেমের আকুলতা তাঁকে মহীয়ান করেছে।

কবি সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়েছেন মৃত্যুকে বন্দনা করতে নয়, শেষ বারের মতো পৃথিবীকে দেখতে।

কবি কায়কোবাদ

কবি কায়কোবাদ তাঁর বহুবিস্তৃত অতীতকে নিয়ে বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই এ দীর্ঘ সময়ে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে—বাস্তবের প্রকাশ্য ক্ষেত্রে না হলেও মননের ক্ষেত্রে-যে হয়েছে তা নিশ্চয়ই। কবির জীবন কখনও সৃষ্টির একক রূপ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, তাঁর জীবন দীপ্যমান হয়ে ওঠে সৃষ্টি-শতদলের প্রতিটি পরাগের অপূর্ব বিকাশে। সে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্প মানব-জীবনের সৌন্দর্য ও সৌরভের আকর। কবি কায়কোবাদের কাব্যে সে বিচিত্রতা রয়েছে। হয়তো বা তা সর্বক্ষেত্রে গভীর দ্যুতিময় নয় কিন্তু তাতে ইঙ্গিত রয়েছে নব-সৃষ্টির ও নবীন জীবনের। পরিপূর্ণতা না থাকলেও নব নব ইঙ্গিতে তা শোভমান। কায়কোবাদের কাছ থেকে পেয়েছি গীতি-কাব্যের তন্ময়তা—শুধুমাত্র সুখালসে লিপ্ত নয়, বেদনা-রঞ্জিত উপাখ্যানও। বস্তুতঃ বেদনার সুরই যেন তাঁর প্রধান সুর। বেদনার্ত মুহূর্তের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে তিনি সহজ ও নিরাভরণভাবে প্রকাশ করেছেন। এতে প্রয়াসের পরিচয় একেবারেই নেই কিন্তু তাই বলে ভাবনার গতি শ্লথ ও মন্থরও নয়, বরং তা দীপ্তিমান এবং একান্তভাবে কবিমনের কথকতায় মুখর। 'অশ্রু-মালায়' প্রখর প্রতিভার স্বাক্ষর আছে কিনা সে বিচার এখানে করব না, কিন্তু তা যে কবি-মানসের বহুধাবিভক্ত বিচিত্র অনুভূতির ভাণ্ডার তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কবির কত বিভিন্ন মুহূর্তের কান্না এখানে যেন জমাট বেঁধে আছে। এ কান্না অহেতুক নয়, এতে বিলাসিতার মোহ নেই; এ অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক এবং সেজন্য তাতে হয়তো আঙ্গিকগত ত্রুটি আছে। গ্রাম্য কবিদের রচনার মধ্যে ভাবগত পারম্পর্য থাকে না, চিন্তার শিথিলতাও থাকে। ভাষা তাদের ত্রুটিপূর্ণ নিশ্চয়ই কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাদের কাব্যে সূক্ষ্ম আন্তরিক অনুভূতির দ্যোতনা থাকে এবং সেজন্যই তা প্রাণবন্ত ও আনন্দময়। কায়কোবাদের গীতি-কাব্যে এ আন্তরিক অনুভূতি খুবই স্পষ্ট।

'I sing because I must,' ইংরেজ কবির মত তিনিও এ-কথা বলতে

পারেন। তাঁর কাব্য স্বত উৎসারিত, তাতে চিন্তার পরিচয় নেই। অনেক সময় অত্যন্ত সাধারণ ভাবনা-চিন্তার রূপায়ণ তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ হলেও তা অগ্রাহ্য করবার মতো কিছু নয়, কেন না, তাতে আন্তরিকতার প্রশ্রয় আছে। নিজের বাড়ির কথা, ছোটখাটো স্নেহ-প্রেমের গুঞ্জন এবং আরও অনেক কিছু যা সংক্ষিপ্ত এবং সহজ—সমস্ত মিলে যে সুর উৎসারিত তা মায়াময় এবং করুণ। কবি কায়কোবাদ জীবনকে এমন কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করেন নি, যেখান থেকে তা সুঠাম, সুন্দর এবং মনোহর দেখায়। তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ ও ঋজু। আবিষ্টতা নেই, চঞ্চলতা নেই—স্পষ্ট ও নিরাভরণ তাঁর বাণী; সঙ্কীর্ণ হলেও দীর্ঘ ও অমলিন তাঁর গতিপথ।

মহাকাব্য তিনি লিখেছেন যথেষ্ট। এদের দীর্ঘত্ব পীড়াদায়ক, কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় এ কথা ভেবে যে, কি করে একই সুরকে বিলম্বিত করে বহুক্ষণ অব্যাহত রাখতে পেরেছেন—একটি বিশেষ চেতনাকে দ্বিধাহীনভাবে বহুদূর টেনে নিয়ে গেছেন। বর্তমানকালে মহাকাব্যের বিলম্বিত ক্লান্ত সুর আমাদের মনে কোনো আবেশের সৃষ্টি করে না। আমরা মুহূর্তের জন্য তন্ময় হতে ভালবাসি কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য নয়। কিন্তু তবুও সুদীর্ঘ এক দীপ্ত সুরে ভৈরবী রাগিণী রচনা করা স্বল্পক্ষমতার পরিচায়ক নয়। ইংরেজীতে যাকে বলে: **The radiant capacity of continuing an impulse,** তা কায়কোবাদের মধ্যে আছে এবং শুধু সেইজন্যই যদি প্রশস্তি দিতে হয় তবে তা অন্যায় হবে না। 'মহাশ্মশান' বিপুলকায়, কিন্তু কাব্যিক সৌন্দর্যও তাতে আছে। উপমা, অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা ও চিন্তার সৌন্দর্যে কোন কোন স্তবক ও চরণ অপূর্ব দ্যুতিময়। সর্বজন-পরিচিত, বহুবার উল্লিখিত নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি চরণ সৌরভ ও সৌন্দর্যে অমলিন—

> 'বাঁধিলা কবরী
> উঠাইয়া ভুজদ্বয়, বাঁকিয়া পশ্চাতে;
> অনঙ্গের ধনুপ্রায় দু'টি পুষ্পকলি
> শোভিল সে মনোহর অনঙ্গ-ধনুকে।'

গভীর বিদ্যাবত্তা কায়কোবাদের ছিল না। শিক্ষা তাঁর স্বল্প; ব্যাপক অধ্যয়নের সুযোগ তাঁর কখনও হয় নি, বহির্জগৎকে তিনি এড়িয়ে চলেছেন

সর্বদা, কিন্তু এসব-সত্ত্বেও যে-প্রতিভার স্বাক্ষর তাঁর রচনায় আছে, তা তুচ্ছ করবার মতো নয়। গদ্য রচনায়ও তাঁর যথেষ্ট হাত আছে। সে সব রচনার মধ্যে যে-যৌক্তিকতার প্রয়াস আছে উচ্চ শিক্ষার ন্যূনতার জন্য তা হয়তো মার্জিত হতে পারে নি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণীয় নয়। যে-যুগে তাঁর জন্ম সে-যুগের পরিবেশকে স্বীকার করে নিলে এ স্বল্প ক্ষমতাকেও অপূর্ব বলতে হয়।

কায়কোবাদের মধ্যে অন্য একটা বস্তু বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো। সত্য-প্রীতি তাঁর যথেষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে কাব্যিক সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করেও তিনি সত্যের প্রচারক হয়েছেন। 'মহরম-শরীফ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কাব্য সৌন্দর্য-হেতু বটে কিন্তু সেজন্য তা নিত্য-বর্জিত ও নীতিবিগর্হিত হতে পারে না। ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতকের কবি **Crabbe** বলেছিলেন যে, তিনি কাহিনী রচনা করবেন এমনভাবে যে, তাতে স্পষ্ট সত্যের ইঙ্গিত থাকবে কিন্তু অহেতুক সৌন্দর্যের তন্ময়তা থাকবে না— **as Truth will paint it and Bards will not.** কায়কোবাদের মনও **Crabbe**-এর মতো। "মহরম-শরীফ" গ্রন্থ প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত ইতিহাসের যথাযথ কাব্যিক রূপায়ণ। কাব্য-হিসাবে এটা উত্তীর্ণ হল কিনা কাব্য-সৃষ্টির পূর্বাহ্নে এ চিন্তা কবির মনে জাগে নি, তিনি শুধু চেয়েছেন সত্য ও সুনীতির যথার্থ বিকাশ। সুন্দরের পাদপীঠে সত্যকে লাঞ্ছিত করবার আকুলতা তাঁর ছিলো না কখনও, আনন্দের জন্য অনৃত বস্তুকে আবাহন তিনি কখনও করেন নি; যা সত্য তা স্বয়ম্ভু, চিরন্তন ও মঙ্গলময়—এই তাঁর বলবার কথা। কবিমনের রসবোধে এ ধারণা কোনো পীড়া জাগায় কিনা, এ বিচার এখানে করবো না, তবে ধর্মপ্রাণ বয়সী ব্যক্তিরা এতে সন্তুষ্টই হবেন। কল্পনার সত্যকে কায়কোবাদ গ্রাহ্য করতে চান না। কল্পনার জগতে রোমান্টিক ভাবোন্মাদনা কায়কোবাদের নেই। সত্যের স্বাক্ষরকে তিনি স্পষ্ট করেছেন, কল্পনার জগতে **Nurslings of immortality** তিনি গড়ে তোলেন নি।

কায়কোবাদের কাব্য-চিন্তায় ইতিহাস একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে। তিনি সমৃদ্ধির আশ্রয় হিসেবে ইতিহাসকে গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয়তাবাদের প্রেরণা-লক্ষ্য হিসেবে ইতিহাসের সঞ্চয়ের তাঁর প্রয়োজন

ছিল। কবিতার রহস্যময়তা ও গীতি-তন্ময়তাকে অস্পষ্টতার যুক্তিতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন বলেই ইতিহাসের সুস্পষ্টতা এবং গতিধারাকে কাব্যের উপকরণ করেছিলেন। ইতিহাসের পূর্ণ ব্যবহারে 'মহরম শরীফ' কাব্য তথ্যের পরিমার্জনা সহ যথার্থ ইতিহাস-নির্ভরতার পরিচয় বহন করছে। তিনি এ কাব্যে—

ক. কাহিনীর রসমূর্তির প্রয়োজনে কোনও কাল্পনিক ঘটনার সংযোজন করেন নি;

খ. কাহিনীর প্রয়োজনে বিশিষ্টার্থক ঐতিহাসিক তথ্যাবলী নির্বাচন করেছেন;

গ. ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নির্বাচিত তথ্য থেকে সর্বপ্রকার ভ্রান্তি ও বিকার দূর করেছেন।

মুসলমান সমাজে আপন ইতিহাসের প্রতি সম্মোহন ছিলো কায়কোবাদের কালের যুগধর্ম। ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোজাম্মেল হক, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ এমদাদ আলী প্রমুখ সাহিত্যিক ও চিন্তানায়ক ইসলামের ইতিহাসকে জীবনের সর্বক্ষণের আশ্রয় হিসেবে চিন্তা করেছিলেন। ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁদের নির্মাণ করতে হয় নি। হিন্দুদের মতো ইতিহাসের কোনও কোনও দেশ-কালে কাল্পনিক উপাখ্যান রচনা করতে হয় নি। একটি বিরাট প্রত্যাশার মতো ইসলামের উন্মেষ-যুগের জয়, আনন্দ এবং উদ্দীপনা তাঁদের চিন্তা ও শিল্পকর্মের জন্য সজীব পটভূমি হয়েছিলো।

'মহরম শরীফ' কাব্যের ভূমিকায় কায়কোবাদ লিখেছিলেন, "আমি 'মহরম শরীফ' বা 'আত্মবিসর্জন কাব্য' লিখিতে যাইয়া সম্পূর্ণরূপেই ইতিহাসের অনুসরণ করিয়াছি। কাব্যের সৌন্দর্য-বৃদ্ধির জন্য কল্পনার সাহায্য লইয়া কোনরূপ অলীক ঘটনার অবতারণা করি নাই।"

শাহাদাৎ হোসেন

১

প্রথম মহাযুদ্ধের বিপর্যয় বাংলা সাহিত্যকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে নি। যদিও এ দুর্যোগ য়ুরোপে নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি, কিন্তু আমরা শুধু এর আকস্মিকতাতেই নির্যাতিত হয়েছিলাম—আমাদের নিশ্চিন্ত জীবনধারায় এ কোনো আবেগ সৃষ্টি করে নি। বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারার পুরোভাগে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, তাঁর দৃষ্টি ছিলো অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। আকাশের মতো সীমাহীন ব্যাপকতা নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করেছিলেন, তাই প্রান্তরের তৃণাঙ্কুর তাঁর মেঘলোককে স্পর্শ করতে পারে নি। বহুদূরে সংঘটিত এক বিশৃঙ্খলা তাঁর কাব্যের গতিপথকে ব্যাহত করে নি। অশেষ উদারতা নিয়ে স্মিতহাস্যে যে-পৃথিবীর দিকে তিনি তাকিয়েছিলেন, সে পৃথিবী আজ অবশ্য মৃতপ্রায়, কিন্তু ঘনান্ধকারে অবলুপ্ত শ্রান্তিময় জীবনের প্রহরে তাঁর কাব্য এখনও মধুকর-গুঞ্জনের মতো শোনায়। শুধুমাত্র এ কারণেই রবীন্দ্র-কাব্যধারার অনুসারী প্রাক্তন জীবন-বোধের কোনো কবিকে বর্তমানে অস্বীকার করা চলে না। কবি শাহাদাৎ হোসেন এই ধারারই সমর্থক ও অনুসারী। গতানুগতিক ধারায় তিনি বিপর্যয় আনতে চান নি; যে-জীবন একদিন সমুদ্রের মতো উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠ ছিলো, সে-জীবনকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। রবীন্দ্রযুগে অধিষ্ঠিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের ছায়াচ্ছন্ন হয়েই তিনি লালিত, পরিবর্ধিত ও গৌরবান্বিত।

২

প্রথম মহাযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যকে স্পর্শ করেছিলো অনেক দূর থেকে। নজরুল ইসলাম যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ভয়াবহতার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয় নি। যুদ্ধ-রত সৈনিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি দেশে ফিরে এলেন। স্বল্প হলেও এই নবতম অভিজ্ঞতা তাঁর চেতনায় দোলা সৃষ্টি করলো। বাংলা কাব্যের স্রোতোধারায় তিনি

উপলখণ্ডের বাঁধ রচনা করলেন। অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শান্ত তটিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, কিন্তু তা স্তিমিতও হয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গেই। আকস্মিকতায় মাদকতা আছে, উচ্ছ্বাস আছে এবং সে উচ্ছ্বাস অনুচ্চারিত নয়—অত্যন্ত মুখর; কিন্তু তাতে গভীরতা নেই, ব্যাপকতা নেই, আনন্দের উদার শিথিলতা নেই। এ কারণেই নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কহীন, সম্পূর্ণ নতুন এবং বিশিষ্ট। তাঁর চঞ্চল মন দুর্দমতার উৎস-সলিলে অবগাহন করেছিলো, কিন্তু লোকোত্তর সৌন্দর্যের সংবাদ তাঁর কাছে এসে পৌঁছোয় নি।

এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রভাব এড়াতে গিয়ে নতুন কাব্যসৃষ্টির চেষ্টা হলো এখানে সেখানে। যুদ্ধের ফলে য়ুরোপের সমাজজীবনে ও মানুষের স্থির বুদ্ধিতে যে-বিশৃঙ্খলা এসেছিলো তার পরিচয় বহন করছে **T.S. Eliot**-এর কবিতা। তাঁর জীবন-বোধ আমাদের জন্য কখনও সত্য ছিলো না, কিন্তু অনুশীলন ও অনুকরণের পথ বেয়ে তা আমাদের একান্ত সান্নিধ্যে এলো। আমাদের কাব্যে আধুনিকতা এলো ইলিয়টের অনুবর্তনের মাধ্যমে। কিন্তু আধুনিকতা যে-ভাবেই আসুক, তার ফল অশুভ হয় নি। প্রাচীন রচনাশৈলীর অনুশাসন স্বীকার করে বাংলার কাব্যে এই প্রথম নতুন এক্স্‌পেরিমেন্টের সূত্রপাত হল। সকল দেশের কাব্যের পক্ষেই উদ্যম-রহিত অবস্থা কল্যাণপ্রদ নয়, বার বার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই কবিতা পূর্ণাবয়ব হয়। কিন্তু প্রাক্তন ধারার অধিকারী যাঁরা, তাঁদের পক্ষে পরিবর্তনকে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। শাহাদাৎ হোসেনও "গুঞ্জমালা বিভূষণা" অতীতের স্বপ্নের দয়িতাকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। তিনি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের অনুসারী, অধিকারী ও শ্রদ্ধাবিনত ভক্ত। নজরুল ইসলামও সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিন্তাধারায় রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহ থেকে যে ব্যতিক্রম ছিলো শাহাদাৎ হোসেনের মনে তা কোনও আবেশ সৃষ্টি করে নি। তাঁর গতিবিধি স্বপ্নের জগতে:

"লোকান্তের কল্পকুঞ্জে মন্দার শয়নে
আধ-ঘুমে আধ-জাগরণে
লক্ষ যুগ-যুগান্তর ধরি'
আপনা পাসরি'
মগ্ন ছিনু যবে আমি চিত্রার স্বপনে;

লীলায়িত তনুভঙ্গে চঞ্চল চরণে
নৃত্যরঙ্গে স্বরনটী অপাঙ্গ-লীলায়
ইঙ্গিতে ডেকেছে মোরে কেলিকুঞ্জে রঙ্গ-মণিকায়

৩

কোনো কবিকে বিচার করতে হলে তাঁর আদর্শের দ্বারাই তাঁর মূল্য নিরূপণ করতে হবে। যে-ভাষায়, ছন্দে ও কল্পনায় তাঁর বক্তব্য মূর্ত হয়েছে, যে-আশ্বাসে তাঁর মননশীলতা পরিপুষ্ট হয়েছে, যে-জীবনবোধের পরিধিতে তাঁর কাব্যের উদ্গম, তাঁর কাব্যবিচারে সেগুলোই হবে আমাদের মাপকাঠি। বর্তমানের গৃহীত আদর্শের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও সংযোগ থাকতে না পারে, কিন্তু কবির কাব্যে তাঁরা যদি সন্ধ্যার রক্তিম সূর্যের মত আলো হয়ে জ্বলে উঠে থাকে, তবে তাই তো যথেষ্ট। শাহাদাৎ হোসেনকে তাই আমরা আধুনিক কাব্যের মাপকাঠিতে বিচার করবো না। তিনি আপনাকে কল্প-লোকবাসী বলে অভিহিত করতে চাচ্ছেন—কল্পলোকে তাঁর উদ্ভব কিন্তু ধরণীতে তাঁর বিকাশ ও অধিষ্ঠান :

"স্বাগত হে কবি আজি ধরণীর পুষ্পিত যৌবনে
সেবিকার দীন আমন্ত্রণে
লহ তবে অর্ঘ্যভার
পূজা উপহার
বাঞ্ছিত অতিথি তুমি কল্পলোক-বাসী
হে চির উদাসী।"

'ধরণীর বনকুঞ্জ' তাঁর কাছে 'আনন্দ-প্রবাস' মাত্র। তিনি এখানকার 'শ্যামল মায়ায়' নতুন করে জাগরিত হয়েছেন। তাঁর রচনায় অতিরঞ্জন নেই, তাঁর স্বপ্নে, সৌভাগ্যে ও কল্পনায় যে-পৃথিবী বিধৃত হয়েছে তা 'কল্প-তুলিকা'য় অঙ্কিত 'রূপচ্ছবি মাত্র'। তাঁর কাব্য-জীবনের পক্ষে এ এক পরম সত্য। মৃত্যুহীন সৌন্দর্য অনবরত বিবর্তমান পৃথিবীর আশ্রয়ে ধরা পড়ে না, তাই কবি বার বার প্রয়াণ করেছেন কল্পনার ও স্বপ্নের জগতে। তাঁর

পৃথিবী কোনও একদিন সূক্ষ্ম এক আলোর স্পর্শে জেগে উঠেছিলো। প্রাত্যহিক জীবনের আবিলতার পরিচয় তাতে ছিলো না :

> "শ্যামায়িত সৌন্দর্যের ফুল্ল শতদল
> জাগিল ধরিত্রী-ধরা বর্ণ-গন্ধ রূপশ্রী-সম্ভারে।"

তিনি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ ও অন্তরের অনুভূতির মধ্যে এক দ্বন্দ্বের পরিচয় পেয়েছেন। তাঁর ধারণায় এরা একে অন্যকে অন্তরাল করে রেখেছে এবং সর্বশেষে আত্মগোপন করেছে দুজ্ঞেয় রহস্যের মধ্যে। এ-কারণেই এদের রহস্যের গূঢ় আবরণ উন্মোচন না করে তিনি আপনাকে দ্বিধাহীন কল্পনার মধ্যে উজ্জীবিত করেছেন। তাঁর কাছে এই কল্পনার পৃথিবীই একান্ত সত্য, এর মোহন ইন্দ্রজাল তাঁর দৃষ্টির সীমায় অপরিচিতার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছে।

বর্তমানের যে-অনুভূতি সমাজগত ও রাজনৈতিক কারণে কাব্যকে শিক্ষা ও প্রচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে জেনেছে, সে অনুভূতির সঙ্গে শাহাদাৎ হোসেনের পরিচয় নেই। তাঁর কাব্য সৌন্দর্যহেতু।

৪

কবিতার সার্থকতা নির্ভর করে বক্তব্যের যৌক্তিকতা বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপরে নয়, কবিতার সার্থকতা প্রকাশ পায় শ্রোতা অথবা পাঠকের মনকে পরিপূর্ণ করে দেবার মধ্যে। এই পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায় ব্যবহৃত শব্দের প্রাণশক্তি, ছন্দোময় অনুবর্তন ও দীপ্তির মধ্যে। বক্তব্য ক্ষেত্র-বিশেষে কখনও নিরাভরণ, কখনও সালঙ্কার, কিন্তু শব্দকে অস্বীকার করে কখনও তা স্পষ্ট হয় না। শব্দপ্রয়োগের বৈচিত্র্য বক্তব্যে বৈচিত্র্য আনে। **Walter Pater**-এর কথায় প্রত্যেক সত্যিকার কবি "**begets a Vocabulary faithful to the colouring of his own spirit, and in the strictest sense original,**" এই **Vocabulary** বা শব্দপুঞ্জ সৃষ্টির মধ্যেই কবির বিশিষ্টতা। কবিকে শিল্পী হতে হবে। শব্দ তাঁর সৌন্দর্যসৃষ্টির উপাদান। নির্বিশেষে তথ্য পরিবেশন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি তার সঙ্গে সুঠাম শব্দের সঙ্গতি না থাকে। বক্তব্য ও বাচনভঙ্গী একীভূত হবে বর্ণনায় ও তথ্য-পরিবেশনে। "Absolute accordance of expression to idea"—কাব্যে একান্তভাবে এটারই প্রয়োজন। বক্তব্য ও বাচনভঙ্গীর একাঙ্গীকরণের চেষ্টা শাহাদাৎ হোসেন করেছেন। শাহাদাৎ হোসেনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, তাঁর কাব্য সুন্দর শব্দপুঞ্জ মাত্র, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। এ অভিযোগ কিছুটা সত্য হলেও এটাও অধিকতর সত্য যে, শাহাদাৎ হোসেনের কাব্য স্থিতি পেয়েছে সুঠাম শব্দের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর। এই শব্দ-প্রয়োগের কতকগুলো বিশিষ্টতা আছে। প্রথমত, সংযুক্তবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের আত্যন্তিক বিন্যাসে স্বর-ঝঙ্কারের সৃষ্টি; দ্বিতীয়ত, অক্ষরগত ও ঝঙ্কারগত অনুপ্রাসের জন্য পদ-লালিত্য-বৃদ্ধি; তৃতীয়ত, পদ-মুক্ত পয়ারের বিলম্বিত লয়ের জন্য ভাব-গাম্ভীর্যের সৃষ্টি।

১. সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগ :

ক. গীতিচ্ছন্দে মর্মলিপি পাঠাইল দূরান্তের কোন্ নর্মরাণী।

খ. সিন্ধুবুকে গীতিচ্ছন্দে জাগিল সে নগ্ন সাগরিক।

গ. প্রতিধ্বনি তোলে সিন্ধু তরঙ্গ দুস্তরে।
আকাশের নীল আস্তরণে
মৌন মন্ত্র রণে
চন্দ্র সূর্য তারকার জোতিষ্ক-মণ্ডলে
শব্দহীন সে-বাণীর তরঙ্গ উথলে।

ঘ. অনির্বাণ বহ্নি-শিখা জ্বালায়েছে
অন্তরে তোমার।
দীপ্ত রশ্মি রাগে তার
দুর্গম তিমির পন্থ সমুজ্জ্বল দীর্ঘ
শতাব্দীর।

ঙ. বুভুক্ষিত বাৎসল্যের এই মহালীলা চিরন্তন,
অন্তর্গূঢ় মমতার এই ঘন উদগ্র কম্পন,
চলেছে তোমার মাঝে নিত্য নিশিদিন
বিরাম-বিহীন।
উন্মাদ আগ্রহ-ভরে দুর্দম আবেগে
অন্তহীন দুর্নিবার ফেনিল উদ্বেগে
নিত্য-যুগ-যুগান্তর চাহিয়াছ যারে,
একান্তে নিবিড় কোরে লভিয়াছে তারে
তোমারে দিগন্ত কূলে দূরান্ত রেখায়
তোমারি নীলিম স্বপ্নে কাননিকা দুলে যেথা
শ্যামল বেলায়।

উপরের উদ্ধৃতিগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সংযুক্ত বর্ণের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন শব্দে প্রস্বরের সৃষ্টি হয়েছে এবং ইংরাজীর মতো শব্দাংশগত ঝোঁকের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঝোঁক চরণগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সুষমা এনেছে বক্তব্যে :

২. অনুপ্রাসের প্রয়োগ :

ক. লীলায়িত তনুভঙ্গে চঞ্চল চরণে — ল ন
নৃত্যরঙ্গে স্বরনটী অপাঙ্গ-লীলায় — ন ল
ইঙ্গিতে ডেকেছে মোরে কেলিকুঞ্জে — ন
রঙ্গ-মণিকায়।

খ. বন-কুঞ্জে জাগাইয়া হিমশীর্ণা মাধবীর
ঘুমন্ত মঞ্জরী — ন ম

গ. নীহার হিমাশ্রুধারে অভিষিক্তা
নিখিলের রাণী — ন

ঘ. মঞ্জীর মধু গুঞ্জরি এস সুন্দর নটরায় — ন র

ঙ. ভৈরবে ভেরী গরজে গভীর তূর্যে তুরীয় তান — ভ র ত

অনুপ্রাসে পদলালিত্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু শুধুমাত্র এটুকুই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অনুপ্রাস যেখানে উচ্চারিত, ধ্বনির মধ্যে

ভাবের নিঃসংশয় বিকাশ ঘটাতে পারে সেখানেই তার মূল্য ও মর্যাদা। উপরের উদ্ধৃতির প্রথম উদাহরণে আমরা নৃত্যরতা রূপসীর পদচারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তৃতীয় উদাহরণে শীত-সিক্ত বনানীর শ্রান্তি ধরা পড়েছে এবং সর্বশেষ উদাহরণে আত্মস্থ ও বিজয়ীর বিজয়োদ্ধত উল্লাসের চিহ্ন রয়েছে।

৩. পদ-স্বচ্ছন্দ পয়ার :

ক. ঊর্মিনাটে মন্দাকিনী
তটিনী-নটিনী
অশ্রান্ত নর্তনে মোরে জানায়েছে অন্তরের গোপন কামনা
চিত্রার স্বপনে তবু মুগ্ধ আমি
আছিনু উন্মনা।

খ. আদি নাই—অন্ত নাই—নাহিক বিরতি।
সৃষ্টি-স্থিতি—
প্রলয়ের সাক্ষী এই বাণীময় উদাত্ত সঙ্গীত
কি গূঢ় রহস্য এর—গোপন ইঙ্গিত!

গ. অন্তরে-বাহিরে এই দ্বন্দ্ব চিরন্তন
অনুক্ষণ—
চলিয়াছে, চলিবে সে আদি-অন্ত যুগ যুগ ধরি।
একে আরে অন্তরাল করি,
দুর্জ্ঞেয় রহস্য মাঝে আপনারে রেখেছে লুকায়ে
সবারে ভুলায়ে।

উপরের উদ্ধৃতিতে পয়ারের যে-বিশেষ রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের হাতেই সর্বপ্রথম তা পূর্ণতা পায়। পয়ারের এইরূপ ধ্বনির বিলম্বিত লয়ের জন্য ভাব-গাম্ভীর্য সৃষ্টি খুব সহায়ক। পর্বভূমক ছন্দের পদ-চাপল্য এখানে অনুপস্থিত, সমমাত্রার চরণের সহজ নির্ভরতা এখানে নেই। চরণে চরণে বৈষম্যের জন্য ও বিভিন্ন পদভাগে সমমাত্রার প্রসার না হওয়ায় ছন্দে বৈচিত্র্য এসেছে এবং ভাবে সমৃদ্ধি জেগেছে। শাহাদাৎ হোসেনের শিল্পকুশলতা এই ছন্দের ক্ষেত্রে বিশেষরূপে স্পষ্ট।

শাহাদাৎ হোসেনের আর একটি বিশেষত্ব হল বক্তব্য-সম্প্রসারণে নাটকীয় আকস্মিকতা। উদাহরণ-স্বরূপ "কোরবাণী"র প্রথম স্তবকের উল্লেখ করা যায়—

"তুম্বা-উট পার হোল শতকে শতকে
তবু এল স্বপ্নাদেশ—
মরমের মর্মধন ইব্রাহিম দিলে না আমারে।
একি লীলা ছলনা কুহক!
ইহলোকে যা-কিছু আমার
সমর্পিনু সকলি চরণে,
তবু আশা সম্পূর্ণ হোল না তোমার!
কি আছে, কি দিব আর—
নিঃস্ব আমি ভিখারী কাঙাল।"

আশ্চর্য নাটকীয় আকস্মিকতায় ঘটনার মূল তথ্যকে কবি উদ্‌ঘাটন করেছেন। পুঞ্জীভূত শব্দসম্ভার ও চরণান্ত মিলের বাহুল্য এখানে স্পষ্ট নয়—এখানে ইব্রাহিমের সর্বত্যাগের বিপুল আবেগ স্পষ্ট হয়েছে।

নাটকীয় আকস্মিকতার নিদর্শন-স্বরূপ আরো দু'টি কবিতার প্রারম্ভিক কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি। "সিরাজের স্বপ্ন"-এর আরম্ভে সদ্য রাজ্যহারা পরাজিত, লাঞ্ছিত নবাবের অতীতের অজস্র প্রমাদ ও স্খলনের স্বীকৃতির মধ্যে আপনার অসহায় অবস্থার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে, ধূল্যবলুণ্ঠিত গৌরবের হাহাকার অশেষ বেদনার মধ্যে মূর্ত হয়েছে—

'ভুল-ভুল, মুহূর্তের ভুলে রসাতলে
গেল বঙ্গ-বিহার-উৎকল। পলাশীর
সর্ব-গ্রাস—ধাত্রীরূপা রে রাক্ষসী!
ক্লেদরক্ততলে তোর নিশ্চিহ্ন করিয়া
দিলি জলন্ত দীপকে;—দিগন্ত বিথারে
ঘনাইয়া দিলি সন্ধ্যা অনন্তযুগের।'

"জাহাঁগীরের আত্মসমর্পণ"-এর আরম্ভে এই আকস্মিকতায় নূরজাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্ষণদ্যুতির মতো অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পরিজন-

পরিত্যক্তা অথচ রাজ-সান্নিধ্যে গৌরবান্বিতা মেহের আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে স্বস্তি খুঁজছে :

“দুর্বোধ্য এ রহস্য-বিধান। দিল্লীশ্বরী
মেহেরউন্নিসা। নূরজাহাঁ অভিধান
তার। সত্যই কি জাহানের নূর আমি,
কিম্বা দৃষ্টিভ্রম সম্রাটের?—সত্য যদি,
রূপমোহে অন্ধ তবে দিল্লীর ঈশ্বর।
প্রেম শুধু অভিনয় তার। অনির্বাণ
ভোগ-বহ্নি-দীপ্ত দাবানল মর্মবন
দহিছে তাহার; প্রেম সেথা কোথা পাবে স্থান?”

গোলাম মোস্তফা : একটি বিশ্লেষণ

গোলাম মোস্তফা এ দেশের একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন এ নাম বহুবার উচ্চারিত হয়েছে কখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে, কখনও বিরক্তিতে, কখনও চূড়ান্ত স্বীকৃতিতে, কখনও অস্বীকারের প্রবণতায়, কিন্তু নির্বিবাদ অনুক্তভায় এ-নাম কখনও হারিয়ে যায় নি। তিনি এমন এক সময়ে আমাদের সমাজে এসেছিলেন, যখন আমাদের শিক্ষিত সমাজ একটি নির্ভরতা সন্ধান করছিলো। ভাষায়, উচ্চারণে, গানে এবং বিষয়ে একটি স্বতঃ-নির্ধারিত স্বকীয়তা—উচ্চাঙ্গের রূপাভিব্যক্তির কারণে নয় কিন্তু সুনিশ্চয় আত্মবিশ্বাসের দাবীতে। একটি জাতি ও সমাজে ধর্মগত একটি সহজ বিশ্বাসকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন তত্ত্ব, উপদেশ এবং ইতিহাসের মধ্যে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সুরের আনন্দের মধ্যে। এ-সব-সত্ত্বেও অথবা বলা যেতে পারে এ-সব কারণেই হয়তো তিনি আজীবন আপন বোধের রাজ্যে একটি বঞ্চনার বেদনা অনুভব করেছিলেন। জীবিত-কালেই তিনি দেখেছেন যে, যাকে তিনি চিরকাল আদর্শহীনতা ভেবেছেন তাই যেন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে। অনুক্ষণই যেন কর্মজগতে দুই বিরোধী আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা সার্থক হচ্ছে। যেখানে তাঁর বিশ্বাস ও চিন্তায় কোন আপোস ছিলো না, সেখানেই তিনি যেন পরাজিত হয়েছেন চূড়ান্তভাবে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ ক্ষোভ তাঁর চিত্তে বিদ্যমান ছিলো। যাঁরা তাঁকে সমর্থন করতেন, তাঁদের সম্পর্কেও তিনি পুরোপুরি নিঃসংশয় ছিলেন না। অবিশ্বাস করেন নি হয়তো, কিন্তু ভেবেছেন যে, এ সমর্থনের মধ্যে কোথায় যেন একটু অবহেলা আছে। কত বিচিত্র চিন্তায় পৃথিবী প্লাবিত হচ্ছে, আমাদের বিশ্বাসে কত নতুন নতুন সংযোজন হচ্ছে, আবার হয়তো অনেক দিনের বিশ্বাসের মধ্যে শিথিলতাও আসছে, কিন্তু কবি গোলাম মোস্তফা ধর্মগত একটি অনন্য চিন্তায় একজন নিষ্ঠুর শাসকের মতো জীবন কাটালেন এবং সে ক্ষেত্রে কোনও সমন্বয়কেই মানলেন না। মানুষের জীবনে স্বাভাবিক যে-দ্বৈতবোধ এবং কবির জীবনে যে-এক নিজস্ব অনন্য চিন্তা, কবির অনুভূতিতে এ-দুই অবস্থার মধ্যে

বিরোধিতা চিরকাল বিদ্যমান ছিলো। তাই যে-বেদনাকে তিনি নির্মাণ করেছিলেন তা থেকে তাঁর মুক্তি কখনও ঘটে নি।

দুঃখের কথা এই, কবি গোলাম মোস্তফার যে-একটি অসম্ভব মমতাময় এবং সৌন্দর্যপ্রিয় হৃদয় ছিলো, আদর্শ কথার কোলাহলে অধিকাংশের কাছে তিনি তা উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। বয়সের ব্যবধান থাকা-সত্ত্বেও এবং বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের বিবেচনার পার্থক্য মেনেও আমি এবং কবি গোলাম মোস্তফা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলাম। তাঁর অনেক নিভৃত ইচ্ছার কথা আমি জানি, অনেক ব্যক্তিগত কথা আমাকে বলেছেন এবং তাঁর আন্তরিক সৌন্দর্যধ্যানের পরিচয় বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকবার পেয়েছি।

আমাদের দেশে কবিতা ও কবি জীবনের মধ্যে একটি বিরূপ ব্যবধান প্রায়ই লক্ষ করা যায়। কবিদের গৃহ-সামগ্রী অবিন্যস্ত, পোশাক-পরিচ্ছদে অব্যবস্থা এবং সাংসারিক আচরণে দৃশ্যমানরূপে যথেষ্ট ঔদাসীন্য—কবি-পরিচয়ের জন্য এগুলো প্রায় অবধারিত হয়ে পড়েছে। কবি গোলাম মোস্তফার জীবনে এ প্রকার দৃশ্যমান বিকলতার কোনও চিহ্ন ছিল না। তিনি অত্যন্ত রুচিসম্মত পুরুষ ছিলেন। গৃহ-সজ্জাকে তিনি আধুনিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং অপরিচ্ছন্নতাকে কোনও দিন সম্মান করেন নি। অনেক মূল্যবান আসবাবপত্র দিয়ে তিনি-যে তাঁর ঘর সাজিয়েছেন তা নয়, কিন্তু গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে যা তিনি এনেছেন, তার মধ্যেই একটি পরিচ্ছন্ন শিল্পী-মনের পরিচয় ধরা পড়েছে।

কবি গোলাম মোস্তফা অতিথিবৎসল ছিলেন। তাঁর পরিচিত সকলেই তাঁর গৃহে কোনও না কোনও সময়ে আপ্যায়িত হয়েছেন। আমি লক্ষ করেছি যে, এ আপ্যায়নের মধ্যেও কোনও প্রকার অহমিকা ছিল না, স্বার্থবুদ্ধি ছিল না, ছিল একটি সহজ আনন্দ এবং অমায়িকতার প্রকাশ। যাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা হয়েছে এবং অনেক কটু কথায় যাদেরকে তিনি লাঞ্ছিত করেছেন এমন লোকদেরও তিনি তাঁর গৃহে অকৃত্রিম সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। প্রায়ই লক্ষ করা যায় যে, আমাদের কর্মজীবনের সংঘর্ষ ও বিরূপতা আমাদের গৃহজীবনকেও আচ্ছন্ন করে। আমরা কর্মপথের বিকারকে গৃহের মধ্যেও টেনে আনি। তার ফলে শান্তি থাকে না এবং আনন্দের সমৃদ্ধিকে সঞ্চয় করতে পারি না। কবি গোলাম মোস্তফা অত্যন্ত সহজভাবে শত্রু-মিত্র সকলকেই তাঁর আনন্দ উপভোগের সঙ্গী করেছিলেন।

অনেকের সঙ্গে তাঁর-যে নিগূঢ় মৈত্রীবন্ধন ঘটে নি তার কারণ তিনি

আদর্শগত কারণে তাদের সকলের শিল্প-সাধনাকে সম্মান করেন নি। তিনি ভেবেছেন যে, মুসলমান হিসেবে যে-বিশ্বাস তাঁর মনে প্রধান এবং প্রবল তা দেশ এবং কালের অতীত। ঐ আদর্শকে যারা গ্রহণ করেনি বলে তিনি ভেবেছেন অথবা এ আদর্শের প্রকাশ যাদের কাব্যে তিনি দেখেন নি, নতুন জাতি-নির্মাণের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় এদের রচনার কোনও স্বীকৃতি তিনি দেন নি। তাই তরুণ সম্প্রদায় তাঁকে এড়িয়ে চলেছে এবং অনেক সময় হয়তো পুরোপুরি অবহেলাও করেছে। সে কারণে সামাজিক মমত্ব-বন্ধনও এদেরে কবির নিকটে আনতে পারে নি। আমার মনে হয়, এজন্য কবি গোলাম মোস্তফা ততটা দায়ী নন, যতটা দায়ী আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের আধুনিক সমাজের পরিবর্তিত রূপ। আমি অনেকবার কবিকে বলেছি যে, যে-সমস্ত পরিবর্তন আসছে, সাহিত্যকর্মে সৃষ্টির সচলতার জন্য তা অপরিহার্য। এ পরিবর্তন একজনের মনঃপূত না হতে পারে কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করা হয়তো চলে না। যাঁরা প্রবীণ তাঁরা নতুনদের মত নিশ্চয়ই কখনও লিখবেন না কিন্তু তাই বলে নতুনদের লেখা একটি বিশেষ সময়ে সাড়া তুলেছে বলে পুরনো লেখা অর্থহীন হয় না। এক সময় কবি গোলাম মোস্তফার দানে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল, সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্বীকৃতি চিরদিন থাকবে, কিন্তু বর্তমানের নতুন আনন্দের মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফার শব্দ এবং সুর যদি না থাকে তা হলে দুঃখ করবার কিছু নেই। কবি গোলাম মোস্তফা আমার এ ব্যাখ্যার সব অংশটুকু মানতে পারেন নি, তার কারণ লেখক হিসেবে তিনি কখনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন নি। তিনি ভাবতেন যে, তিনি কবি হিসেবে সকল সময়ের জন্যই জীবিত। এটা অভিমানের কথা, সাহিত্যবিচারের নয়। প্রবীণ একজন কবির মধ্যে এ অভিমান থাকতে পারে, তরুণ সম্প্রদায়ের এ কথাটি জানা উচিত ছিলো।

আমাদের জীবনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্কট-মুহূর্তে গোলাম মোস্তফার প্রতিষ্ঠা। আত্ম-উদাসীনতার অনেক নিশ্চল অবস্থা কাটিয়ে আমরা যখন প্রথম স্বরাজ্য দাবীর কথা তুলছি, যখন নতুন করে ঐতিহ্য আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে এবং ধর্মের বন্ধনকে যখন প্রবলভাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়েছিলো, তখন কবি গোলাম মোস্তফা এ-সমস্ত চিন্তা এবং ইচ্ছাকে ছন্দে এবং সুরে তুলে ধরবার চেষ্টা করেন।

কিছুসংখ্যক বিবেচনা

মধ্যযুগের কাব্য

এক

মধ্যযুগের সঙ্গে আমাদের দুরতিক্রম্য ব্যবধান রয়েছে। এ ব্যবধান পরিবেশের, আদর্শের, অনুপ্রেরণা, জ্ঞান এবং জীবন-বোধের। বর্তমানের শিক্ষা এবং রুচিমাত্র সম্বল করে মধ্যযুগে প্রবেশ করা চলে না। সেজন্য প্রয়োজন সংস্কারমুক্ত হয়ে আনন্দিত চিত্তে এবং নতুন বোধের ও সমস্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করছি,—এ মনোভাবকে অনবরত জাগ্রত রাখা। যিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পাঠ করতে যাচ্ছেন, তাঁকে প্রথমে জানতে হবে যে, সে সাহিত্যের কতটা পাঠযোগ্য এবং কোন্ ক্রম অনুসারেই বা তা পাঠ করতে হবে। এ বিচার একান্ত প্রয়োজন, কেননা, অহেতু সময়ক্ষেপণ না করে স্বল্প পরিমাণের পাঠযোগ্য বিচিত্র সম্ভারের মধ্যেই তাঁকে পরিভ্রমণ করতে হবে। এ পরিভ্রমণের পথে প্রচণ্ড অস্বাভাবিক বাধা হচ্ছে ভাষাতত্ত্ববিদ এবং পণ্ডিতদের রূঢ় রুক্ষ আলোচনা, যে-আলোচনায় মূল্যবান হচ্ছে জীবনের চেয়ে পরিচ্ছদ এবং কাব্যের চেয়ে কবির জীবন-জন্ম-বাসস্থান সমস্যা। চণ্ডীদাস এক থেকে দুই হয়ে আজ বহু হতে যাচ্ছেন, কৃত্তিবাসের সন-তারিখ, রাজ-আনুকূল্য ইত্যাদি ঘটনার জটিলতা অতিক্রম করে রামায়ণের মর্মে প্রবেশ করতে আজও তাঁরা পারেন নি, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরের দোটানায় পড়ে আলাওল ত্রিশঙ্কু হতে যাচ্ছেন। এ অবস্থা থেকে মুক্তির প্রয়োজন আছে বলেই নতুন পাঠককে কিছুটা বিচার-বিশ্লেষণ করেই অগ্রসর হতে হবে। তবে আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে পৌঁছানো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য, মধ্যযুগের সাহিত্যক্ষেত্রে সে অসুবিধাটুকু নেই। বহুযুগের রুচি-অরুচির বেড়াজাল ডিঙিয়ে বহুলাংশে নিশ্চিহ্ন হয়ে সে সাহিত্যের যতটুকুই আমাদের আস্বাদনের জন্য এসেছে তার রসরূপের স্বীকৃতির জন্য নতুন যুগের পরীক্ষার দরকার করবে না। শুধু সে যুগের আদর্শের সঙ্গে বর্তমানের আদর্শের যে-ব্যতিরেক রয়েছে, তা সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করতে হবে। সে যুগের কবিতার বহিরঙ্গ ছিলো যুক্তি-নির্ভর, গতিতে ছিলো

সুশৃংখল সহজ পদচারণ—সুনির্মিত প্রাসাদের অঙ্গসৌষ্ঠবের সঙ্গে তার তুলনা চলে। কাব্যের সৌন্দর্য ছিলো বস্তুগত ও জাতিগত। ইংরেজীতে বলা চলে, of mass and of species. এ কারণেই মধ্যযুগের কবিদের পারস্পরিক তুলনা প্রায়শঃ অসম্ভব। উপাদান, কাহিনী-বিন্যাস, বস্তুনির্দেশ, রূপবর্ণনা এবং তত্ত্ব—সর্বক্ষেত্রেই একই ব্যঞ্জনা এবং একই শৃংখলিত রূপকল্প। এ প্রকৃতিগত ঐক্য অতিক্রম করে অল্প কয়েকজন কাব্যসাধক আপন বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। শুধুমাত্র সূক্ষ্ম কারুকর্মে নয়—অভিজাত কাহিনীর রূপায়ণে, ব্যঞ্জনার অন্তরঙ্গতায়, রসের অনির্বচনীয়তায় এবং সর্বোপরি জীবনের স্পর্শে তাঁদের সৃষ্টির জন্য রয়েছে ধ্রুব আসন। জ্ঞান এবং বুদ্ধির দ্বারা মার্জিত ও সীমাবদ্ধ অথচ আবেগের অন্তরঙ্গতায় জীবন-শিল্পীর রূপ-রচনার স্বাক্ষর তাঁদের কাব্যে আছে।

একথা ইতিহাসে আজ স্বীকৃত যে, মুসলমান রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের উন্মেষ এবং পরিপুষ্টি ঘটেছে। হিন্দু কবি যে-ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগ এবং নিবেদিত চিত্তকে কাব্যের উপজীব্য সম্পদ ভেবেছেন, সে ক্ষেত্রে মুসলমান কবি প্রধানতঃ জীবন এবং আনন্দকে অবলম্বন করেছেন। ফারসী সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে সে কাব্যের জীবনাবেগ এবং সৌন্দর্যকে এঁরা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। যদিও বাংলাদেশের রাজভাষা ছিল ফারসী এবং একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ফারসী ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক ঘটেছিল, কিন্তু ফারসী কাব্যের রসবোধ এবং আনন্দকে মুসলমানের পক্ষেই বাংলা কাব্যে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছিল। যখন মুসলমান কবিগণ প্রণয়-উপাখ্যান রচনা করেছিলেন, হিন্দু কবিগণ তখন দেবকূলের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। মুসলমানদের রচিত কাব্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবতাবোধ অর্থাৎ মানব-সম্বন্ধে কৌতূহল। মানব-জীবনের আনন্দ, স্বচ্ছলতা, দেহ-উপভোগ, প্রকৃতি, আভরণ ও সৌন্দর্য—এগুলোকে তাঁরা কাব্যের উপাদান করেছেন। তাঁদের কাব্যে দৃষ্টিগোচর পৃথিবী কল্পনা ও স্বপ্নের সঙ্গে মিশেছে।

মধ্যযুগের অধিকাংশ সাহিত্যই অনুবাদ। মূলতঃ ফারসী ও হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদের ভিত্তিতেই আমাদের উপাখ্যান-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আরবী থেকেও কিছু অনুবাদ হয়েছে। প্রধানতঃ ধর্ম ও যুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থ-

গুলোর অনুবাদ-যে সব ক্ষেত্রে শব্দানুগ হয়েছে, তা বলা চলে না, স্বাধীন অনুসৃতি ও ভাবানুসরণের পরিচয়ও আমরা যথেষ্ট পাই। ফারসী ও হিন্দী প্রণয়-উপাখ্যানগুলো মূলতঃ রূপকাশ্রিত হওয়া-সত্ত্বেও বাংলায় লৌকিক প্রণয়-উপাখ্যানের রূপ পেয়েছে।

একথা অবশ্য সত্য যে, রূপককে বঞ্চনা করেও কখনও কখনও মানবৰোধ চর্যাগীতিতে প্রকাশ পেয়েছে এবং রাধাকৃষ্ণের দেবরূপের মধ্যেও নরনারীর একান্ত সত্য, রিরংসা ও আর্তির চিত্ররূপ অঙ্কিত হয়েছে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। কিন্তু হিন্দু কাব্যে এ মানবীয় ধারা খুব উজ্জ্বল নয়। একমাত্র মুসলমান কবিরাই মানবীয় ধারাকে পরিপূর্ণ করেছেন।

এদিকে শাহ্ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রীস্টাব্দ) 'ইউছুফ জেলেখা' সম্ভবতঃ পাক-ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম লৌকিক উপাখ্যান। ষোল শতকে রচিত হয়েছিল দৌলত উজির বাহ্‌রাম খানের 'লায়লী মজনু', মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী', শাহ্ বারিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর', দোনা গাজীর 'সায়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' প্রভৃতি প্রণয়-উপাখ্যান। সতের শতকের উল্লেখযোগ্য উপাখ্যান হচ্ছে কাজী দৌলতের 'সতী-ময়না লোর চন্দ্রাণী', আলাওলের 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল', 'হপ্তপয়কর', মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী', আবদুল হাকিমের 'লালমতি সয়ফুল মুলুক', আবদুল করিম খোন্দকারের 'তমিম আনসারী', শরীফ শাহ্‌র 'লালমতি সয়ফুল মুলুক'। আঠার শতকে পাচ্ছি, খলিলের 'চন্দ্রমুখী', মুহম্মদ মুকিমের 'কামরূপ কালাকাম', 'মৃগাবতী', 'গুলে বাকাউলী', মুহম্মদ রফিউদ্দিনের 'জেবলমুলুক শামারোখ', শাকের মাহ্‌মুদের 'মনোহর মধুমালা', নূর মুহম্মদের 'মধুমালা', ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র 'ইউসুফ জোলেখা', 'সোনাভান', সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী', 'জৈগুনের কেচ্ছা', মুহম্মদ আলী রাজার 'তমিম গোলাল চতুর্থ ছিল্লাল', 'মিসরী জামাল', মুহম্মদ আলীর 'শাহ্‌পরী-মল্লিকাজাদা', 'হাসানবানু', আবদুর রাজ্জাকের 'সয়ফুল মুলুক লালবানু', শমসের আলীর 'রেজওয়ান শাহ্' এবং মুহম্মদ জীবনের 'বানু হোসেন বাহ্‌রাম গোর', 'কামরূপ কালাকাম' প্রভৃতি।

রোমান্টিক কাব্য ছাড়াও মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণ ধর্ম এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রয়োজনে কাব্য রচনা করেছেন। এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য

গ্রন্থ হচ্ছে হাজী মুহম্মদের 'নুরতনামা', খোন্দকার নসরুল্লার 'হেদায়তুল ইসলাম', 'শরীয়তনামা', আলাওলের 'তোহফা', আলী রাজার 'সিরাজ কুলুব', সৈয়দ নুরুদ্দিনের 'দাকায়েকুল হাকায়েক' ও 'রাহাতুল কুলুব', মুহম্মদ আলীর 'হায়রাতুল ফেকাহ্' হায়াত মাহমুদের 'হিতজ্ঞানবাণী', হাজী মুহম্মদের 'নুরজামাল', মুহম্মদ আকিলের 'মুসানামা', শেখ চাঁদের 'শাহ্‌দোলাপীর বা তালিবনামা', আবদুল হাকিমের 'শিহাবুদ্দিননামা', আলী রাজার 'জ্ঞান সাগর', সৈয়দ নুরুদ্দিনের 'মুসার সওয়াল', শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র 'গোরক্ষবিজয়', সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপ', আবদুল হাকিমের 'চারি মোকাম-ভেদ', শেখ চাঁদের 'হরগৌরী সংবাদ', আলী রাজার 'ষট্‌চক্রভেদ' প্রভৃতি।

দুই

মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের প্রণয়-উপাখ্যানগুলো সর্বক্ষেত্রেই নিঃসংশয় জীবন-সাধনা। উদাহরণ-স্বরূপ আমি এখানে শাহ্ মুহম্মদ সগীরের 'ইউছুফ জেলেখা'র কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

যেই দিকে হেরে চিত্ত মূরতি দেখিল ॥
আপনার মূরতি জলিখা সঙ্গে দেখি।
লজ্জায় বিকল হইল সে সব উপেখি ॥
বিবিধ সন্ধানে কেলি শৃঙ্গার স্বভাব।
ইছুফে দেখিয়া তাক পাইল সন্তাপ ॥
যেই দিকে পড়ে দৃষ্টি সেই সে দেখিল।
ইছুফক মনেতে সন্দেহ উপজিল ॥
কোহ্ন দিকে হেরিতে নাহিক তান সুখ।
তবে সে দেখিলা মাত্র জলিখাক মুখ ॥
আজি সে সাফল্য মোর সর্ব অঙ্গে সুখ।
সমদিষ্টে ইছুফে দেখিল মোর মুখ।
ক্রন্দিত নয়ন তান সন্তাপিত মন।
ছলছল নয়ান সজল বহে ঘন ॥

মুঞি শুষ্ক শস্য তুমি জলদ নিপুণ।
বিন্দেক পড়িলে জল ন হৈবেক উন ॥

আলাওলের প্রণয়-উপাখ্যান 'পদ্মাবতী' মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদুমাবতের অনুবাদ হলেও মূলের সঙ্গে ব্যতিক্রমের মধ্যেই এ কাব্যের বিশিষ্টতা।

আলাওল মূলের তত্ত্ব-সমৃদ্ধ রূপকের ব্যঞ্জনাকে গ্রহণ করেন নি। সামাজিক নিষ্ঠা, গৃহগত সৌজন্য, স্নেহের বন্ধন এবং নর-নারীর একান্ত হৃদয়গত কামনা-বাসনায় তাঁর কাব্য সমৃদ্ধ।

মধ্যযুগের শেষভাগে দোভাষী পুথি-সাহিত্যের প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে কবিওয়ালা ও দোভাষী পুথিকারগণই বহন করেছিলেন। সে সময়কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিশৃংখলার মধ্যেও এঁরা পরম নিশ্চিন্ততায় এক শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য আনন্দ পরিবেশন করেছিলেন।

শিল্প-নিপুণতার দিক থেকে বিচার করলে কবিগান এবং দোভাষী পুথি-সাহিত্যের মূল্য যত তুচ্ছই হোক না কেন, প্রাচীন কাব্যের ক্রমবিলীয়মান সৌন্দর্য-রশ্মি অস্পষ্ট আভায় এ সমস্ত রচনায় ধরা পড়েছে। সে কারণেই সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রমধারা এবং প্রবহমাণতা এগুলোর দ্বারাই রক্ষিত হয়েছে বলা চলে।

দোভাষী পুথিতে বাংলার সঙ্গে প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হত বলে, আমরা এই নামকরণ করেছি। এ পুথির কিছু অংশ রচিত হয়েছিল কলকাতায়, কিন্তু অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে। শহরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক বিভিন্ন প্রয়োজনে একত্রিত হত। কেউ সৈন্যরূপে, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য-ব্যপদেশে অথবা অন্য কোনো সাময়িক উদ্দেশ্যে। এদের আনন্দ-নিবেদনের জন্য এ-প্রকার মিশ্রিত ভাষার দোভাষী-পুথি রচিত হওয়া বিচিত্র নয়। তা ছাড়া পুথির বিষয়বস্তু প্রধানত রোমান্টিক এবং রহস্যময় প্রণয়োপাখ্যান, আনন্দ পরিবেশনই যার মুখ্য উদ্দেশ্য। বাংলা কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার নতুন নয়, সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা কাব্যেই প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিচয় দেবার জন্য এবং মুসলমান

সমাজের আচার-ব্যবহারকে স্পষ্ট করবার জন্য আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথম বারের জন্য এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের সৌন্দর্যগত সমর্থন আমরা অন্ত্য-মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের রচনায় পাই। অন্নদামঙ্গলের সর্বশেষ অধ্যায় মানসিংহে তিনি বলছেন :

"মানসিংহ পাদশায় হইল যে বাণী।
উচিত সে আরবী পারসী হিন্দুস্তানী॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥"

হ্যালহেড সাহেব তাঁর বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় বলছেন, "এ যুগে তাঁরাই মার্জিত ভাষায় কথা বলেন, যাঁরা ভারতীয় ক্রিয়াপদের সঙ্গে অজস্র আরবী-ফারসী বিশেষ্যের মিশ্রণ ঘটান।" এ ব্যাকরণ ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ সময়কার বাংলা গদ্যের একটি নমুনা নিম্নে পেশ করা হচ্ছে :

"শ্রীরাম! গরিব নেওয়াজ সেলামত। আমার জমিদারি পরগণে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়া শীকিস্তি হইয়াছে সেই দুই গ্রাম পরস্তী হইয়াছে চাকালে একবেরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ট রায় চৌধুরী আজ জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার জে শরকার হইতে আমি ও এক চোপদার শরজমিনেতে পহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া আদালত করিয়া হক দেলাইয়া দেন। ইতি সন ১১৮৫ তারিখ ১১ শ্রাবণ। ফিদবি জগতাধিব রায়।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সত্যপীরের কথায় বাংলার সঙ্গে প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

ক. "জয় জয় সত্যপীর সনাতন দস্তগীর
দেব দেব জগতের নাম।"

খ. "এক দিলে অল্প ধনে যে তোমারে সন্নি মানে
হাসিল করহ তার কাম।"

গ. "কপটে করুণাময় দ্বিজে কয় বাওয়া।
মৈ ভুখা ফকীর হুঁ লেগা মেরা দুওয়া॥
তু বাওয়া বখতাওব, ধরম আম্মা দেখা তুঝে।
মৈ ভুখা ফকীর হুঁ খিলাও কুছ মুঝে॥
তমাম দুনিয়া দেখা সবাই ইমান ছুটা।
কহা কোই খয়রাতন করে এক মুঠ্ঠা॥"

দোভাষী পুথি-রচয়িতাদের মধ্যে সৈয়দ হামজা সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান। তাঁর ভাষা অর্থাৎ শব্দ ব্যবহার, উপমা-রূপক-প্রয়োগ অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট নতুনত্বের এবং অনবদ্য আবেগের সঞ্চার করেছে। নিছক আনন্দজ্ঞাপক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করলেও তাঁর মধ্যে মানবীয় বোধের পরিচয় আছে। নারীর রূপবর্ণনা নিছক অলংকার হিসেবেই তাঁর কাব্যে নেই। এ রূপবর্ণনার পশ্চাতে হৃদয়াবেগের স্থিতি আছে।

সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী' প্রকৃত প্রস্তাবে দোভাষী পুথি নয়। এখানে আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ নেই বললেই হয়। প্রাচীন কালের পুথির রচয়িতারা, যেমন আলাওল তাঁর 'পদ্মাবতী'তে এবং অন্যান্য পুথিতে সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন, তেমনি সৈয়দ হামজাও 'মধুমালতী'তে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আলাওল কিম্বা অন্যান্য পুথি-রচয়িতাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানে যে, যেখানে অন্যান্য সবাই শব্দ ব্যবহার করেছেন পাণ্ডিত্য-প্রকাশের এবং অলংকরণের জন্য, হামজা সেখানে ব্যবহৃত শব্দে নায়ক-নায়িকার হৃদয়াবেগের পরিচয় বহন করেছেন। একটি উদাহরণ দিলেই কথাটি স্পষ্ট হবে। মধ্যযুগের কাব্যে দেখা যায় যে, কবিগণ নায়িকার দেহ-সৌষ্ঠব বর্ণনা করেছেন প্রতিটি অঙ্গকে বিচ্ছিন্নভাবে নিরীক্ষণ করে এবং উপমার প্রাচুর্যে তাকে মহার্ঘ করে। আলাওল পদ্মাবতীর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে যেয়ে পদ্মাবতীর মাথার চুল থেকে আরম্ভ করে তার পায়ের নখ পর্যন্ত যথেষ্ট মনোযোগ এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সমস্ত অংশ মিলে একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র গড়ে ওঠে নি। তা ছাড়া প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনায় অস্বাভাবিক উপমার প্রাচুর্য ঘটেছে, যেমন:

"পদনখ কিবা তার শশী নিষ্কলঙ্ক।"

কিন্তু সৈয়দ হামজার রচনায় আমরা এর ব্যতিক্রমই লক্ষ করি। সৈয়দ হামজা বিচ্ছিন্নভাবে নায়িকার বিভিন্ন অঙ্গ-গঠন বর্ণনা না করে তাকে পূর্ণভাবে অনুভব করতে চেয়েছেন। যেমন 'মধুমালতী'তে আমরা পাচ্ছি :

"সহজে রূপের ভারে, আপনি চলিতে নারে,
নবীন যৌবন তাহে ভার ॥
রূপের মুরারি বালি, ক্ষীণমধ্যা পড়ে ঢলি,
কেমনে বহিবে অলঙ্কার ॥
চন্দ্রের জিনিয়া রূপ, সূর্যের যেমন ধূপ,
আভরণে কিবা প্রয়োজন ॥
এওরাও অন্যে যত, দেশের চলন মত,
আনিল কিঞ্চিৎ আভরণ ॥"

ভাষার দিক থেকে দোভাষী-পুথি-সাহিত্যের সঙ্গে 'মধুমালতী'র সাদৃশ্য নেই, কিন্তু উপাখ্যানের উপাদান এবং প্রকৃতির দিক থেকে আছে। প্রথমত, দোভাষী-পুথির মতই এর উপাখ্যানটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, অবাস্তব এবং রোমান্টিক রসাশ্রিত; দ্বিতীয়ত, ঘটনার মধ্যে একটা আশ্চর্য দ্রুততা এবং নিশ্চিন্ত সংঘটনের পরিচয় আছে; তৃতীয়ত, উপাখ্যানের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি ও বাঙ্গালী জীবনের কোনো পরিচয় নেই; চতুর্থত, দোভাষী-পুথির মতই এটা পয়ার ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গীতে লিখিত।

দোভাষী-পুথির অনেক উপাখ্যান কোনো বিশেষ নায়ক, কোনো যুদ্ধ বা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। কোনো বিশেষ নায়ককে কেন্দ্র করে অনেক কবিই অনেক কাব্য-কাহিনী রচনা করেছেন।

পুথির শায়েরগণ বিভিন্ন নবী, হজরত রসুলে খোদা, চার খলীফা, এবং এমামদের নিয়ে অনেক কাব্য-কাহিনী লিখেছেন। এ-ধারার মূল্যবান পুথি হচ্ছে 'কাছাছোল আম্বিয়া'। এর রচয়িতা তিনজন—রেজাউল্লা, আমীরুদ্দীন ও আশরাফ আলী। রেজাউল্লা হজরত আদম থেকে হজরত নূহ্-এর কাহিনী পর্যন্ত রচনা করেছিলেন। আমীরুদ্দীন

লিখেছিলেন হজরত রসূলে খোদার সঙ্গে বিবি খোদেজার বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত এবং আশরাফ আলী লিখেছিলেন হজরতের বিয়ের বর্ণনা থেকে হজরত আলীর শেষ জীবন পর্যন্ত।

'জঙ্গনামা' পর্যায়ের অনেক পুথি এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে। 'জঙ্গনামা'র বিষয় হচ্ছে প্রধানতঃ কারবালার করুণকাহিনী। অবশ্য কিছু 'জঙ্গনামা'য় এমাম হানিফার ইরান-বিজয়ের কাহিনী আছে। মুহম্মদ খানের 'মুক্তাল-হোসেন' কারবালার কাহিনী নিয়ে লেখা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাব্য। রচনাকাল ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দ। কবি মুহম্মদ খানের পূর্বে অপর একজন কবি একখানা 'জঙ্গনামা' কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। এই কবির নাম দৌলত উজীর বাহরাম খান। 'লায়লী মজনু' কাব্যের সঙ্গে তিনি এটিও রচনা করেছিলেন।

রাধারমণ গোপ নামক জনৈক হিন্দু কবির 'ইমামের জঙ্গ' নামক একটি পুথির সন্ধান পাওয়া গেছে। পুথিটি সম্ভবতঃ আঠারো শতকের শেষ দিকে লেখা। 'জঙ্গনামা' কাব্যের সর্বশেষ রচনা সাদ আলী ও আবদুল ওহাবের 'শহীদে কারবালা'।

হিন্দু দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনীকে মুসলমান পীর-মাহাত্ম্য-কাহিনীতে ঢালাই করবার চেষ্টা করেছিলেন অনেকে। এ সমস্ত পীরদের মধ্যে খ্যাতিমান হচ্ছেন মাণিক পীর এবং সত্য পীর। আরো অনেক পীর আছেন, যেমন, পীর মছন্দলি, বড়-খাঁ গাজী, পীর কালু শাহা, এবং পীর গোরাচাঁদ। হিন্দুদের অধিকাংশ লৌকিক দেব-দেবীই এ সমস্ত পীর হয়েছেন। যেমন, মাণিক পীর হচ্ছেন ছদ্মবেশধারী শিব, পীর মছন্দলি হচ্ছেন মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রতিরূপ। এ সমস্ত পুথি-রচয়িতা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আছেন। অজ্ঞ জনসাধারণের ধর্মপিপাসা মেটাবার জন্য এ সমস্ত উদ্ভট উপাখ্যান রচিত হয়েছিলো।

দোভাষী-পুথির রোমান্টিক কাহিনীর মধ্যে লায়লী-মজনু, গোলে-বকাউলী, চাহার দরবেশ এবং হাতেম তাই-এর উপাখ্যান প্রসিদ্ধ। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদ খাতের লায়লী-মজনু কাব্য রচনা করেন। মুহম্মদ খাতেরের প্রসিদ্ধ কীর্তি হচ্ছে দোভাষী-পদ্যে শাহ্‌নামার সম্পূর্ণ তরজমা।

ইসলামী আহ্‌কাম-আরকান বা নিত্যকৃত্য, কোরআন-হাদিস বা

তত্ত্বগ্রন্থের অনুবাদ, সুফিতত্ত্ব-বিষয়ক সাধনা-গ্রন্থ দোভাষী-পুথিতে আমরা প্রচুর পাই। এ পর্যায়ের অল্প কিছু গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করছি— সৈয়দ নুরুদ্দীনের 'দাকায়েকুল হাকায়েক', মালে মোহাম্মদের 'আহ্‌কামল জোমা', জোনাব আলীর 'হকিকাতচ্ছালাত', মোহাম্মদ ছাদেকের 'জামালাতল ফোকরা'।

আধুনিক সাহিত্য

সাহিত্যের যুগ-বিভাগ একটি দুরূহ কর্ম। কেননা, ঐতিহাসিক কাল-নিরীক্ষার দ্বারা সাহিত্যের যুগের তাৎপর্য বিচার করা চলে না। একটি যুগের পরিসর-নির্ধারণের জন্য দুই প্রান্তে দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ সাহিত্যের সত্য এবং মূল্যকে প্রকাশিত করে না। সেজন্য প্রয়োজন, সাহিত্যের যুগের বিশেষ প্রকৃতি বা লক্ষণগুলো কি, তা আবিষ্কার করা। কখনো কখনো একটি যুগের প্রধান লক্ষণগুলি অন্য যুগেও প্রবাহিত হয়। কিন্তু তা ব্যতিক্রম মাত্র, সাধারণ রীতি নয়।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্ভব কখন হলো, তার জন্য প্রয়োজন এই সিদ্ধান্তে আসা যে, এই সাহিত্যের মধ্যযুগ কখন শেষ হলো। ঠিক কোন্ তারিখে বা কোন্ বছরে শেষ হলো, তা নয়, কিন্তু মধ্যযুগের বিশিষ্ট চৈতন্যগুলি কখন অন্তরালে গেলো এবং নতুন জীবনবোধ এবং আনন্দ কখন বিকশিত হলো, তা জানা।

সাহিত্য শব্দের সামগ্রী এবং অনবরত বক্তব্য পরিবেশন তার উদ্দেশ্য। কখনও এই বক্তব্য স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, ঋজু, কখনও তা আবেগ ও স্বপ্নে আচ্ছাদিত, কখনও তা চিন্তায় ও সংবাদে গুরুভার। কিন্তু সর্ব মুহূর্তেই তা বক্তব্যের অনুশীলন, পরিচর্যা এবং প্রকাশ। এই বক্তব্যপ্রকাশের পদ্ধতির দ্বারা সাহিত্যের যুগ-বিচার করা চলে। এটা যুগ-বিচারের একটা বিশেষ পদ্ধতি। অন্যান্য পদ্ধতিও আছে, তা পরে বলব।

মধ্যযুগের ঐতিহ্য দীর্ঘ পরিসরের। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে পরীক্ষিত এবং লোকগ্রাহ্য কাব্যের পরিমাণ সময়ের পরিসরের বিচারে প্রচণ্ড নয়। সুতরাং একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা একেবারে অসম্ভব নয়।

কবি যখন শব্দকে ব্যবহার করেন, তখন তিনি সে শব্দেব অর্থের সম্ভাবনার কথা ভাবেন অর্থাৎ শব্দটির গ্রহণক্ষমতা কতোটুকু এবং সে কতটুকু সত্যকে অবলম্বন করে থাকতে পারবে। তিনি শব্দের দ্বারা বস্তুকে চিহ্নিত করেন, ভাবকে গ্রহণযোগ্য করেন এবং জটিলতাকে বিকল করেন। মধ্যযুগের কবিদের সমস্যা ছিলো, বিশেষ বক্তব্যকে অথবা তত্ত্বকে

অবলম্বন করবার ক্ষমতা শব্দের কতটুকু, তা আবিষ্কার করা। তাদের রীতি ছিলো অলঙ্করণের, বস্তুকে মহার্ঘ করবার। তাই দেখি যে, আঙ্গিকের একটি নির্ধারিত বন্ধন তাঁরা স্বীকার করেছেন, বৈচিত্র্য যদিও কোথাও থাকে, তা বিষয়ের। মধ্যযুগের সমস্ত দীর্ঘ কাব্য একই ছন্দ, একই শব্দ-বিন্যাস এবং একই গতি অবলম্বন করে রূপ পেয়েছে—পার্থক্য সূচিত হচ্ছে শুধুমাত্র বিষয়ের তারতম্যে। সুতরাং সে সময়ে কবির সমস্যা ছিলো, সীমাবদ্ধ শব্দসম্ভারের মধ্যে বক্তব্যকে তিনি কতোটা সুপরিস্ফুট করতে পারেন। তিনটি উদাহরণ নেওয়া যাক—যুদ্ধের বর্ণনা, প্রকৃতি-বর্ণনা এবং রূপ-বর্ণনা। বর্ণনাগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, তা সমৃদ্ধমান, মহার্ঘ। কবি যুদ্ধের বর্ণনা দিতে যেয়ে সে সময়ে ব্যবহৃত যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের নাম নিয়েছেন, যেখানে বস্তুর নামের প্রাধান্য। প্রকৃতি-বর্ণনার ক্ষেত্রে দেখি, সেখানেও অনবরত অনেক নাম—ফলের নাম, ফুলের নাম, লতাপাতার নাম অথবা একটু অতিরিক্ত গেলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আচরণের বহিরঙ্গগত সাদৃশ্য কি, তার কিছুটা পরিচয়। রূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রে দেখি, কবি চিত্তের উদ্‌ঘাটন করেন নি এবং বহিরঙ্গের অনুভূতিগত প্রতিক্রিয়াকেও প্রকাশ করেন নি—তিনি বর্ণনা দিয়েছেন অলঙ্কারের এবং আভরণের। তাতে বর্ণিত নারী অথবা পুরুষ মহার্ঘ হয়েছে, কিন্তু বর্তমান কালের বিচারে বিশিষ্ট হয় নি। দৌলত কাজীর 'ময়না', অথবা আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের নায়িকা পদ্মাবতী, পরিবর্তনযোগ্য। অর্থাৎ বর্ণিত রূপবিকাশের মধ্যে একজনের সঙ্গে অন্যের কোন পার্থক্য নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগের কবিতা ছিলো সমষ্টির কবিতা, একক রূপের নয়। যে-কোনো নারী রূপচর্চায় সকলের প্রতিনিধি, তার একক রূপের নয়। মধ্যযুগের রূপচর্চা ছিলো একটি বিশেষ নিরীক্ষায় সমগ্রের রূপচর্চা, অর্থাৎ একটি মাত্র বর্ণনায় সকলেরই স্বরূপ জানা যাচ্ছে। আর যদি কখনো বৈশিষ্ট্য এসেছে, সে বৈশিষ্ট্য হয়েছে গোত্র অথবা জাতির অথবা শ্রেণীর। সেখানে নারী হয়তো হস্তিনী, পদ্মিনী বা চিত্রিণী অথবা কলহান্তরিতা, অভিসারিকা, বিপ্রলব্ধা ইত্যাদি। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই কবি চেষ্টা করেছেন, একজনের কথা বলে যেন সকলের কথা বলা যায়। এ কারণে, অর্থের দিক থেকে মধ্যযুগের শব্দের প্রসার বেশী ছিলো না।

আধুনিক কালের বিশিষ্টতা হচ্ছে শব্দের সম্ভাবনাকে সম্প্রসারিত করা, তার ঐতিহ্য সন্ধান করা, তার বর্তমান পরিচয়কে আবিষ্কার করা এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা-সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত করা। কেননা, শিল্পী এখন আর বস্তুপুঞ্জের সমষ্টিকে গ্রহণ করছেন না, অথবা কোনও গোত্র-প্রকৃতির সাধারণ পরিচয় দিচ্ছেন না। শিল্পী ব্যক্তিমানসের রূপ উদ্‌ঘাটন করতে চাচ্ছেন, ব্যক্তিসত্তার জাগরণ কামনা করছেন। সেই ব্যক্তিসত্তা মানুষের হতে পারে, গাছের পাতার হতে পারে কিংবা সমুদ্রের ঢেউয়ের হতে পারে। যেখানে মধ্যযুগের বস্তুর কণাকে একত্রিত রূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা ছিলো, বর্তমান কালে শিল্পীর আকাঙ্ক্ষা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার মূল্য নিরূপণ করতে চাচ্ছেন—ইংরেজীতে যাকে বলা হয়ে থাকে **"exploring the possibilities of the Atom"**। এটা যেমন গুণ, আবার একই সঙ্গে ভয়েরও কারণ। তাদের অনুক্ষণ চেষ্টা বিচ্ছিন্ন বস্তুকণার রূপ-অভিব্যক্তিকে যৌক্তিক পারম্পর্যে গ্রথিত রাখা।

মধ্যযুগের কাব্যকে সুশৃঙ্খল অট্টালিকার নির্মাণ-কৌশলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাই সে যুগের কবির স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ ছিলো। তখন কবিতা গতি পেয়েছে যুক্তির অপরিহার্য নিষ্ঠায়। সেখানে আবেগের তাপ, কখনো উষ্ণতা, কখনো শীতলতা কাব্যের গঠন-প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল ছিলো। অর্থাৎ কাব্যানুভূতির উষ্ণতা বা শীতলতায় কবিতার আঙ্গিক গড়ে উঠতো না, বরঞ্চ আঙ্গিকের নির্দেশে তাপমানের তারতম্য নির্ধারিত হতো। আধুনিক কালে শব্দের সম্ভাবনা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতিটি কবিতা তার অনুভূতি বা বক্তব্যের নির্দেশে ছন্দ ও চরণ নির্মাণ করে। এ যেন একটি গাছ, যার একটি ডাল বড়ো আর একটি ডাল ছোট, কতগুলো পাতা ঘন কালো, কতগুলো হাল্‌কা সবুজ। কিন্তু সবকিছু মিলে একটি পরিপূর্ণ সজীবতার প্রতিমূর্তি।

মধ্যযুগের কবিদের শব্দ-সম্পর্কে কখনো ভাবতে হয় নি। সে যুগে মানুষের মনের সত্য তাদের শব্দে ধরা পড়ে নি। বর্তমানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এবং নিষ্ঠুরভাবে শব্দ আমাদের মানসলোকের প্রতিফলন। বিদেশের একটি উদাহরণ দিই : দু'টি যুদ্ধের বিপর্যয়ে এবং পরবর্তী শান্তির সময়ে পুরোনো বিভীষিকার স্মৃতির নৈকট্যের কারণে জার্মান কবিরা

শব্দ ব্যবহার-সম্পর্কে অসম্ভব বেশী স্পর্শকাতর। আপাত উচ্চারণে সাধারণ হলেও, কতকগুলো শব্দ, যেমন, **boden** (মাটি), **blut** (রক্ত), **ehre** (সম্মান), **zucht** (নিয়মানুবর্তিতা), **pficht** (কর্তব্য), এই শব্দগুলি কবিরা ব্যবহার করতে ভয় পান ; কেন না যুদ্ধকালে এ শব্দগুলি বিভিন্নপ্রকার অন্যায়-নির্দেশে মলিন হয়েছিলো। তাঁরা তখন চেষ্টা করলেন, নতুন শব্দ ব্যবহার করতে এবং প্রাচীন কালের শব্দের মধ্যে নতুন অর্থ দান করতে। সুতরাং তাঁদের কাছে শব্দের পরিসর বাড়লো, সম্ভাবনা বাড়লো এবং বন্ধনমুক্তি ঘটলো। শব্দ-সম্পর্কে এই সজাগ অনুভূতি বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা পাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শব্দ-ব্যবহার-সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর ইচ্ছায় এবং কর্মে অনবরত তা প্রকাশ পেয়েছে, 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ তিনি বলেছেন :

কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

অথবা :

গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল, ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা।

আরও উক্তি পাই "বঙ্গভাষা" কবিতায় :

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন !

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

শব্দ-সম্পর্কে এই আশ্চর্য সচেতনতা শব্দকে মধ্যযুগের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে মুক্ত করে অনুভূতি এবং বাস্তবের ক্ষেত্রে বিচরণের সহায়তা করেছে। এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণের পরিচয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র—সকলের মধ্যেই আমরা দেখি। শব্দ তাঁর নিজস্ব সত্তাকে চিনলো, তাই তার কৌতূহল জাগলো, স্পর্ধা জাগলো। এবং সর্বপ্রকার সাধনায় ব্যাপৃত রাখার স্বাধীনতা জাগলো। বিষয়ের এবং আনন্দের এই যে-সম্প্রসারণ, আধুনিক সাহিত্যের এটাই প্রাণ।

বিষয় এবং আঙ্গিক যখন একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়, তখন বিষয়ের ভার কমে যায়, তাকে আনন্দিত লঘু স্পর্শের মতো মনে হয়। মধ্যযুগের সাহিত্য প্রধানত বিষয়ের গুরুভারে পীড়িত, যে-গুরুভার সম্পর্কে Lawrence Sterne-এর কথায় বলা যায় :

> **Gravity, a mysterious carriage of the**
> **Body to conceal the defect of the mind.**

আমরা বর্তমানে যে-যুগে বাস করি, সে যুগ হচ্ছে অজস্রতার, এবং আমাদের প্রপিতামহরা বাস করতেন স্বল্প সামগ্রীর যুগে। তাঁরা যা পেয়েছেন, তাকে রূপে রসে গুরুভার করে সাজিয়েছেন। অজস্রতার মধ্যে আমাদের উন্মেষ বলে আমরা সবকিছুই অল্প করে জানতে চাই অথবা যতোটুকু জানি ততোটুকুকেই হৃদয়বেদনায় স্বীকৃতি দিতে চাই। আধুনিক বলেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমাদের স্মৃতির বোঝা প্রচণ্ড। প্রপিতামহদের যে-অতীত ছিলো আমাদের অতীত তার চেয়ে অনেক বড়ো এবং তার ওজনও অসম্ভব। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমরা বোঝার কথা স্মরণ করি না, আমরা হৃদয়-বেদনায় সত্যকে জানি। অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের অনুভূতিতে, আগুন

এবং ফুল এক হয়েছে। কেননা, এখানে কবির নির্দেয় বস্তু স্থূল আগুনও নয়, গোলাপও নয়, তাঁর নির্দেয় বস্তু হচ্ছে, চিত্তের অনুসন্ধান।

মধ্যযুগে চিত্তবিকাশের প্রধান অবলম্বন ছিলো ধর্ম। ধর্ম তার আবরণ, নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসকে নিয়ে মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করেছিলো। তখন ব্যক্তিগত বিশ্বাস ধর্মের ভিত্তি ছিলো না। সমষ্টির সত্তায় ধর্ম ছিলো একটি আচরণীয় নিয়মগত কর্ম। তাই সে যুগে ধর্মের ক্রিয়াপদ্ধতি মূল্যবান ছিলো, ধর্মের অনুভূতির যে-একটি বিশিষ্ট পরিচর্যা আছে, তা সেই সময়কার রচনায় ধরা পড়ে নি। ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীচৈতন্যের ধর্মীয় উপলব্ধি মহাজন-পদাবলীতে সাধনার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ কখনো কখনো উজ্জ্বল চরণ দেখা যায়, যাতে তাপ আছে, দাহ আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমস্ত মহাজন-পদাবলীর রীতির মধ্যে তা ব্যতিক্রম। আলাওলের 'পদ্মাবতী'তে যোগতত্ত্বের ব্যাখ্যা অথবা 'চৈতন্যভাগবতে' অবতারের বিকাশ, এগুলো সবকিছুই তৎকালীন সমাজনির্ভর ধর্মীয় আচরণের বহিরঙ্গের ব্যাখ্যা, অন্তরঙ্গ স্বরূপের উদ্‌ঘাটন নয়। আধুনিক কালে ধর্ম অথবা শাস্ত্রবিধি সাহিত্যিকের জীবনে রহস্যের সন্ধান দিচ্ছে না, কেননা বর্তমানে মানুষের বিচারে ধর্ম পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির বস্তু অথবা পরিপূর্ণ নিশ্চেতনায় অস্বীকারের বস্তু। ধর্মের আচরণ নিয়ে আবেগের সঞ্চয় এখন ঘটে না। তাই বর্তমানে সাহিত্য-সাধনায় বিজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল এবং ধর্ম যেখানে প্রকাশিত, সেখানে তা প্রগাঢ় উপলব্ধির প্রসূনরূপে। দ্বন্দ্ব এবং সর্বনাশের মধ্য দিয়ে অচলায়তনের রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করে, ত্যাগ এবং নির্যাতনের মধ্যে এবং অনবরত আপনাকে অতিক্রম করার মধ্যে মানুষের যে-উপলব্ধি, তাই হচ্ছে বর্তমান মানুষের ধর্ম। কোন বিশেষ বিধিবদ্ধ সমাজের নিষ্ঠার পরিচয় আধুনিক সাহিত্যে নেই। বর্তমান মানুষ যুক্তিতে, বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায় এবং উপলব্ধিতে আপন সময়ের বন্ধনকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে—আধুনিক সাহিত্য এই চেতনারই ফলশ্রুতি।

মধ্যযুগে সাহিত্যের সামগ্রী ছিলো সীমাবদ্ধ পৃথিবী। হঠাৎ কখনো কখনো এই সীমাবদ্ধ পৃথিবী উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় আমাদের বিহ্বল করে। কিন্তু সাধারণভাবে তার উপযুক্ত বিষয়বস্তু তার পরিচিত অঞ্চল থেকে নেয়া। বর্তমান কালে সাহিত্যের সামগ্রী হয়েছে সমগ্র পৃথিবী। তাই যে-সত্য

সাহিত্যের উপজীব্য, সেই সত্য আঞ্চলিক নয়, বরঞ্চ অঞ্চল-অতিক্রান্ত সর্ব স্থলের। এর কারণ, বর্তমানে আমাদের জানার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। তাই যতটুকু জানি তার সবকিছুরই স্পর্শ পেতে চাই। এ ক্ষেত্রে যে-অনুভূতি সক্রিয়, তা হচ্ছে, সর্বজনের মধ্যে আমি একজন, সর্বজনের প্রতিভূ হিসাবে নই, কিন্তু বিশিষ্ট একজন হিসাবে। এভাবে আধুনিক সাহিত্য উপাদান সংগ্রহ করছে স্মৃতি থেকে, গ্রন্থ থেকে, বিজ্ঞান থেকে, জ্ঞাত পৃথিবীর সর্ব অঞ্চল থেকে।

মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠক বা শ্রোতার কাছে শুধুমাত্র ভক্তি ও তন্ময়তার দাবী করতো। মনে রাখতে হবে যে, ভক্তি দাবী করা চলে নিশ্চিন্ত ধর্মাশ্রয়ী মনের কাছে, কিন্তু যখন মন অত্যন্ত জটিল—যখন মন শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত স্মৃতির সঞ্চয়ে শান্ত নয়, যখন সেখানে অধীত গ্রন্থের বুদ্ধি, সঙ্গীতের আনন্দ, চিত্রের দৃশ্য, ভ্রমণের দেশ-পরিচয়, রাজনীতির কৌশল এবং বিজ্ঞানের সংশয়-নিরসন এক সঙ্গে বিচিত্র বিশ্বাসে ওতপ্রোত—তখন সে মনের কাছে আধুনিক লেখকের দাবী অনেক। যে-পর্যন্ত কোন পাঠক এ দাবী-সম্পর্কে পূর্ণভাবে সচেতন না হবেন, সে পর্যন্ত আধুনিক সাহিত্য অপরিজ্ঞাত সংশয়ের সাহিত্য থাকবে।

বিদেশে প্রুস্ত, জয়েস, পাউণ্ড, এলিয়ট, ফকনার, এঁরা—আধুনিক সাহিত্যে সময় ও অনুভূতির সম্মিলিত গতিধারায় এক নতুন সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের আবিষ্কারকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায়:

১. সময় একটি অনুভূত কাল। সময় আমাদের চিন্তায় নয়, আমরা সময়ের মধ্যে বিকশিত। আমাদের মনোবিকাশ সময়কে নিয়ে।

২. আমাদের প্রতি মুহূর্তের কর্মে আমাদের সম্পূর্ণ অতীতের প্রভাব রয়েছে। আমাদের চরিত্র এবং কর্ম সর্বপ্রকার বিগত সত্তার দ্বারা লালিত।

৩. আমাদের চেতনা হচ্ছে স্মৃতি, আমাদের মন হলো স্মৃতি, তাই আধুনিক কাব্য এবং উপন্যাস প্রধানত আত্মব্যাখ্যা।

৪. আমরা নিঃশেষ না হয়ে পরিবর্তিত হই, যতো দিন আমরা জীবিত

> থাকি, প্রতি মুহূর্তেই আমাদের পরিবর্তন আসে, কিন্তু আমাদের অস্তিত্বে সর্বক্ষণ একইভাবে জড়িত থাকে সময় এবং স্মরণ। আধুনিক সাহিত্যিক তাই ঘটনা, চিন্তা এবং আবেগের স্রোতোধারায় চরিত্রের জীবন নির্মাণ করেন।

অনবরত সমাজ এবং চিন্তার এবং জ্ঞানের পরিবর্তনের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। সাহিত্যের ইতিহাসে বর্তমানে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ক্রমান্বয়ে বিচিত্র অনুভূতি ও জ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সাহিত্যের স্বাদ ও আনন্দের জন্য এ অনুভূতি ও জ্ঞানের মূল্য কতটুকু তা বিচার-সাপেক্ষ ব্যাপার, কিন্তু সাহিত্যকে এ সকল কিছু থেকে বিচ্যুত করা যায় না, তা প্রবলভাবে সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এর পরিচয় দেখেছি। অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ক্রমান্বয়ে উনিশ শতকের আরো অনেকের মধ্যে জ্ঞান এবং বুদ্ধির সজীব সঞ্চরণ দেখেছি। এই জ্ঞান, বুদ্ধি এবং মগ্নচৈতন্যে সর্বপ্রকার অতীতের স্মৃতি আধুনিক সাহিত্যকে ব্যাপক করেছে, জটিল করেছে, কিন্তু তীক্ষ্ণ এবং নিঃসংশয়ও করেছে।

সাহিত্যে পূর্বসূরী

পূর্বসূরী কথাটি বর্তমানে খুব ব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু সত্যিকারের যে অর্থে, সে অর্থে নয়। পূর্ববর্তী সমস্ত সাহিত্য-সাধকের কথা বোঝাতে শব্দটির ব্যবহার হয়; অর্থাৎ সাহিত্য-ক্ষেত্রে যাঁরা জ্ঞানবান, পণ্ডিত এবং মান্যযোগ্য তাঁরাই একমাত্র পূর্বসূরী নন—যোগ্য বা অযোগ্য যা-ই হোন না কেন, যাঁরা কিছুটা বেশী বয়সের এবং সাহিত্যকর্মে অগ্রগামী তাঁদের কথা বলতে পূর্বসূরী কথাটির ব্যবহার হয়।

আমার আলোচনার বিষয় তরুণ ও প্রবীণ লেখকদের পারস্পরিক সম্পর্ক, একের প্রতি অপরের সঙ্গত বা অসঙ্গত আচরণ, নির্ভরতায় সমৃদ্ধি বা অস্বীকারের প্রবণতায় বৈচিত্র্য।

একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় প্রবীণদের কাছ থেকে। তরুণ লেখক সম্প্রদায় ঐতিহ্য-শূন্য, আত্মকেন্দ্রিক ও অসদাচারী। সাহিত্যগত সম্মান দূরে থাকুক, ব্যক্তি- বা সমাজ-গত সম্মানও তাঁরা প্রবীণদের দেন না। প্রবীণদের অভিযোগ নিম্নরূপে চিত্রিত করা যায়:

১. তরুণদের কোন আদর্শ নেই, তাঁরা আদর্শ-বিশ্লিষ্ট অনুচিত সাহিত্যকর্মে লিপ্ত।

২. পূর্বতন সমস্ত কিছুর প্রতি তরুণদের অশ্রদ্ধা।

৩. ভাষার ঐতিহ্য ও শালীনতা এদের হাতে রক্ষিত হচ্ছে না।

আবার প্রবীণদের সম্পর্কেও তরুণদের অভিযোগ আছে। সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

১. প্রবীণদের আদর্শ প্রমাদ-পূর্ণ, তাই অনুসৃত হবার যোগ্য নয়।

২. সাহিত্যের ঐতিহ্যই তরুণদের পূর্বসূরী, ব্যক্তি-বিশেষ নয়।

৩. বয়স বেশী হলেই কেউ সম্মানের যোগ্য হয় না, তাকে উপযুক্ত হতে হয়।

৪. পূর্বতন সকল কিছুকে অস্বীকার করাই বর্তমানের ধর্ম।

উভয় পক্ষের মন্তব্য পরীক্ষা করে দেখা যাক। তরুণদের কোন আদর্শ

নেই, একথা যখন কোন প্রবীণ সাহিত্য-সাধক বলেন তখন তিনি গৌণভাবে এই ইঙ্গিত করেন যে, সাহিত্য-সাধনায় তাঁর একটি বিশেষ আদর্শ আছে যে-আদর্শ মূল্যবান, সমৃদ্ধ এবং সম্পূর্ণ। এ আদর্শ অনুসরণ করলে সাহিত্য কল্যাণময় হবে এবং এর উপর নির্ভরতায় জাতীয় জীবন সম্পন্ন হবে। যেহেতু তরুণ লেখক সম্প্রদায় এ আদর্শে বিশ্বাসী নন, তাই তাঁরা আদর্শশূন্য এবং এমন এক সাহিত্যকর্মে লিপ্ত যা অনুচিত এবং গ্রহণযোগ্য নয়। প্রবীণদের এই আদর্শ কি, তার পরিচয় কেউ দিয়েছেন। প্রধানতঃ এই আদর্শ প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য একটি নিরবলম্ব ধর্মীয় আদর্শ। নিরবলম্ব বলছি এই কারণে যে, এঁদের অনেকের বিচারে কবিতা, গল্প বা উপন্যাসের শ্রী এবং আনন্দ ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনার উপর নির্ভরশীল। এঁদের কেউ কেউ এমন কথাও বলেন, সাহিত্যকর্মী হিসাবে তাঁদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই—ধর্ম এবং নীতিকেন্দ্রিক যে-জীবনবোধ তাই তাঁদের সাহিত্যের অন্তঃসার।

পূর্বতন সমস্ত কিছুর প্রতি তরুণদের অশ্রদ্ধা বলতে প্রবীণদের কেউ কেউ মনে করেন যে, যেহেতু তাঁরা অর্থাৎ প্রবীণ লেখকগোষ্ঠী তরণদের কাছে কোন সম্মান পাচ্ছেন না, তাই তরুণ লেখক সম্প্রদায় এই অশ্রদ্ধার মাধ্যমে পূর্বতন সমস্ত কিছুকেই হয়তো অগ্রাহ্য করছে। কখনও হয়তো এই অশ্রদ্ধা ব্যক্তিগত অথবা সমাজগত, কিন্তু তাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সাহিত্য-ধারার প্রতি অসৌজন্য বলে। মুসলমান সমাজে পাকিস্তান-পূর্ব যুগে প্রবীণ লেখক সর্বদাই সম্মানিত ছিলেন। সকলেই তাঁদেরকে গ্রহণ করেছেন, মান্য করেছেন। সাহিত্য-বিচারের কোনও প্রকার মাপকাঠিতে যোগ্যতা পরীক্ষিত হয় নি। প্রতিবেশী সমাজের পরিবর্তে আপন পরিমণ্ডলের লেখক-সম্প্রদায়ের অনুসন্ধান চলেছে এবং আনন্দ ও শ্রীর সহায় হোক বা না হোক, আত্মশ্লাঘার অভিচার হিসেবে তাঁদের সকলকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এ-মর্যাদার ভিত্তিমূলে রাজনৈতিক চেতনার প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি ছিলো। বর্তমানে এ-ইতিহাসের দ্বিধাহীন সঞ্চরণ নেই, তাই এক সময়ে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং অধুনা অগ্রাহ্যপ্রায় লেখক সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়েছেন। বয়স এবং অগ্রসর সাহিত্য-কীর্তির জন্য যে-সম্মান তাঁদের প্রাপ্য, জাতীয় উন্মাদনার সূচনায় যে-সঞ্চয় তাঁদের হয়েছিলো, আজ যদি তাঁরা তা থেকে বঞ্চিত হন তবে

হতাশা এবং দুঃখ তো আসবেই। তাঁরা এ অবস্থাকে ব্যাখ্যা করছেন, প্রাচীন সমস্ত কিছু—সত্য ও আনন্দকে অস্বীকার করার প্রবণতা বলে।

প্রবীণদের তৃতীয় অভিযোগ, তরুণ লেখক সম্প্রদায় ভাষাকে বিশৃঙ্খল করছেন। শব্দের অপপ্রয়োগ, অপ্রচলিত কঠিন শব্দের অসুন্দর ব্যবহার এবং ঐতিহ্য-সমর্থিত রীতিকে অস্বীকার বর্তমানে নাকি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-প্রথায় সাহিত্য সমৃদ্ধ না হয়ে সঙ্কীর্ণ হয়, আনন্দের না হয়ে অনুজ্জ্বল হয়।

প্রবীণরা বলছেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষার একটা নিজস্ব সত্তা আছে, সে সত্তা আমাদের ধর্ম ও সমাজকে অবলম্বন করে এবং আমাদের সামাজিক রুচিকে গ্রহণ করে বিকশিত। তাই এখানকার ভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ থাকবে না অর্থাৎ বাংলা ভাষা সংস্কৃতের নিকটে যাবে না। এটা সৌন্দর্যতত্ত্বের কথা নয়, এটা হলো সমাজ, ধর্ম এবং সাংসারিক রুচির কথা। শব্দ আসে স্মৃতি থেকে, বুদ্ধি থেকে, আনন্দ থেকে, এবং স্মৃতি, বুদ্ধি ও আনন্দ জীবনবোধের সঙ্গে ওতপ্রোত। প্রত্যেক সার্থক লেখক আপন স্মৃতি, বুদ্ধি এবং আনন্দ থেকে শব্দ আহরণ করেন এবং আপন বিশিষ্ট ও অনন্য এক রচনাশৈলী নির্মাণ করেন। অতিরিক্ত বিদেশী শব্দ হয়তো কারো বুদ্ধি, আনন্দ বা স্মৃতির স্মারক হতে পারে। তাতে অশোভনতা কিছু হবে না।

প্রবীণদের কথার প্রতিবাদে নবীন লেখক সম্প্রদায় বলছেন যে, আমাদের এখানে অনুসৃত হবার যোগ্য কোনও প্রবীণ লেখক নেই। স্থায়ী মূল্যের কোনও লেখা এঁদের নেই। যুগের-যে পরিবর্তন হয়েছে, আচারগত ধর্মের বিকল্পে বুদ্ধিগ্রাহ্য যে-সমস্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তা যাঁরা মানেন না, তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য সত্যের ব্যতিরেক মাত্র। তাঁরা কি করে শ্রদ্ধা পাবেন? সুতরাং নবীনরা বলেছেন, এঁরা আমাদের পূর্বসূরী নন। নবীনদের বিচারে এঁরা প্রত্যেকেই একটি যুগ-অবক্ষয়ের (decadence) প্রতীক। এঁদের স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নেই, না শিল্পকর্মে, না আনন্দবোধে। যেখানে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের শিরোদেশে রবীন্দ্রনাথ আছেন এবং তারপর ব্যতিক্রমের বিস্ময় হিসেবে নজরুল ইসলাম এবং আরও পরে সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে আছেন, সেখানে পূর্বসূরী হিসেবে আর কেউ আসতে পারেন কি?

তা ছাড়া যেখানে মহৎ কোনো প্রতিভা নেই, সেখানে অনেকদিন ধরে অনেকের সম্মিলিত সাধনায় সাহিত্য-বোধের যে-চেতনা গড়ে উঠেছে, নতুন সাহিত্যব্রতীদের কাছে স্বীকার্য বস্তু একমাত্র তাই। ব্যক্তি-বিশেষের নিষ্ঠার মূল্য সেখানে নগণ্য, কেননা কোন ব্যক্তিই সেখানে একক ও অনন্যরূপে জাগ্রত নন। তরুণ লেখক সম্প্রদায় তাই তাঁদের অব্যবহিত পূর্বের লেখকগণকে অনুসরণের আয়ত্তে আনেন না। এখানে স্বীকৃতি বা শ্রদ্ধার প্রশ্ন অবান্তর।

শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে অন্য একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। অত্যন্ত নিকটের যাঁরা এবং যাঁদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সুযোগ বর্তমান, বিভিন্ন কারণে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার শিথিলতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু যাঁরা নিকটের নন এবং যাঁরা কোনও মুহূর্তেই বিরোধের প্রশ্রয় দেন না, তাঁদের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকে। কবি কায়কোবাদ বা সৈয়দ এমদাদ আলী পরিচিত নাগরিক পরিবেশের বাইরে গ্রামাঞ্চলে বসে কাব্য-সাধনা করেছিলেন। তরুণদের কাব্য-পরীক্ষায় তাঁরা উৎসুক ছিলেন না, অন্য পক্ষে নতুন সাহিত্য-ব্রতীদের সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করতেন। এ কারণে তাঁদের কালে তাঁরা অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পেয়েছেন। তাঁদের সাহিত্য-ধারা অনুসৃত হয় নি বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কোনও প্রকার অসৌজন্যে তাঁরা লাঞ্ছিত হন নি।

এ-প্রকৃতির বিরোধ সব দেশেই আছে। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশে সাহিত্য-সাধকগণ, প্রবীণ বা নবীন উভয়েই, অনুক্ষণ সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্মে রত, আমরা সে ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু না করেই তরুণ সম্প্রদায় যেমন পূর্বতন সমস্ত কিছুকেই গ্রহণের অযোগ্য বলেছেন, তেমনি আবার স্থায়ী মূল্যের কোন সাহিত্য সৃষ্টি না করেই প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছেন প্রাচীন লেখক-সম্প্রদায়।

এক সময়ে প্রুস্ত ফরাসী দেশের তরুণ লেখক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তাদের দায়িত্ববোধ নেই এবং ঐতিহ্যের প্রতি ঘৃণা তাদের অফুরন্ত। চিত্তবিকাশের দিকে মনোনিবেশ না করে, কোনও প্রকার পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হয়ে শুধুমাত্র দৃশ্যমান বিভায় উজ্জ্বল হয়ে তারা সকলকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তাদের এ মানসিকতার জন্য দায়ী কিছুসংখ্যক প্রবীণ লেখক, যাদের প্রশ্রয়

না পেলে এরা মাথা উঁচু করতে পারত না। প্রুস্ত-এর উক্তি আমি এখানে পুরোপুরি তুলে দিচ্ছি : .

The electorate of the rising generation neither much more intelligent nor much less venal than that of the present. So it is quite natural to see a number of writers not only flattering the young as if they were voters, but even canvassing them with programmes cleverly rehashed to fill in with their tastes. Like the Republic, Symbolism still has its opportunist adherents, who would as willingly adhere to anything else rather than submit to being neither re-elected nor-re-read. Far from claiming to become our teachers on the grounds of being our elders, they assert that they must learn from us, and pass off their hatred of us as successors by exclaiming over us like courtiers. But these practices are confined to writers whose conception of art is so temporal, who are so artlessly sure that its kingdom is of this world, that we can only half sigh for the lessons they don't give us. There are some, more's the pity, who behave in the same way from higher motives, and instead of talking to the young listen to them, feeling certain—certainty is the word they use for the most arbitrary of hopes—that the words to hear will be forthcoming, and mean-while leave off giving us the teaching we have a right to expect from them.

But there is one thing even stranger: that although this has been going on for several years, not one young man has so far had the courage to say, "We have nothing to say, because we find nothing to think about. There has never been such a younger generation as ours. And if we seem exceptionally full of promise it is as infant prodigies do, and

such promises will not be kept. If every one goes on saying there has never been so much talent, that is because a journalist with a little aptitude for it can learn his trade in a few years, just as a harlot learns hers. You are old enough to be through with her. How much longer are you going to be fooled by the other ?" And he could have supplied some arguments in support of this. Never has there been such a knock-kneed sense of duty, nor such a total contempt for tradition. (Marcel Proust : On Art and Literature, 1957).

আমি একটি সমস্যার উল্লেখ করলাম মাত্র। এ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হলে আনন্দিত হব।

লোক-সাহিত্য

পল্লীজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও আনন্দ এবং ভক্তি ও বিনয়ের সর্বপ্রকার চৈতন্য লোক-সঙ্গীতে ধরা পড়ে। নগরের মধ্যে গ্রামের জনসাধারণের গতিবিধি সাধারণতঃ কম, নেই বললেই হয়। কখনো কখনো নগরের যে-সংবাদ গ্রামে আসে, গ্রামের জনগণ সেগুলোকে আপন আপন চিন্তা এবং বিস্ময়ের মধ্যে নতুন অর্থদ্যোতনায় গ্রহণ করে। এভাবে সকল প্রকার বিস্ময় ও আনন্দ তাদের স্মৃতিতে পুঞ্জীভূত হয় এবং যুগ যুগ ধরে কথায়, সুরে ও গানে সেগুলো অভিব্যক্তি লাভ করে।

লোক-সঙ্গীতগুলো সভ্যতার সমুদ্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। সভ্যতার জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন অথচ মানবচিত্তের নিগূঢ় জিজ্ঞাসায় বলিষ্ঠ এ সমস্ত পল্লীগীতিকা প্রাণ-প্রাচুর্যে আমাদের চিত্তের অনেক নিকটে। এই গানগুলো পরীক্ষা করলে আমরা যে-সমস্ত সত্য আবিষ্কার করব তা হচ্ছে, প্রথমত, সীমাবদ্ধ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয়ে লালিত একটি জীবন; দ্বিতীয়ত, পরিচর্যার মধ্যে অভিলাষহীন মানবচিত্তে যে-সমস্ত জিজ্ঞাসা জাগে তার পরিচয়; তৃতীয়ত, পরমপুরুষকে আবিষ্কারের মধ্যে ভাবনাহীন একটা আনন্দ।

অনেকে পল্লী-সঙ্গীতের মধ্যে নিগূঢ় দার্শনিক-তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন এবং বিভিন্ন সাধনার ইতিহাস সন্ধান করে সঙ্গীতগুলোর ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। তান্ত্রিক মতবাদ, বৌদ্ধ সহজিয়াদের রুচিবিকার, যোগ-প্রক্রিয়া এবং সুফী-তত্ত্ব সমস্ত কিছু তাদের ব্যাখ্যাসূত্রের মধ্যে ধরা পড়েছে। পল্লী-সঙ্গীতের রস-উপভোগের জন্য এ তত্ত্বগুলো কতটা অর্থপূর্ণ সে বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে একথা বলা চলে যে, এ সঙ্গীতগুলোর মধ্যে অননুশীলিত সাধারণ মানুষের বিভিন্ন জিজ্ঞাসা রূপ পেয়েছে। তত্ত্বকে গ্রহণ না করেও গানগুলোর রসাস্বাদন করা চলে। এগুলোর সুরে ও কথায় যে-আনন্দ আছে সে আনন্দ যোগতত্ত্ব অথবা তান্ত্রিকতার নয়। অ্যানথ্রোপোলজিস্ট বা নৃতত্ত্ববিদ্ এ গানগুলোর মধ্যে একটা বিশেষ অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর পরিচয় আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন, তত্ত্বরসিক সাধনার বিশেষ রূপ আবিষ্কার

করে অমর হবেন এবং রসিকজন গানের কথায় ও সুরে জীবনের সাড়া পেয়ে আনন্দিত হবেন। অর্থাৎ সর্বপ্রকার অনুসন্ধানের সুযোগ এ গানগুলোর মধ্যে আছে।

আমাদের দেশে পল্লী-সঙ্গীত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কখনো সংগৃহীত হয় না। আমরা সুরের সন্ধান করি না, আমরা কথার সন্ধান করি। অর্থাৎ গানের সুর এবং শব্দের বিশিষ্ট উচ্চারণ ধরে রাখি না। অর্ধশিক্ষিত সংগ্রাহকগণ গ্রামাঞ্চলে গিয়ে গ্রামের সাধারণ লোকদের কাছ থেকে গান শুনে নিজের উচ্চারণ ও বানানে সে গান লিখে আনে। এতে গানগুলোর সত্যিকারের স্বাদ চলে যায়, যা অবশিষ্ট থাকে তা হল তত্ত্বকথা। পল্লী-সঙ্গীতের মূল্য নির্ধারণের জন্য বাণীবিন্যাসের মধ্যে সুরের আবর্তন আবিষ্কার করা একান্ত কর্তব্য।

২

লোক-সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। মানুষের রীতিনীতি, স্মৃতি-সম্ভার, ধর্ম, গোত্র-বিন্যাস সর্বকালের লোক-সাহিত্যের সঞ্চয়। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ যখন কোনও প্রাচীন অঞ্চলের মানুষের পরিচয় নেবার চেষ্টা করেন, তখন তাঁরা তাদের কৃষি, ভূমিবণ্টন ও উত্তরাধিকারের নিয়ম, সমাজ বা সংস্কারগত বিশেষ নিষ্ঠার সন্ধান করেন। আরও সন্ধান করেন তাদের অভিচারের, দেবারাধনার ও সম্মোহনের উপর নির্ভরতার ইতিহাস। এ-সমস্ত সমাধানের ক্ষেত্রে লোক-কাহিনী, প্রবাদ, মন্ত্র ও ছড়া অনেক প্রয়োজনে আসে।

লোক-সাহিত্য মানব-জাতির সংস্কৃতির একটি মূল্যবান উপকণ্ঠ। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির ইতিহাস এবং সংস্কৃতির বিকাশে লোক-সাহিত্যের দান রয়েছে। যে-কোনও জাতির স্মৃতি-সম্ভার পরীক্ষা করলেই আমরা অনেক উপাখ্যান, প্রবাদ এবং মন্ত্রের সন্ধান পাব। তাই লোক-সাহিত্যকে অস্বীকার করে কোনও জাতির সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করা চলে না। কোনও জাতির সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস যদি পরীক্ষা করতে হয়, তবে তার লোক-সাহিত্যকে আমাদের বিচারের আয়ত্তে আনতে হবে। এ-সাহিত্যে জাতির বিভিন্ন উপলব্ধির সম্ভার আবিষ্কার করে আমরা বিস্মিত হব।

মানুষের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাব, দেখব কি করে একটি জাতি তার ইচ্ছার সামগ্রীকে নির্ণয় করেছে, অনেক ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করেছে। আবার বহু বিপরীত আকুলতার সমন্বয় ঘটাচ্ছে।

লোক-সাহিত্যের উদ্ভব কখন কোন্ অতীতে হয়েছিলো আমরা জানি না। এর ক্রমিকতা নেই, নিশ্চিন্ত একনিষ্ঠতা নেই; অনবরত পুনর্নির্মাণ, অস্বীকার এবং অনিবার্য লোক-মানস-নির্ভর আনন্দের প্রশ্রয়ে যুগে যুগে এর নতুন নতুন বিকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে লোক-সাহিত্যের ছড়ার ক্ষেত্রে এ-কথা অনেক বেশী সত্য। যুক্তির সম্ভ্রম নেই, শৃঙ্খলিত ভাব-সঞ্চার নেই অথচ তৃপ্তির কি আশ্চর্য উদারতা; অপরিসীম বেদনা নেই, দ্বন্দ্বের বিপর্যয় নেই, অথঁচ জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকেই স্পর্শ করেছে।

লোক-সাহিত্য সংগ্রহের অর্থ লোক-সাহিত্যকে নতুন জীবন দান করা নয়। এ-সংগ্রহের দ্বারা আমরা বিশেষ বিশেষ জীবন-বিকাশের পরিচয় সন্ধান করি, ঐতিহ্যের মূল্য নির্ণয় করি এবং স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির আবেগকে আবিষ্কার করি। একটি স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক প্রকাশের শিল্প-শৈলী থাকে না, অন্ততঃপক্ষে সে-শিল্প-শৈলী থাকে না, যা মানুষের সচেতন ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:

ক. ঘুম ঘুমানি মাসি গো ঘুম দিয়া যাও।
বাটায় বাটায় পান দিব গাল ভরে খাও॥
খোকা হাসে, খোকা নাচে, কথা কইয়া যাও।
দধি চিঁড়া খাইয়া তুমি ঠাণ্ডা হইয়া যাও।
আমাব খোকার চোখে একটু ঘুম দিয়া যাও॥

খ. চাপিলা চুপিলা,
ঘন ঘন মাজিলা,
শালের হুক্কা নলের বাঁশি
নল ঘুরাইতে একাদশী।
একা নলের বেঁকা ফুল,
কে কে যাইবে গাঙের কুল।

গাঙের কুলে উঠছে পানি
ভাইয়ে ভইনে টানাটানি।

গ. শিয়াল মামার বিয়া গো,
বেঙ্গা বাজায় শিংগা গো।
ঝিন্‌ঝি বাজায় করতাল।
বান্দরে দেয় উভে ফাল।
মিনি কয় শিয়াল ভাই,
ভাজা মাছ খাওয়া চাই;
বউ আন্‌লে সুন্দর
রঙ্গে ঢঙ্গে ঘর কর।

উদাহরণের অন্ত নেই। সচেতন বুদ্ধির কুশলতায় ছড়াগুলো নির্মিত হয় নি —এগুলো অপরিমিত অবকাশের আনন্দ-সঞ্চয়।

ছোটোগল্পের ভূমিকা

সমস্ত ছোটোগল্পের মধ্যে আমরা একটি চমক-লাগানো নতুনত্ব কামনা করি। চরিত্রের দিক দিয়ে, কথাবার্তার মধ্যে অথবা আবহের মধ্যে এমন একটা নতুনত্ব থাকবে যাতে গল্পটি সহজেই গৃহীত হয়। সম্পূর্ণভাবে নতুন কিছু কোথাও গড়ে ওঠা সম্ভব নয়, কিন্তু প্রচলিত বস্তুর অন্তরে নতুন ব্যঞ্জনা আনবার মধ্যেই কাহিনীকারের বিশিষ্টতা। গল্পের শেষের দিকেই কাহিনীকার আপন দক্ষতা ও কুশলতার পরিচয় দেন। অত্যন্ত পরিচিত কাহিনী একটি নতুন হৃদয়াবেগের মধ্যে রূপ লাভ করে। মোপাসাঁর "নেক্লেস্" গল্পটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। প্রথম থেকেই গল্পটি অত্যন্ত সহজ গতিতে অগ্রসর হয়েছে,—খুবই সাধারণ ঋজু কাহিনী। হঠাৎ শেষের দিকে রূঢ় প্রকৃতির আলোতে একটি সাধারণ জীবন দুর্লভ চেতনায় মহিমময় হয়ে উঠেছে।

শেক্সপীয়ারের মৌলিকত্ব নতুন কাহিনী রচনার মধ্যে কখনো ধরা পড়ে নি। সর্বজনজ্ঞাত কাহিনীকে নতুন পরিসরের মধ্যে তিনি আবার জীবন্ত করেছেন। তাঁর বিশিষ্টতা স্পষ্ট হয়েছে নতুন চরিত্র-সৃষ্টিতে।

অনেক সময় ছোটোগল্পের মধ্যে নতুনত্ব আনবার চেষ্টা করা হয় একটি প্রাচীন পরিচিত পুরানো অবস্থার মধ্যে একটি নতুন আবর্ত সৃষ্টি করে। সম্পূর্ণভাবে মৌলিক ঘটনা কেউ তৈরী করতে পারে না—প্রাচীন প্রবাহের মধ্যে নবতম আবর্ত ও ঘূর্ণন সৃষ্টি করা হয় মাত্র। এই ঘূর্ণন সৃষ্টির সুন্দর পরিচয় আছে জন্ টেইনটর ফুটের একটি গল্পে। একজন দক্ষ পিয়ানো-শিল্পী পিয়ানো শিখবার ভান করে একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তার প্রণয়াসক্ত হয়। লোকটির ছলনা যেখানে প্রকাশ পায়, সেখানেই আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে গল্পটি শেষ করা হয়েছে। যতদিন লোকটি ছল করে পিয়ানো শিখছিল ততদিন মেয়েটির প্রশ্রয়ে তাদের প্রণয় লালিত ও পরিবর্ধিত হচ্ছিলো, কিন্তু বর্তমানে তা আর সম্ভব নয়। এখন মেয়েটির মনে সংশয় জেগেছে, এত বড় দক্ষ শিল্পী আর তার কাছে আবদ্ধ থাকবে কি?

সম্পূর্ণ গল্পটির মধ্যে নতুন ইঙ্গিত থাকবে একটিমাত্র জায়গায়। ক্ষণদ্যুতির মতো কাহিনীকে তা অতর্কিতে উদ্ভাসিত করবে।

কাহিনী-বিন্যাসের মৌলিকতা ছাড়াও ছোটোগল্পের মধ্যে সাধারণ-উপভোগ্য ঘটনার অন্তরালে আমরা একটা নিগূঢ় জীবনবোধের পরিচয় পাই। বর্ণনীয় বস্তুর আড়ালে একটা বিশেষ চিন্তা বা ধারণা ক্রিয়া করে। ছোটোগল্প আমাদের আনন্দ দেবে, কিন্তু উপদেশে পরিণত না হয়েও জীবন-সম্পর্কে আমাদের মনে তা এক গভীর বিশ্বাসের সৃষ্টি করবে। গ্রীকদের সম্পর্কে ম্যাথু আরনল্ড্ যে-কথা বলেছিলেন ছোটোগল্পের আধুনিক রূপ-বিবর্তনের ক্ষেত্রে সে কথা বলা যায়—

Their theory and practice alike ; the admirable treatise of Aristotle and the unrivalled work of their poets, exclaim with a thousand tongues—"All depends upon the subject ; choose a fitting action, penetrate yourself with a feeling of its situations, this done, everything will follow."

বিষয়বস্তুর নির্বাচনের উপর এবং দ্বিতীয়ত, সেই বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রাণ-সঞ্চারণের উপরই ছোটোগল্পের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। অনুভূতির স্পর্শে কাহিনীর প্রত্যেকটি পর্যায় দীপ্যমান হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের 'মহামায়া' ও 'জীবিত ও মৃত' বিষয়নির্বাচনের অপূর্ব কুশলতার পরিচয় বহন করছে। দূরাগত সঙ্গীতের অপরিচিত কাকলী প্রাত্যহিক জীবনের নৈমিত্তিক সুর হয়েছে। 'মহামায়া' গল্পে দ্বিধাগ্রস্ত রাজীবের প্রণয় যখন অসার্থক হল, তখন সে শেষ বিদায় নিতে এল মহামায়ার কাছে। মহামায়ার ভ্রাতা তাকে রাজীবের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে এনে বিয়ে দিল এক মুমূর্ষুর সঙ্গে। চলে যাবার আগে মহামায়া রাজীবের কাছে ফিরে আসবে বলে কথা দিল। বিয়ের পরদিনই সে বিধবা হল, অনুমৃতা হবার জন্য প্রস্তুত হল, এবং ঝড়-জলের সুযোগে চিতা থেকে উঠে এল রাজীবের ঘরে। তার মুখ আগুনে ঝলসে গিয়েছিলো। সে চিরকাল রাজীবের সঙ্গে থাকবে বলে প্রস্তুত হল কিন্তু সেই সঙ্গে রাজীবের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিলো যে, সে কখনও মহামায়ার ঘোমটা খুলবে না, মুখ দেখবে না। একটা তুচ্ছ মুখাবরণ মৃত্যুর চেয়ে বেদনাদায়ক ব্যবধান সৃষ্টি করলো উভয়ের মধ্যে।

একদিন শুক্লপক্ষে দশমীর রাত্রে নিদ্রিত মহামায়ার মুখাবরণ উন্মোচন করে রাজীব শিউরে উঠল। "রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া মুখ নত করিয়া

দেখিল—মহামায়ার মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হায়. এ কী! সে চিরপরিচিত মুখ কোথায়! চিতানলশিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গেছে।

"বোধ করি রাজীব চমকিয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি একটা অব্যক্ত ধ্বনিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকিবে। মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, —দেখিল সম্মুখে রাজীব। তৎক্ষণাৎ ঘোমটা চাপিয়া শয্যা ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজীব বুঝিল, এইবার বজ্র উদ্যত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল—পায়ে ধরিয়া কহিল, 'আমাকে ক্ষমা করো'।

"মহামায়া একটি উত্তরমাত্র না করিয়া মুহূর্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল।"

"জীবিত ও মৃতের" মধ্যেও শ্মশান থেকে উঠে আসার ঘটনা আছে কিন্তু কাহিনীবিন্যাস সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। এই গল্পের মৌলিকত্ব ফুটে উঠেছে—অপ্রাকৃত জীবন-বোধের সঙ্গে বাস্তবজীবনের দ্বন্দ্বের মধ্যে। মানুষের মনের চিরন্তন সংশয়, দ্বিধা ও ভীতি কাদম্বিনীকে শ্মশানচারী প্রেতিনী হিসেবে গ্রহণ করতে চাইল কিন্তু মানুষের অধিকার দিল না। "তখন কাদম্বিনী 'ওগো আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই'—বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরে পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল; শারদাশঙ্কর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

"সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে—মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।"

প্রভাতকুমারের মৌলিকত্ব যেখানে প্রকাশ পেয়েছে পটভূমি নির্বাচনে, রবীন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব সেখানে স্পষ্ট হয়েছে কাহিনীর নতুন বিন্যাসে। একজন শুধু কাহিনীর জন্য স্থান নির্বাচন করেছেন, অন্যজন সেখানে প্রাণ-

সম্পদের দ্যোতনা এনেছেন। আবদ্ধ আঁধারের নিম্নে উদ্‌গত শ্বেত কিশলয়ের সঙ্গে সূর্যালোকে উদ্ভাসিত মৃত্তিকার যে পার্থক্য,—প্রভাতকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই পার্থক্য।

বিষয়-মাহাত্ম্যে ওয়ার্ড মুরের 'সূর্যোদয়' (Sunrise) গল্পটি মধুর। চীন মুলুকের একটি সুন্দরী মেয়ে চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্ধকার আবেষ্টনীতে জীবন কাটিয়েছে, কখনো সে সূর্য দেখে নি। এক রাত্রে তার প্রেমাস্পদ তাকে তার পরিবেশের বাইরে নিয়ে এলো। পরদিন সকালে মেয়েটি তার জীবনে প্রথম সূর্যোদয় দেখলো। সে ভাবলো যে, পরমপুরুষকে সে দর্শন করেছে। এই ধারণার বিরাট্‌ত্ব ও ভয়াবহতার আঘাত সে সহ্য করতে পারলো না। তার মৃত্যু ঘটলো।

I raised my eyes from Kima's kneeling figure, and saw the sun.

It was a burnished ball, emerging, as I looked, from a bed of fog. Moment by moment it grew more distinct, more and more fiery. The clouds were furling off from it like ornate curtains drawn from before an immense inconceivable furnace. Its rays were drinking the vapours from the abysses like steam. And then I saw the sun as an Eye.

I stood, staring and dizzy; and beside me I heard a movement. Kima had risen from her knees, and was standing too, enfronting the sun.

'What is this?' The word burst from her in a cry of awe. 'What is this?'

The sun swum clear of the clouds. Its full force rained upon us. And suddenly I heard Kima again:

'I must look!'

With a gesture at once sublime and despairing, she tore the bandage from her brow.

I was paralyzed. I knew that Kima was lost to me ; but I could not move.

She gazed, entranced, for one tremendous moment, full into the face of the sun, then fell on her knees, and in an abandonment of adulation prostrated herself to the ground, her hands outspread in abject reverence······

At last with an effort that was pain, I bent down and touched her.

She paid no heed.

I tried to raise her.

She was inert. She slipped sideways in my hands and I saw her face.

It was the face of one who had beheld in the firmament a radiance unimaginable. Its dazzling and calamitous grandeur had stricken her to the earth, and stunned her in her adoration of its peerless majesty. She had lifted up her eyes to the glistering portent of the risen sun ; she had rested them upon that stupefying blaze ; she had seen the light ineffable. She had looked upon the sun's magnificence, and the lustre of its flaming was too dire to be borne. In that unemdurable splendour, she had thought she saw God. And in the terror and bliss of that revelation, her soul had been set free.

Kima was dead !

এই মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে চরিত্র-বিশ্লেষণে, মননশীলতায় এবং মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনোবিকলনের ঔচিত্যবিরোধী ঘটনার উপর গল্পের কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন। সামাজিক শ্লীলতা মানুষের যে-আদিম সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে তাকে তিনি পরিহার করতে চেয়েছেন মানব-মনের যথার্থ রূপায়ণের জন্য। বিকৃত যৌনবোধের যে-অসহায় লোলুপতার আশ্রয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত লালিত হচ্ছে—তাকে তিনি স্পষ্ট আলোতে প্রত্যক্ষ

করেছেন। তাই তাঁর কাহিনীতে মনোবিকলনের বিভিন্ন অবস্থার পরিচয়-সূচক ঘটনার বিন্যাস আছে। সেখানে রাত্রির অন্ধকারে ছায়ামূর্তি চঞ্চল হয়, সেখানে অনুভূতির সূক্ষ্ম স্পর্শ নেই, সেখানে প্রাণের লাবণ্য জাগে স্থুল দেহের উপভোগের মধ্যে, সেখানে দুর্ভাগ্যের নৃশংস ছায়াঞ্চলেও লালসা হাহাকার করে ওঠে। মনিবের স্ত্রীর গোপন কামনায় দুর্বল পুরুষ জর্জরিত হচ্ছে, নারী-দেহের মোহ কাটাবার জন্য দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ে আর্তনাদ করছে কিন্তু সত্যিকারের আলিঙ্গনে এতদিনকার স্বর্গমর্ত্য-ধ্বংসকারী উন্মত্ত কামনার দুর্বার আবেগ প্রশমিত হচ্ছে। মদালসা নারীর আলিঙ্গন তার কাছে হঠাৎ মনে হচ্ছে ব্যাকুলতাহীন। পতিগতপ্রাণা অশিক্ষিতা গ্রাম্য নারী রূপবান জমিদার-তনয়ের আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে আপনাকে মনে করছে সৌভাগ্যশালিনী। পাচকের ঔরসজাত পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করে স্বামী-সৌভাগ্যে স্ফীত হচ্ছে ধনীর কন্যা। এভাবে জীবনের প্রত্যেকটি দিকে পরিপুষ্ট দেহকে আড়ালে রেখে কঙ্কাল জেগে উঠেছে। মানুষের প্রকৃতির সহজাত সত্যকে তিনি আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে উদ্‌ঘাটন করেছেন। অন্তরের লুব্ধতার খবর আমরা পেয়েছি।

প্রমথ চৌধুরীর মৌলিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। অনবদ্য বর্ণনা-ভঙ্গীতে কাহিনী স্ফূর্তি পেয়েছে। আশ্চর্য ভাষায় সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তাঁর ভাষা কাহিনীতে আবেশ সৃষ্টি করে নি কিন্তু উজ্জ্বল দীপ্তি এনেছে। কাহিনী কোথাও মুখ্য নয়, চরিত্র সর্বত্রই ভাষার অনুষঙ্গী। প্রত্যেক কথার রেশ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষান্ত হয়, পর মুহূর্তেই নূতন অর্থ নিয়ে আসে। এ যেন বিধাতার খেয়ালখুশিতে আকাশে নিশ্চিন্তে সহজে তারা ছিটিয়ে দেওয়া। "সোনার গাছ, হীরের ফুল" গল্পটি অদ্ভুত ভাবে আরম্ভ হয়েছে—

"অচিনপুরের রাজকুমারের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার পূর্বরাত্রে ঘুম হয় নি। অবশেষে শেষ রাত্রে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সে তো নিদ্রা নয়,-সুষুপ্তি। এই সুষুপ্ত অবস্থায় তাঁর সুমুখে একটি জ্যোতির্ময় দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হলেন। তিনি অল্পক্ষণ পরেই জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন —সে দেশ কখনো দেখেছ, যে দেশে সোনার গাছে হীরের ফুল ফোটে ?—রাজকুমার বললেন—না।

—দেখতে চাও ?

—হ্যাঁ।

—আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

—কত দূরে সে দেশ ?

—সহস্র যোজন।

—যেতে কতদিন লাগবে ?

—চোখের পলক না পড়তে। তুমি যদি এখনই পাত্র-মিত্র নিয়ে যাত্রারম্ভ কর, তা হলে এ দীর্ঘ পথ আমি তোমাকে নিয়ে ভোর হতে না হতে উৎরে যাব।

—কী উপায়ে ?

তুমি আর তোমার বন্ধুরা জামাজুতা পরে হাতিয়ার নিয়ে নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হও ; আমি সে-সব ঘোড়াকে পক্ষীরাজ করে দেব ; অর্থাৎ তাদের পাখা বেরুবে, আর তারা উড়ে চলে যাবে।

রাজকুমার দৌবারিককে ডেকে বললেন, এখনি যাও, মন্ত্রী-পুত্র, সওদাগরের পুত্র ও কোটালের পুত্রকে নিজ নিজ ঘোড়ায় চড়ে, জামা-জুতো পরে, হাতিয়ার নিয়ে এখানে চলে আসতে বলো। আমিও রণবেশ করছি।

অল্পক্ষণ পরেই রাজকুমার নীচে নেমে এলেন। এসে দেখেন যে, মন্ত্রী-পুত্র, সওদাগর পুত্র আর কোটালের পুত্র সব সাজসজ্জা করে এসে উপস্থিত হয়েছেন। রাজপুত্রের কানে হীরের কুণ্ডল, মাথায় হীরকখচিত উষ্ণীষ, গলায় হীরের কণ্ঠী, পরণে কিংখাবের বেশ, পায়ে রত্নখচিত নাগরা। আর তার ঘোড়ার রঙ্‌ পিঙ্গল। মন্ত্রী-পুত্রের কানে মুক্তোর কুণ্ডল, মাথায় ধবধবে সাদা পাগড়ী, গলায় মোতির মালা, পরণে শ্বেতাম্বর, পায়ে শ্বেত মৃগচর্মের পাদুকা। আর তাঁর ঘোড়ার রঙ্‌ রূপোর মত। সওদাগরের পুত্রের কানে সোনার কুণ্ডল, মাথায় জরির পাগড়ি, গলায় সোনার কণ্ঠী, পায়ে সেই রঙের বিনামা। আর তার ঘোড়ার রঙ্‌ তামার মত। কোটালের পুত্রের কানে পলার কুণ্ডল, মাথায় লাল পাগড়ি, গলায় পলার কণ্ঠী, পরণে রক্তাম্বর, পায়ে গণ্ডারের চামড়ার জুতো। আর তাঁর ঘোড়ার রঙ্‌ লোহার মত।"

অপ্রাকৃত ও অবাস্তব বিষয়ের অবতারণায় যে-রূপকথার সৃষ্টি হয়,

উদ্ধৃতিতে সে রূপকথার পরিচয় নেই। এখানে শব্দের জাদুশক্তিতে রূপকথা গড়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্টতা ও মৌলিকতা এইখানেই। পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তৈরী করে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে মানব-মনের অনুভূতি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা তিনি করেন নি। এখানে জীবন জেগেছে অনবদ্য বাগ্‌ভঙ্গীর মধ্যে। এখানকার চরম সত্য যাচ্ঞা ও ব্যর্থতার কাহিনী নয়, কিন্তু নিশ্চিন্ত সহজতায় সমস্ত কিছুকে প্রকাশ করবার বাণীবিন্যাসে। আমাদের প্রতিদিনের কথা বলার মধ্যে কত আনন্দের কথা, কত ব্যর্থতার কাহিনী-যে উহ্য থাকে, তা আমরা নিজেরাও জানি না। প্রমথ চৌধুরীর কাছে এই কথা-বলাটাই প্রধান রূপ নিয়েছে, বিবৃত কাহিনী হয়েছে গৌণ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই কথা-বলাটিকে আরও সুন্দর ও জমাট রূপ দেবার জন্য তিনি কাহিনীর অবতারণা করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত ব্রাউনিং-এর দু'টি সুর মিলে একটি তারকাসৃষ্টির মতো কাহিনী ও কথা সম্মিলিত হয়ে আমাদের জীবন-বোধকে সুতীব্র করেছে। উপমা-স্বরূপ "বীণাবাঈ" গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। চটুলতা ও বাগ্‌ভঙ্গীর স্ফূর্তির মধ্যে কাহিনীর আরম্ভ এবং সেভাবে তার শেষ; অথচ তার মধ্যে সুরের সম্মোহনে যে-নারী সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছেন তাঁর জীবনের দ্বন্দ্ব ও ট্রাজিক অনুভূতির পরিচয় স্পষ্ট হতে দেখি। গল্পের সূত্রপাতে আছে—

"এ গল্প আমার ঘোষালের মুখে শোনা। এ কথা আগে থাকতেই বলে রাখা ভালো। নইলে লোকে হয়তো ভাববে যে, এ গল্প আমিই বানিয়েছি। কারণ ঘোষালের গল্পের যা প্রধান গুণ, স্ফূর্তি—এ গল্পের মধ্যে তার লেশমাত্র নাই। এ গল্প বৈঠকী নয়, অর্থাৎ রায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় বলা নয়;—আমার ঘরে বসে নিরিবিলি আমাকে বলা। কোন্ অবস্থায়,—বলছি।"

এর পর যে-অবস্থায় ঘোষাল গল্পটি বলেছিল, তার বর্ণনা করা হয়েছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। সাধারণ পাঠকের কাছে গল্প উপভোগের ক্ষেত্রে এ বর্ণনার মূল্য নেই, কিন্তু বিশেষভাবে অনুধাবন করলেই দেখতে পাব যে, এ বর্ণনার উপরই গল্পটি গড়ে উঠেছে এবং এর উপর নির্ভর করেই তা বেঁচে আছে।

বীণাবাঈ-এর সৌন্দর্য বর্ণনায় সংক্ষিপ্ত রসঘন কথার আবেগ আছে কিন্তু বাহুল্য উক্তির উচ্ছ্বাস নাই—

"সেখানে গিয়ে দেখি, যিনি একটি রাঙ্কব আসনে উপবিষ্ট আছেন, তিনি স্বয়ং সরস্বতী;—তন্বী, গৌরী, বিগাঢ়-যৌবনা, শ্বেতবসনা। আর তাঁর কোলে একটি বীণা। এ সরস্বতী পাথরে কোঁদা নয়, রক্তমাংসে গড়া।"

বনফুলের মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে কাহিনীর মোড় পরিবর্তনের আকস্মিকতার মধ্যে। বস্তুতঃ এই নাটকীয় বিবর্তনের উপরই তাঁর কাহিনীর সমস্ত সৌন্দর্য নির্ভর করছে। বনফুলের আর একটা বিশেষত্ব, তাঁর ইঙ্গিতময়তা। মূল কাহিনীর প্রত্যেকটি পর্যায়ের পূর্ণবিকাশের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন নি; তিনি পূর্ণতর সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন কিন্তু সেই সত্যকে স্পষ্ট করেন নি। এ কারণেই কখনো কখনো তাঁর গল্প নিছক চাতুর্য হয়েছে মাত্র।

একটি চরিত্রকে অনুসরণ করে কাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা তারাশঙ্করের "নুটু মোক্তারের সওয়াল" গল্পে পাই। এ চরিত্রের মধ্যে দুর্বলতা নেই,—নিশ্চিন্তে অগ্রসর হয়েছে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করে। এভাবে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কাহিনী রচনাও করে চলেছে। ঘটনার প্রয়োজন হয়েছে চরিত্রের গতিবৃদ্ধির জন্য।

তারাশঙ্করের মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে বীরভূমের উষর মৃত্তিকাকে কাহিনীর প্রাণ-সঞ্চারী পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করার মধ্যে। রুক্ষ, নিষ্ঠুর, নির্লিপ্ত পরিবেশের মধ্যে যে-জীবন জেগে উঠেছে তার মধ্যে নির্জীবতার অবকাশ নেই। সে জীবন অগ্রসর, সতেজ ও নির্বিকার। তাই ডাক-হরকরার জীবনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফুরসৎ নেই, কর্তব্যনিষ্ঠা তার স্বাভাবিক ধর্ম। দূরের আলো জোনাকির বিন্দুর মতো প্রতীয়মান হলেও ক্রমশঃ সান্নিধ্যে এসে আপনার অস্তিত্বের নিশ্চয়তার কথা জ্ঞাপন করে। তারাশঙ্করের দীনু ডোম অন্ধকার রাত্রের ক্ষণদ্যুতির মতো আপনার জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আশ্চর্য ভাবে।

গল্পলেখার মৌলিকতা অর্জনের জন্য ফ্লবেয়ারের উপদেশটি অত্যন্ত সুন্দর। তিনি মোপাসাঁকে লিখেছিলেন—

Everything which one desires to express must be looked at

with sufficient attention, and during a sufficiently long time, to discover in it some aspect which no one has as yet seen or described. In everything there is still some spot unexplored, because we are accustomed only to use our eyes with the recollection of what others before us have thought on the subject which we contemplate. The smallest object contains something unknown. Find it. To describe a fire that flames, and a tree on the plain, look, keep looking at that flame and that tree until in your eyes they have lost all resemblance to any other tree or any other fire.

যে-মানুষের সত্যি কিছু বলবার আছে তাঁর কথা শোনবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব, উৎকণ্ঠিত, সে সার্থকতা অর্জন করে—

"........and by the vision splendid,
Is on his way attended."

মলিয়ার

ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার প্যারিস শহরে ১৬২২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল জঁা বাপ্তিস্ত পোক্যালি। তাঁর পিতা ছিলেন গৃহ-সজ্জা সরবরাহকারী ব্যবসায়ী। ফরাসী রাজদরবারেও তাঁর কিছু প্রতিপত্তি ছিল; কারণ সেখানে তিনি valet de chambre ছিলেন। তাঁর আশা ছিল পুত্র মলিয়ার ভবিষ্যৎ জীবনে পৈত্রিক পেশাকেই অবলম্বন করবে। প্রথম অবস্থায় পুত্রকে তিনি ক্লেরমঁতের জেসুইট কলেজে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। মলিয়ার সেখানে ভালই শিক্ষালাভ করেন। এবং চতুর বুদ্ধিজীবীদের সংসর্গ লাভ করেন। এঁদের মধ্যে বুরবঁর আরমন্দ ও কাঁতির যুবরাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা পরবর্তী কালে মলিয়ারকে অনেক সাহায্য করেছেন।

যে-সময় মলিয়ারের আবির্ভাব, এবং যে-সমাজ ও পরিবেশে এবং যে শিক্ষায় তিনি লালিত, তা নাটক-রচনাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার অনুকূল ছিল না; দ্বিতীয়ত, যাদের সংসর্গ তিনি লাভ করেছিলেন, তাঁরা সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের; তৃতীয়ত, মলিয়ারের সময় নাট্যমঞ্চ গৌরবময় কর্মক্ষেত্র ছিল না এবং অভিনয়-কর্ম ও নাট্যরচনা অত্যন্ত নির্জীব ও দুর্বল অবস্থায় ছিল। তিনি-যে মঞ্চকে পেশারূপে গ্রহণ করেন তার প্রাথমিক কারণ মলিয়ারদের প্রতিবেশী এক সরকারী কর্মচারীর কন্যা বেজার্ত মেদেলিনের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। মেদেলিনদের পরিবারটি ছিল কিছুটা বোহেমিয়ান প্রকৃতির এবং নাটকে অত্যন্ত উৎসাহী। ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে মলিয়ারের পিতা শেষবারের মত চেষ্টা করলেন, যেন তাঁর পুত্র গৃহসজ্জা সরবরাহকের ব্যবসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ত্রয়োদশ লুইয়ের সাথে **valet-tapissier du roi** করে **Narbonne**-এ পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই কর্ম মলিয়ারের মনঃপূত হল না। তিনি প্যারিসে ফিরে এসে পিতাকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাঁর পেশাকে গ্রহণ করতে পারবেন না। অতঃপর মলিয়ার মেদেলিনের সহায়তায় ১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে ইলাস্টর থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। মলিয়ারের সময় নাট্যশিল্পের সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা, বিশেষ করে নাট্যকারগণ একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। মলিয়ার সে প্রথা অনুসারে তাঁর নিজের নামকরণ করলেন 'মলিয়ার'।

প্যারিস শহরে প্রথম অবস্থায় মলিয়ারের কোন খ্যাতি হল না। তিনি অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পতিত হলেন, ঋণগ্রস্ত হলেন এবং অবশেষে ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ হলেন। কারামুক্তির পর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বড় শহরের বাইরে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে তিনি তাঁর দল নিয়ে ঘুরবেন এবং একটি নাট্যান্দোলন গড়ে তুলবেন। এ ভাবে তাঁর হয়তো অর্থনৈতিক সুরাহাও কিছুটা হবে। প্রায় বারো বছর তিনি তাঁর দল নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ ভাবেই ক্রমান্বয়ে মঞ্চশিল্পে, অভিনয়ে ও রচনায় তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটে।

এই বারো বছর মলিয়ারের জন্য ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার উন্মেষকাল। নাটক লিখতে যেয়ে, অভিনয় করতে যেয়ে এবং ব্যবসায় সূত্রে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি জনসাধারণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংযোগে আসেন। এ ভাবে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তীক্ষ্ণ অনুভূতি এবং সজাগ চেতনায় তিনি মানুষের আচরণকে লক্ষ করেছেন এবং অপূর্ব দক্ষতায় তাকে রূপ দিয়েছেন।

সে যুগে রীতি ছিল বিয়োগান্ত নাটক রচনা করা। কেননা, শিল্প-রসিকদের কাছে বিয়োগান্ত নাটকই ছিল শিল্প হিসাবে আদর্শ। যেহেতু কৌতুক-নাটককে পরিচিত জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হয় এবং যেহেতু মলিয়ার সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের আচরণেব সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাই তিনি ট্র্যাজেডির দিকে অগ্রসর না হয়ে স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ-নাটক রচনায় মনো-নিবেশ করেন। শিক্ষানবিশী কালে তিনি ট্র্যাজেডির নায়ক সাজতেন; কিন্তু সে ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু কৌতুক-নাটক অভিনেতা হিসাবে তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ; ফলে আমরা যখন মলিয়ারের দলকে প্রহসন ও কৌতুক-নাটক মঞ্চস্থ করার দিকে ঝুঁকতে দেখি তখন বিস্মিত হই না। মলিয়ারের প্রথম রচনা ইতালীর নাট্যকার নিকোলো বারনিয়েরীর নাটক অবলম্বনে রচিত লেতুর্দী (Letourdi) ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে লিয়ঁতে মঞ্চস্থ হয়। নাট্যকার মলিয়ার

সর্বদাই অভিনেতা মলিয়ারকে লক্ষ্য রেখে তাঁর উপযুক্ত চরিত্র সৃষ্টি করতেন। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এভাবে দর্শক অবশ্যই খুশি হবে।

প্রথম অবস্থায় মলিয়ার প্রাচীন ফরাসী নাটক, কমেদিয়া দেলার্ত (Commedia dellarte) ও প্রাচীন প্রহসন থেকে তাঁর নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করতেন। এগুলিতে সাধারণতঃ কিছুটা স্থূল ধরনের কৌতুক থাকতো, যা সহজেই সাধারণের নিকট প্রিয় হত। অবশ্য মলিয়ার ক্রমাগত নিজ কাজে অভিজ্ঞতাকে লাগিয়ে পূর্ণতর নাটক রচনার দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। যার ফলশ্রুতি ক্ল্যাসিক ফরাসী কমেডি।

মলিয়ার ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে ফিরে আসেন। ঐ বছর ২৪শে অক্টোবর তাঁর পেশাদার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সম্মুখীন হন তিনি। ঐ দিন তাঁকে ফরাসী রাজা ও রাজদরবারে অভিজাত মহলের সামনে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করতে হয়। পরীক্ষায় তিনি সফলকাম হলেন; ফলে, রাজকীয় বুরবঁ (Petit-Bourbon) থিয়েটারে নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করার অনুমতি পেলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক হলেন রাজভ্রাতা, এবং তাঁর দলের নাম হল ত্রুপ দ্য মঁসিয়ে। (Trupe de Monsieur)।

নাট্যকার হিসাবে ক্রমশঃ মলিয়ারের আশ্চর্য দক্ষতা প্রকাশ পেতে থাকে। The Affected Young Ladies (Les Precieuses Ridicules) নামে একটি নতুন নাটক তিনি ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকে তৎকালীন সমাজে যারা সুবিধাবাদী ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগসন্ধানী ছিলো, তাদেরকে বিদ্রূপ করেন। নাটকটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই নাটকে যেমন, তেমনি অন্যান্য রচনায় মলিয়ার সামাজিক বিকৃতি ও মানুষের মিথ্যা মর্যাদাবোধকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেন। তিনি সামাজিক-চিত্রকে এমনভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরেন যাতে কল্পিত ঘটনা বাস্তব ঘটনা অপেক্ষা মূল্যবান হয় এবং দর্শক চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে সমাজকে কৌতুকের বস্তুরূপে দেখতে পায়। ফলে স্বাভাবিকভাবে তাঁর নাটকগুলি জনসাধারণের প্রিয় হয়ে ওঠে।

১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে মলিয়ারের বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তিনি মেদেলিনের বোন আরমণ্ড বেজার্তকে বিয়ে করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের এই বিয়ে

সুখের হয় নি। বেজার্ত মলিয়ারের দলে প্রথম থেকেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে অসদ্ভাবের ফলশ্রুতিরূপে আমরা মলিয়ারের অনেকগুলি নাটকে বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার ছবি দেখতে পাই। মলিয়ারের 'The School for Wives' নাটকখানিতে এই বিবাহ-ব্যর্থতার আভাস আছে। এই নাটকটি মলিয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক না হলেও, এ নাটকের দ্বারাই সাহিত্য-জগতে মলিয়ারের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

মলিয়ারের প্রধান সুহৃদ ছিলেন রাজা চতুর্দশ লুই। রাজার ফরমায়েশ মত তাঁকে অনেক কিছু লিখতে হত। যার ফলে মলিয়ারের বহু সময় অপব্যয় হত। কিন্তু তবুও মলিয়ার ক্রমাগত নাটক রচনা করে যান এবং অভিনয় অব্যাহত রাখেন। অনেক সময় নাটকগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। তাঁর প্রভু ছিল দুই জন—এক রাজা অপর জনসাধারণ। এদের উভয়কেই তাঁকে খুশি রাখতে হত।

মলিয়ারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক তারতুপ (Tartuffe) ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মে মঞ্চস্থ হয়। এটি এক ভণ্ডের কাহিনী। ভণ্ডামি যার জীবনে একমাত্র লক্ষ্য, এমন কি সে নিজেকেও প্রতারণা করতে দ্বিধা করে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভণ্ড একজন ধার্মিক ; ফলে তৎকালীন প্যারিসের ধর্মপারায়ণ জনসাধারণের মধ্যে নাটকটি প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং নাটকটির বিরুদ্ধে একটা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই কারণে রাজার অনুরোধে মলিয়ায় নাটকটির মঞ্চায়ন বন্ধ করে দেন। পাঁচ বছর যাবৎ নাটকটি আর প্রকাশ্যে অভিনীত হতে পারে নি। পরে যখন পুনরায় এটি মঞ্চস্থ হয়, তখন অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত এটি ফরাসী সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে মর্যাদা পেয়ে আসছে।

এর পরে মলিয়ারের নাটক 'ডন জুয়ান' সকল প্রকার বিরূপ সমালোচনা উপেক্ষা করে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে রাজা মলিয়ারকে ছয় হাজার লিয়ারের একটি বৃত্তি দান করেন এবং এর পর থেকে মলিয়ারের দলের নাম হয় 'ত্রুপ দ্যু রঁয়'। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুন মলিয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডি 'লে মিজঁাত্রপ' (Le Misanthrope) মঞ্চস্থ হয়। এর পটভূমি আরো বিস্তৃত। নাটকের প্রধান চরিত্র আল্‌চেস্‌ত একজন বিশ্ববিদ্বেষী যুবক। সে সমাজের তথাকথিত আদব-কায়দা ও তার বিকৃতির ঘোরতর

বিরোধী। অথচ তার প্রণয়িনী সেলেমীন এই সমাজের প্রতিভূ। এই কারণে আল্‌চেস্‌তের সমালোচনা বা প্রতিবাদ কিছুই জনতার নিকট গৃহীত হয় না। নাটকটি মলিয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে পরবর্তী কালে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু সম্ভবত সূক্ষ্ম রচনার কৌশলের জন্য তৎকালীন সমাজে নাটকটি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে অগাস্ট মাসে মলিয়ারের অপর নাটক "The Physician in spite of Himself" মঞ্চস্থ হয়। নাটকটিতে তিনি তৎকালীন চিকিৎসক সমাজকে কটাক্ষ করেন। নাটকটি জনসাধারণের যথেষ্ট হাসির খোরাক যোগায়।

মলিয়ার আজীবন দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। নাট্যমঞ্চে সার্থকতা ও প্রতিপত্তিলাভ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বঞ্চনাকে দূর করতে পারে নি। স্ত্রীর সঙ্গে অসদ্ভাব তাঁর সংসার-জীবনে একটি অনিশ্চয়তা এবং নির্মম একাকিত্ব সৃষ্টি করেছিল। তা ছাড়া দৈহিক অসুস্থতাও তাঁকে ব্যাধিতাপে আচ্ছন্ন রেখেছিল। কিন্তু সকল মানসিক ও শারীরিক যাতনাকে উপেক্ষা করে মলিয়ার নাটক রচনা করে চলেন। তিনি পরবর্তী বছর (১৬৬৮) 'Amphitryon,' 'Georges Dandin' এবং 'Lavare'—এই তিনটি নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করেন। শেষোক্ত নাটকটি মঞ্চনির্ভরতা ও নাট্যকলার দিক থেকে মোটেই সফল হয় নি। এর কারণ, এ সময়ে লিখিত নাটকগুলো অধিকাংশই রাজ-নির্দেশে এবং রাজার মনস্তুষ্টির জন্যে রচিত। ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে চিকিৎকদের ঠাট্টা করে পুনরায় 'M. de Pourceaugnac' রচনা করেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কমেডি ব্যালে—'Le Bourgeois Gentilhomme' মঞ্চস্থ হয়। ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী মেদেলীন বেজার্তের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু যদিও মলিয়ারকে যথেষ্ট আঘাত দেয়, তথাপি তিনি রচনা-কর্ম অব্যাহত রাখেন। সেই বছর ১১ই মার্চ তাঁর অপর শ্রেষ্ঠ কমেডি 'Les Femmes Savantes' মঞ্চস্থ হয়। এর পর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। ফলে অভিনয় করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। অতঃপর মলিয়ার তাঁর সর্বশেষ রচনা "Le Malade Imaginaire' মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতির কাজে ব্যাপৃত থাকেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে মলিয়ার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। বন্ধুবান্ধব, হিতৈষী সকলেই অভিনয় স্থগিত রাখার জন্য মলিয়ারকে অনুরোধ

জানান। কিন্তু মলিয়ার তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নি ; কারণ তাঁর মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার উপর নির্ভর করছিল দলের পঞ্চাশ জন শিল্পীর জীবিকা। অভিনয়কালেই-যে মলিয়ারের খুব কষ্ট বোধ হচ্ছিল, তা অনেকেই লক্ষ করেন। অভিনয় সমাপ্ত হতেই মলিয়ার জানালেন যে, তিনি খুব অসুস্থতা বোধ করছেন। দ্রুত তাঁকে গৃহে স্থানান্তরিত করা হল। ঘরে ফিরে যখন তিনি সামান্য আহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন এমম সময় প্রবল কাশি তাঁকে আক্রমণ করল! বার বার তিনি স্ত্রীর নাম করে ডাকতে লাগলেন ; কিন্তু স্ত্রী তখন কোথায়! অতঃপর মলিয়ার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর কাছে তখন অবস্থান করছেন দু'জন অপরিচিত ব্যক্তি। মৃত্যুকালে তিনি শেষ ক্রিয়াটুকুও লাভ করলেন না। এ কারণে আর্ক বিশপ খ্রীস্টান ধর্মমতে তাঁকে সমাধিস্থ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। অবশেষে আরমন্দের অনুরোধে রাজার হস্তক্ষেপের ফলেই মলিয়ারকে সেন্ট জোসেফ কবরস্থানে সমাহিত করার ব্যবস্থা করা হল।

ফরাসী বিপ্লবের সময় মলিয়ারের দেহাবশেষ **Pantheon**-এ স্থানান্তরিত করা হয় এবং সর্বশেষে **'Pere Sachaise'** কবরস্থানে তাঁর দেহাবশেষ রক্ষা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমাধি কোথায় কেউ বলতে পারে না। এবং **'Alexandre Denoir'** নির্মিত মলিয়ারের সমাধিসৌধ সত্য সত্যই-যে তাঁর দেহাবশেষ ধারণ করে আছে, তাতে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন।*

মলিয়ার জীবনের বিচ্যুতিকে লক্ষ করেছেন, মানুষের বিকারকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং যে-সমস্ত আচরণ সর্বপ্রকার সত্যবোধকে খণ্ডিত করে তার প্রতি নিষ্ঠুর হয়েছেন। যদিও একটি বিশেষ যুগ এবং সময়ের সীমায় তিনি আবদ্ধ ছিলেন কিন্তু মানুষের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বকালের শিল্পী এবং সত্যদ্রষ্টা।

* Encyclopaedia Americana থেকে মলিয়ারের জীবনী-অংশ গ্রহণ করা হয়েছে।

নীট্‌শে

ফ্রেডারিক নীট্‌শে অভিজ্ঞতার বিচিত্র ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি শুধু নীতি ও ভাববাদী দার্শনিক ছিলেন না, দার্শনিক চিন্তাই তাঁর একমাত্র সঞ্চয় ছিল না—শিল্প. সাহিত্য, ধর্ম এবং জীবনের অন্যান্য সকল প্রকার উপলব্ধির পরিচয় তাঁর রচনায় আমরা পাই। যে-আনন্দ জীবনের আবহ ও বিস্তার এবং যে-দুঃখ জীবনের সমৃদ্ধি তার পরিপূর্ণ সঞ্চয় নিয়ে নীট্‌শে আমাদের কাছে এসেছেন। ইউরোপে শোপেনহাওয়ারের প্রভাবও এতটা বিস্তৃত ছিল না।

পৃথিবীর মানুষের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় অসম্পূর্ণ থাকত যদি নীট্‌শে তাতে কিছু না দান করতেন। সক্রেটিসের মত অনবরত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের মধ্যে তিনি জীবনের পরিচয় খুঁজেছেন। যে-যুগে তাঁর জন্ম সে যুগের চেতনায় লালিত হয়ে এবং যে-ইতিহাস তিনি জানতেন সে ইতিহাসকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে, তিনি তাঁর যুগের এবং ইতিহাসের নতুন অর্থ নির্ণয় করেছিলেন। মানব-প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা এবং সে প্রকৃতির জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সর্বপ্রকার বোধের সঞ্চরণকে জানা বর্তমানে যুগের দার্শনিকদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে নীট্‌শেব জন্য। মানুষের সত্যিকারের রূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা, তার সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক জিজ্ঞাসার প্রহেলিকাকে উন্মোচন করা নীট্‌শের সর্বপ্রধান কীর্তি। তিনি মানুষের শক্তির উৎস সন্ধান করেছেন. তাব বিগত পথযাত্রার পরিচয় নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও তার উন্নততর বিকাশের সম্ভাবনাকে জাগ্রত করেছেন। তিনি যে-ভাষায় কথা বলেছেন সে ভাষার সচলতা ও উন্মাদনাকে আজ পর্যন্ত কেউ অতিক্রম করতে পারে নি। তাঁর মধ্যে জীবনের একটি আবেগময় স্বীকৃতি ছিল। এ সম্পর্কে নীট্‌শের এক সমালোচক বলেছেন :

'And he spoke—in a rhapsodic, sometime wildly ranting voice, but with a passionate affirmation of life—of man's obligation to think and work for the future greatness of his descendants.'

নীট্শের জন্ম হয় ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে প্রুশিয়ার স্যাকসনি প্রদেশের উপকণ্ঠে রকেন-নামক একটি ছোট গ্রামে। তাঁর পিতা এবং পিতামহ উভয়েই লুথারীয় মতাবলম্বী যাজক ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সের কালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তিনি বন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেন। এর পর বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বছর পর্যন্ত দর্শনের অধ্যাপনা করেন। দুর্বল শরীরের জন্য ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি কর্ম থেকে অবসর নেন। পরবর্তী দশ বছর তিনি অনবরত লিখেছেন—কখনও জার্মানীতে থেকে, কখনও ইটালিতে। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি মানসিক রোগে আক্রান্ত হন এবং জীবন্মৃত অবস্থায় আরও এগারো বছর বেঁচে থাকেন।

জীবদ্দশায় যে-তেরটি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট দার্শনিক জিজ্ঞাসা-সংক্রান্ত গ্রন্থ ছাড়াও ইতিহাস, সমসাময়িক ইউরোপ, মানব-প্রকৃতি, সাহিত্য এবং সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিচয়সূচক বিভিন্ন গ্রন্থ রয়েছে।

নীট্শের মৃত্যু হয় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে।

'জরথুস্ত্র বললেন' নীট্শের সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সাহিত্য-কীর্তি হিসাবেও এ গ্রন্থটি অসাধারণ।

ওয়ালট হুইট্‌ম্যান

হুইট্‌ম্যানের 'Song of Myself'[১] বা 'আত্মসত্তার গান' অত্যন্ত সহজ অথচ দীপ্ত কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত। কখনও কখনও মনে হয়, এত অবিশ্বাস্যভাবে জটিলতাহীন নির্মল বক্তব্য যা প্রতিদিনকার ব্যবহৃত শব্দকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে, তাকে হয়তো কবিতা আখ্যা দেওয়া যায় না। "What is a man anyhow? What am I? What are you!" অথবা "I do not call one greater and one smaller", অথবা "These are really the thoughts of all men in all ages, they are not original with me", অথবা "I launch all men and women forward with me into the unknown"[২]—জিজ্ঞাসার অপেক্ষায় এ চরণগুলি বিশিষ্ট কোনও বক্তব্য নির্দেশ করে না কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতার বিরাট আয়োজনের মধ্যে এগুলো 'দিবস এবং গোধূলির অগ্নিকণা'—'Sparkles of day and dusk.'[৩]

হুইটম্যান ছিলেন আমেরিকার মহাকবি। জ্ঞানে, গর্বে, পদচারণে এবং প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন বিরাট এবং মহান। যে-যুগে তিনি কাব্য রচনা করেন, সে ছিলো আমেরিকার জন্য এক সঙ্কটের যুগ। সে যুগ-সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমেরিকার অন্য একজন মহৎ প্রতিনিধি আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন: "We live in the midst of alarms: anxiety beclouds the future; we expect some new disaster with each newspaper we read,"[৪] এ-সঙ্কট থেকে বাঁচতে হলে যে-আত্মপ্রতিষ্ঠা, যে-নিঃসংশয় পদক্ষেপ এবং যে-আনন্দ প্রয়োজন, আমেরিকার অধিবাসীদের জন্য হুইট্‌ম্যান সে প্রতিষ্ঠা, পদক্ষেপ এবং আনন্দ এনেছিলেন। ১৮৫৫ সালে যখন "Leaves of Grass" প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমেরিকার জনসাধারণ একটি নতুন কণ্ঠস্বর শুনলো যে-কণ্ঠস্বর শক্তির, চেতনার, ভবিষ্যতের এবং গণতন্ত্রের। কাব্যের ভূমিকায় হুইট্‌ম্যান লিখেছিলেন:

"কবি শুধু সুন্দর সুসংবদ্ধ কবিতা রচনা করেই ক্ষান্ত হবেন না; তিনি

হবেন ভবিষ্যদ্বক্তা, দূরদর্শী, চারণ ও নীতিবাদী।" অবশ্য নীতিবাদী হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি ন্যায়নিষ্ঠা এবং সাধুতার বাণী মাত্র প্রচার করবেন। তিনি নীতিবাদকে প্রশ্রয় দেবেন, 'প্রচারণা'র ক্ষেত্রে, হুইট্‌ম্যানের প্রিয় কথায়—ভবিষ্যত ও গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যে। কবির লক্ষ্য হবে দাসত্বজর্জর যারা তাদেরকে আনন্দিত করা এবং তাদেরকে শঙ্কিত করা যারা স্বেচ্ছাচারী। তিনি অধ্যাত্ম গুরুর পদও অলংকৃত করবেন। কেননা ধর্মের যুগ অতীত হয়েছে; এক্ষেত্রে কবিকেই ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। মানসিক ও দৈহিক স্বাভাবিকতায় তিনি নিজেকে পূর্ণতম মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবেন। "মানবজাতির মধ্যে মহৎ কবি সুষম মানুষ। তাঁর মধ্যে নয়, বরং তাঁর বাইরেই সকল বস্তু অদ্ভুত, উৎকেন্দ্রিক বা কাণ্ডজ্ঞানহীন। ···তিনিই বিভিন্নতার মধ্যে সমতাবিধায়ক এবং তিনিই মূল কুঞ্চিকা"। কবি তাঁর সমাজেরও প্রবক্তা। তাঁর বাণী শুধু ব্যক্তির নয়—সমগ্র জাতির। তিনি ভৌগোলিক পরিবেশ, জীবনযাত্রা, নদ-নদী ও হ্রদের নব রূপকার। বরং তার চাইতেও বেশি। "দৃশ্যমান জগতের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা উপলব্ধির মাধ্যমে" তিনি সনাতন উপকথা ও গতানুগতিক কাব্য-ধারাকে পরিমার্জিত করে "ভাবী কালের দৃঢ় ও শোভন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।" এর দ্বারা তিনি তাঁর দেশবাসীকে স্বদেশী চিন্তার মৌলিক আদর্শ, স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা এবং এমন এক ভাবজগতের সন্ধান দেন, যা সম্পূর্ণ নতুন ও অজ্ঞাত সভ্যতার ইঙ্গিত বহন করে থাকে। কবি তাঁর কবিতায় জীবনের কোনও সত্যকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু তিনি 'বাস্তববাদী' নন। তাঁর কাব্য "সর্বাতিক্রমী ও নবীন এবং তা বর্ণনাত্মক, বীর-রসাত্মক বা প্রত্যক্ষ না হয়ে হবে পরোক্ষ।" কবিতার গঠন হবে সহজাত এবং গুল্মশীর্ষে প্রস্ফুটিত অনবদ্য ও নিখুঁত গোলাপ বা লাইলাক পুষ্পের তুল্য মুক্তচ্ছন্দের অনুপ্রকাশক। হুইট্‌ম্যান ব্যবহৃত 'কবিতা, গান, বক্তৃতা বা আবৃত্তি'—বাক্যাংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ তাঁর কবিতা প্রায়শঃ গীতিধর্মিতায় অনুরণিত এবং এর মাত্রা এত অধিক যে, অনেক সময় আমরা তাঁর কবিতায় একটি বিশেষ স্বরগ্রাম বা আবৃত্তিধারার পরিচয় লাভ করে থাকি। বক্তৃতায় যে-আবেগ এবং উচ্চকিত কণ্ঠস্বরের প্রতিষ্ঠা ও অনুরণন প্রবলভাবে কাম্য, হুইট্‌ম্যানের কবিতায় তার পরিচয় আছে।

হুইট্‌ম্যানের কাব্যশৈলীতে বাইবেলের প্রভাব বিশেষভাবে স্পষ্ট। 'Song of Myself' -এর প্রারম্ভিক ছত্রগুলি এই—

"I celebrate "myself", and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.
I loafe and invite my soul,
I lean and loafe at my ease observing a spear
of summer grass."

এ অংশটিকে যদি বাইবেলের অসংখ্য শ্লোক—যেমন ৮ সংখ্যক Psalm এর সঙ্গে তুলনা করি, তা হলে আমরা হুইট্‌ম্যানের কাব্যরীতির উৎসমূলের সন্ধান লাভ করতে পারব।

"What is man, that thou art mindful of him ! And
the son of man, that thou visitest him !
For thou hast made him a little lower than the Angels,
and hast crowned him with glory and honour,
Thou madest him to have dominion over the works of thy
hands, thou hast put all things under his feet."

হুইট্‌ম্যানের কবিতায় একই শব্দের, রূপকের এবং অনুভূতির অনবরত আবর্তন একটি শ্রুতিগ্রাহ্য ছন্দঃস্পন্দ নির্মাণ করে।

হুইট্‌ম্যানের কবিতায় বর্ণনা ও পুনর্বর্ণনার একটি চক্রগত আবর্তন আছে যে-আবর্তন তাঁর কবিতায় আবেগ এবং উল্লাস সৃষ্টি করেছে। এভাবে বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তিতে বক্তব্যের সম্প্রসারণ ঘটেছে, তা পরিমার্জিত হয়েছে এবং পরবর্তী ছন্দঃস্পন্দানুক্রমের জন্য আমাদের ঔৎসুক্য বর্ধিত হয়েছে।

Leaves of Grass কাব্যগ্রন্থে আমরা কবিচিত্তের উপর দেশসত্তার প্রভাব আবিষ্কার করি। কবির মাতৃভূমি আমেরিকা কবির চিত্তে প্রেরণা এনেছে। প্রেরণায় অতীত এবং বর্তমান একই সঙ্গে উদ্বেলিত এবং জীবন ও সম্পদের ঘোষণায় আনন্দিত। আমেরিকার জনসাধারণকে কবি দেশের প্রাণশক্তি বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি মাটিকে ভালোবেসেছেন, সূর্যকে

ভালোবেসেছেন, অগণিত প্রাণী-পতঙ্গকে ভালোবেসেছেন, ঘৃণা করেছেন ঐশ্বর্যকে, দুর্বলের সহায়ক হিসেবে অগ্রসর হয়েছেন। যে-সমস্ত বস্তু তাঁর চিত্তকে অসম্মান করে তাকে তিনি অস্বীকার করেছেন। তিনি পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম এবং মানুষের অস্তিত্ব, বোধ ও জ্ঞানের সঙ্গেও।

২

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের জন্ম ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে ওয়েস্ট হিল্‌স্‌, লং আইল্যাণ্ড-এ। তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ ইংরাজ এবং ওলন্দাজ ছিলেন। হুইট্‌ম্যান যখন শিশু তখন তাঁর মাতাপিতা ব্রুকলিন শহরে বসবাস আরম্ভ করেন। এভাবে শৈশবেই একটি বৃহৎ শহর এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী গ্রামগুলির সঙ্গে হুইট্‌ম্যানের পরিচয় ঘটে। এগারো বছর বয়সে স্কুলের পাঠ শেষ হয়। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি একটি গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দ থেকে তাঁর সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয়। **Daily Brooklyn Eagle** পত্রিকাটির সম্পাদক হন। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে নিউ অরলিন্‌স্‌-এ অন্য একটি পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তিন মাসকাল নিউ অরলিন্‌স্‌-এ কাটিয়ে চাকরী ছেড়ে দিয়ে আবার ব্রুকলিনে ফিরে আসেন। এখানে সাংবাদিক এবং পুস্তক-বিক্রেতা হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে **Leaves of Grass** প্রকাশিত হয়। এমারসন কাব্যটি পাঠ করে আনন্দিত হয়ে কবিকে সম্বর্ধনা জানান, **"I greet you at the beginning of a great career."** হুইট্‌ম্যান আজীবন **Leaves of Grass**-এ নতুন নতুন কবিতা সংযোজন করেছেন, পরিমার্জনা করেছেন পূর্বতন কবিতার। এই কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই পৃথিবীকে তাঁর সম্ভাষণ।

১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে তিনি তাঁর আহত ভ্রাতার পরিচর্যার জন্য ফ্রেডরিক্‌সবুর্গ যান। এরপর তিন বছর পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন হাসপাতালে আহতদের সেবা করেন।

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী হন। তাঁর মৃত্যু হয় ২৬শে মার্চ, ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে।[৫]

৩

বিদেশে সর্বদাই হুইট্‌ম্যানকে আমেরিকার জাতীয় কবি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে—তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা-চারণ কবিরূপে আপন মাতৃভূমির বাণী প্রচার করেছেন। একটি বিশেষ অর্থে হুইট্‌ম্যান যথার্থই "তাঁর দেশের ভাবপ্রবণতার রূপকার।"

অধ্যাপক Richard Chase-এর বক্তব্য এ-ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য: "Obviously he celebrates and promulgates our material progress and our spiritual, moral and political values. But more important, Whitman is the reprensentative of his country because he and his poetry mirror in a radical if incomplete way the very contradictions of American civilization......His inner oppositions, his ambiguities, his wit, like his democratic faith, his optimism, and his belief in the self, are native to the man as they are to America. For these reasons one cherishes Walt Withman and takes him to be in a real sense the spokesman for the tendencies of his country."[৬]

৪

বাংলা ভাষার কবি নজরুল ইসলামের উপর হুইট্‌ম্যানের প্রভাব ছিলো যথেষ্ট।[৭] নজরুল ইসলাম-এর প্রসিদ্ধ কবিতা "বিদ্রোহী"-কে Walt Whitman-এর Song of Myself-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। Whitman-এর কল্পনার ব্যাপ্তি অসাধারণ, জীবন-চেতনাও অসীম পরিসরের। সেখানে ব্যক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে মানবাত্মা প্রধান হয়েছে। ব্যক্তির অস্তিত্ব সেখানে বিকাশের প্রত্যেক পর্যায়ে প্রান্তরের তৃণাঙ্কুর থেকে ঊর্ধ্ব-নীলিমার গ্রহলোক পর্যন্ত আপনাকে পরিব্যাপ্ত করে। আপন অস্তিত্বের স্বীকৃতির কথাই তিনি বলেছেন:

"I exist as I am, that is enough,
If no other in the world be aware I sit content.

And if each and all be aware I sit content.
One world is aware and by far the largest
to me, and that is myself,
And whether I come to my own to-day or in
ten thousand or ten million yeaes,
I can cheerfully take it now, or with equal
cheerfulness I can wait,
My foothold is tenon'd and mortis'd in granite,
I laugh at what you call dissolution,
And I know the amptitude of time."

নজরুলের ইসলামের 'বিদ্রোহী'তে হুইট্‌ম্যানের বক্তব্যের অনুরণন পাওয়া যায়, অবশ্য অনুভূতির শিখায় প্রজ্বলন্ত জীবনের স্বাক্ষর ততটা নেই। Whitman-এর "I am satisfied, I see, dance, laugh, sing" নজরুলের কবিতায় রূপ নিয়েছে—

"আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই
আমি মুক্ত জীবনানন্দ !"

বিলয় ও নব-অভ্যুদয়ের সম্মিলিত বিকাশের কথা Whitman-এর শব্দ সংযোজনায় যে-ভাব-ব্যঞ্জনার রূপ নিয়েছে, নজরুল ইসলামের মধ্যে একই উক্তি সহজ বিবৃতিরূপে পাই! একজনের ভাষায়, "I pass death with the dying and birth with the new-wash'd babe", অন্যজন সে কথাই বলেছেন, "আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান।"

Whitman-এর ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ সার্থক হয়েছে। তিনি সেই ক্ষেত্রের সন্ধানী যেখানে মানুষের আদিম অনুভূতি স্বপ্ন রচনা করে; সেখানে সময়, পরিবেশ ও দ্বিধাহীন জিজ্ঞাসা একই সঙ্গে নতুন সম্ভাবনায় আবর্তিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ যে-ক্ষেত্রে পরিচিত ইতিবৃত্তের সমাপ্তি দেখে, তিনি সেখানে অক্ষয় মোহনীয়তা এনেছেন। "ছায়ালোকের অন্তরাল থেকে যে-অপরিচিত আকৃতি জেগে উঠেছে, সে বিনত হয়েছে আমার

কাছে। দৃষ্টির শেষ সীমায় আমি সৃষ্টির পূর্বাহ্নের নিঃস্বতা দেখেছি। এই নিঃস্বতার মধ্যেও আমি একদিন বর্তমান ছিলাম।"

গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মানব-জীবন-সম্পর্কে অক্ষয় মমত্ববোধ ছিলো বলেই তিনি শুধু বিজয়ীর বন্দনা গান রচনা করেন নি, বিজিতও তাঁর প্রীতির অংশ পেয়েছে। তাঁর ধারণায় পরাজয়েও অপমান নেই, কেননা "battles are lost in the same spirit in which they are won," জয়ের পূর্ব-মুহূর্তের ইতিহাস থেকে স্বতন্ত্র নয়। সংগ্রামের পথে, নতুন সৃষ্টি ও আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হওয়াটাই বড় কথা, তাই—

"Vivas to those who have fail'd
And to those whose war-vessels sank in the sea
And to those themselves who sank in the sea!
And to all generals that lost engagements,
and all overcome heroes!
And numberless unknown heroes equal to
the greatest heroes known!"

এ আদর্শকে নজরুল ইসলাম গ্রহণ করেছেন "সন্ধ্যা"র একটি কবিতায়। দুর্গম পথে দুর্দমনীয় আবেগে যে-দুরন্ত পথিক অগ্রসর হলো কিন্তু জয়যুক্ত হয়ে ফিরে এলো না তাকে কবি প্রশস্তি দিচ্ছেন:

"—সেদিন নিশীথ বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা
প্রভাতে সে আর ফিরল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি'।"

Whitman-এর প্রভাব নজরুল ইসলামের উপর অত্যন্ত বেশী স্পষ্ট, দীপ্ত ও প্রত্যক্ষ। বিদ্রোহ, বিপ্লব ও যৌবনের আবেগ যেখানে তাঁর কাব্যের উপপাদ্য হয়েছে, সেখানেই তিনি Whitman-কে অনুসরণ করেছেন নিঃসঙ্কোচে। এ অনুসরণের মধ্যে গ্লানির কিছু নেই, কেননা এখানে ভাবগত একাত্মতা বোঝায়। নজরুল ইসলাম শুধুমাত্র অনুসরণই করেন নি, তিনি অনুবাদ করেছেন। "জিঞ্জীর" গ্রন্থের "অগ্র-পথিক" কবিতাটি সাধারণো

অত্যন্ত বেশী পরিচিত। অসাধারণ গতিবেগ, ছন্দের দ্রুত লয় ও সম্মিলিত-কণ্ঠোপযোগী শব্দবিন্যাসের জন্য কবিতাটি আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। সংস্কার-বিমুক্ত মন নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় চিরাচরিত নীতিকে অগ্রাহ্য করেছে, চিরদিনের উদ্‌গম ও বিকাশ দেখতে চেয়েছে। কবিতাটি Whitman-এর "Birds of Passage "গ্রন্থের "Pioneers ! O Pioneers !" কবিতাটির অনুবাদ। দু'টি কবিতা পাশাপাশি রেখে পড়লে অনুবাদের বিশিষ্টতা স্পষ্ট হবে।

ইংরেজী কবিতার প্রথম স্তবক :

"Come my tan-faced children,
Follow well in order, get your weapons ready.
Have you your pistol ? have you sharp-edged axes
Pioneers ! O Pioneers !"

বাংলা কবিতার প্রথম স্তবক :

"অগ্রপথিক হে সেনাদল
জোর কদম চল রে চল !
রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন ভাইরা মোর
বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর !
রাখ্‌ তৈয়ার হাথেলিতে হাতিয়ার জোয়ান,
হান্‌রে নিশিত পশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ !
কোথায় হাতুড়ি কোথা শাবল ?
অগ্রপাথক রে সেনাদল,
জোর কদম চল্‌রে চল !!"

ইংরেজীর অল্প পরিসরের অনেক কথা বাংলার দীর্ঘ পরিসরে স্বল্প কথায় পরিণত হয়েছে। "Come my tan-faced children" বাংলায় রূপ নিয়েছে "রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন্‌ ভাইরা মোর", "Follow well in order"-এর বাংলা হয়েছে "জোর কদম চল্‌ রে চল", "Get your weapons ready"-এর বাংলা হয়েছে "রাখ তৈয়ার হাথেলিতে হাতিয়ার জোয়ান" আর সর্বশেষ "Pioneers"-এর বাংলা "অগ্রপথিক রে সেনাদল।"

ইংরেজী কবিতার দ্বিতীয় স্তবক :

"For we cannot tarry here,
We must march, my darlings, we must bear
the brunt of danger,
We the youthful sinewy races, all the rest
on us depend,
Pioneers ! O Pioneers !"

বাংলা কবিতার দ্বিতীয় স্তবক :

"কোথায় মাণিক ভাইরা আমার সাজরে সাজ !
আর বিলম্ব সাজে না, চালাও কুচকাওয়াজ !
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ
বিপদ-বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন।
আমরা ফলাব ফুল ফসল,
অগ্রপথিক রে যুবাদল,
জোর কদম চল্ রে চল্ !!"

"We must march, my darling" বাংলায় রূপ নিয়েছে "কোথায় মাণিক ভাইরা আমার সাজ রে সাজ", "We must bear the brunt of danger" বাংলায় হয়েছে "বিপদ-বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন" এবং "We the youthful sinewy races", "আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ।"

তৃতীয় স্তবকে বিদেশী কবি প্রতীচীর যুব-শক্তির জয়গান করেছেন—তারা চঞ্চল, কর্মদক্ষ, মানুষিক গর্ব ও বন্ধুত্বের আবেগে উজ্জ্বল, সর্বজনের সম্মুখগামী অগ্রপথিক। নজরুল ইসলাম Western youthsকে "প্রাচীর তরুণে" রূপান্তরিত করেছেন, কিন্তু প্রতীচীর তরুণদের প্রতি আরোপিত বিশেষণগুলি সর্বাংশে বজায় রেখেছেন। শুধুমাত্র "মরুসঙ্কর গতি-চপল" কথাটি নজরুল ইসলামের নিজস্ব। কথাটি সুন্দর—দক্ষ শিল্পীর পরিচয় বহন করছে।

পরবর্তী স্তবকে বিদেশী কবির উক্তিতে পাই : সমস্ত প্রাচীন জাতি কি

গতিহীন স্তব্ধ হয়েছে? তারা কি তাদের শিক্ষাদানের অধিকার শেষ করেছে? ক্লান্তিতে তারা কি আজ আনতশির?—অক্ষয়ব্রতের অধিকার আমরা পেয়েছি। সে অধিকারের ভার আমাদের বহন করতে হচ্ছে,—শিক্ষাদানের অধিকারও আমাদের জন্য সত্য। নজরুল ইসলাম লিখলেন:

"স্থবির শ্রান্ত প্রাচীন জাতিরা সব
হারায়েছে আজ দীক্ষাদানের সে গৌরব
অবনত-শির গতিহীন তারা—মোরা তরুণ
বহিব সে ভার, লব শাশ্বত ব্রত দারুণ
শিখাব নতুন মন্ত্রবল।"

পঞ্চম স্তবকে Whitman শক্তিমন্ত, নবতম ও বিচিত্রতর পৃথ্বী সৃজনের যে-কথা বলেছেন, আবেগ-উজ্জ্বল সে ভাষণের অনুবাদ হয় না।

"We debouch upon a newer, mightier world, varied world, fresh and strong, the world we seize, world of labor and the march"—এর রূপান্তর ঘটেছে এভাবে:

"আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত,
গিরিগুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান
চলমান বেগে প্রাণ-উছল।"

ষষ্ঠ স্তবকে উন্নত-শীর্ষ পর্বত অতিক্রম করে, অধিত্যকা, উপত্যকা ও দিগন্ত-প্রসারী প্রান্তর পশ্চাতে রেখে পদচিহ্নহীন অপরিচিত পথে বিজয়ের ও অধিকারের স্বাক্ষর রেখে যাবার কাহিনী পাই। অগ্রগামী সে পথিককে নজরুল ইসলাম বলেছেন "অভিযান সেনা।" নজরুল ইসলাম আপন মনের গতি প্রবাহের সঙ্গে একান্ত তুলনীয় ভেবেছিলেন Whitman-এর মানবাত্মার স্পর্ধিত নিঃশঙ্ক পদচারণা। তিনি তাঁর পদচিহ্ন ধরে যৌবনের অপ্রমেয় সাধনার তূর্যবাদক হতে চেয়েছেন। অনুকরণের এ অভীপ্সার মধ্যে কবির দুর্দমনীয় জীবনাবেগের স্ফূর্তি রয়েছে। পশ্চিমের অনমনীয় যুবশক্তির

বন্দনা-গান রচনা করেছেন আমেরিকার কবি,—আর আমাদের কবি প্রাচ্যের অনিশ্চল তারুণ্যের মুক্তি-সঙ্গীত গেয়েছেন :

"আমরা এসেছি নবীন প্রাচীর নবস্রোতে
ভীম পর্বত ক্রকচ গিরির চূড়া হ'তে,
উচ্চ অধিত্যকা প্রণালিকা হইয়া পার,
আহত বাঘের পদ-চিন্ ধরি হয়েছি বার,
পাতাল ফুড়িয়া, পথ-পাগল।
অগ্রবাহিনী পথিকদল,
জোর কদম চল্ রে চল্॥"

উপরের উদ্ধৃতিতে জীবনের যে-মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ গতি রয়েছে—বস্তুর সম্পর্কে এসে যা' দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, মূল ইংরেজী কবিতায় কিন্তু তার পরিচয় নেই, Whitman যেখানে বলেছেন—"From the hunting trail we came," নজরুল ইসলামের রচনায় সেখানে রয়েছে, "আহত বাঘের পদ-চিন্ ধরি হয়েছি বার।" বাংলা উপমার মধ্যে জীবনের যে-নিঃশঙ্ক পদক্ষেপের ইঙ্গিত পাই, ইংরেজীতে তা নেই।

উভয় কবির কল্পনা, চিন্তার গতি, বাক্য-সংযোজনা ও স্পন্দনের মধ্যে কখনও কখনও অমিল দেখা যায়। কারণ এই যে, যেখানে নজরুলের বিপ্লবাত্মক ভাব-কল্পনার সঙ্গে হিন্দু দর্শন ও পুরাণের সংযোগ রয়েছে, বিদেশী কবি সেখানে যন্ত্র-যুগের শক্তিমত্তার সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজেছেন। আমাদের দেশে যে-কাহিনী দীর্ঘদিনের ইতিহাস সৃজন করে নি, তা কখনো ঐতিহাসিক চেতনার উৎস হতে পারে না। কলরব-মুখর বর্তমানের বিশৃঙ্খলার সত্য কাহিনী যদি লিখতে হয়, তবে আদিম যুগের প্রথম কোলাহলকে স্মরণে আনতে হবে। তাই যন্ত্রশক্তি আমাদের ভাষার কাব্যে মৌল উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় নি।

Whitman লিখেছেন :

"Raise the mighty mother mistress.
Waving high the delicate mistress over, all the
starry mistress
(bend your heads all).

Raise the fang'd and warlike mistress, stern,
impassive, weapon'd mistress.

Pioneers! O Pioneers!"

যন্ত্র ও পরুষ শক্তির প্রতিষ্ঠায় যেখানে হুইটম্যানের কাব্যের স্বাদ ও আনন্দ, নজরুল ইসলামের কাব্যে সেখানে পাই হিন্দু-পুরাণের ঐতিহ্যগত নির্ভরতা—

"তরুণ তাপস! নব শক্তিরে জাগায়ে তোল
করুণার নয়—ভয়ঙ্করীর দুয়ার খোল্।
নাগিনী-দশনা রণরঙ্গিণী শস্ত্রকর
তোর দেশ-মাতা, তাহারি পতাকা তুলিয়া ধর।
রক্ত-পিয়াসী অচঞ্চল
নির্মম ব্রত রে সেনাদল!
জোর কদম চল্ রে চল্।"

Whitman যেখানে ঘূর্ণ্যমান সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-তারার পরিভ্রমণ ও দিন-রাত্রির বিবর্তনের কথা বলেছেন, সেখানে নজরুল ইসলাম স্বপ্নাতুরা রাত্রির আচ্ছন্ন-প্রহরের কথা সংযোগ করেছেন। Whitman কল্পনার ব্যাপকতায় স্বপ্নময় মায়াবী রাত্রির কথা বলেছেন, নজরুল ইসলাম তাকে অধিকতর অলঙ্কৃত করে "আলো ঝলমল দিবস" ও "স্বপ্নাতুর" রাত্রিতেই তাঁর কাহিনী শেষ করেন নি—সেখানে "বন্ধুর মত ছেয়ে আছে সবে—নিকট দূর।"

টীকা

১. বর্তমান প্রবন্ধে সর্বত্র হুইটম্যানের কবিতার জন্য—"Leaves of Grass"—Hamish Hamilton, The Modern Library, 90 Great Russel Street, London, W. C. I. আমার অবলম্বন ছিলো।
২. Leaves of Grass-এর অন্তর্ভুক্ত Song of Myself কবিতাটির বিভিন্ন চরণ বা চরণাংশ।
৩. Song of Myself-এর একটি কবিতা।

৪. Carl Sandburg-কর্তৃক Leaves of Grass-এর ভূমিকায় উদ্ধৃত।
(পূর্বোক্ত)

৫. হুইটম্যানের জীবনের ঘটনাগুলি—American Poetry and Prose, Edited by Norman Foerster গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। পৃঃ ৪৯৪ (Houghton Mifflin Company, The Riverside Press Cambridge. ১৯৫২)।

৬. Richard Chase-কর্তৃক বিবৃত—(Walt Whitman by Richard Chase, Pamphlets on American Writers. Number 9, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1961) পৃঃ ১৪, ১৫, ১৬।

৭. কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে হুইটম্যানের তুলনার অংশটুকু আমার 'নজরুল ইসলাম' আলোচনা-গ্রন্থ থেকে অল্প কিছু পরিবর্তনসহ উদ্ধৃত। (নজরুল ইসলাম—সৈয়দ আলী আহসান, মখ্‌দুমী এ্যাণ্ড আহসান উল্লাহ্‌ বুক হাউস)।

হোমার

পৃথিবীর সাহিত্যে উজ্জ্বল ও দীপ্তির চিরায়ত স্বাক্ষর হিসাবে হোমারের ওডেসি এবং ইলিয়াডের তুলনা নেই। যেভাবে মানব-জীবন উক্ত মহাকাব্য দুটিতে প্রকাশিত হয়েছে, যেভাবে কবিতা শব্দের উচ্চারণে এবং উপমার প্রসারতায় সমৃদ্ধ হয়েছে এবং যেভাবে মহত্ত্ব এক নতুন নির্দেশে উচ্চকিত হয়েছে তা কাব্যের পৃথিবীতে চিরকাল বিস্ময়ের সামগ্রী হয়ে থাকবে। ম্যাথু আর্নল্ড হোমারের সৃষ্টিতে চারটি বিশেষ গুণ লক্ষ করেছিলেন, (ক) চিন্তার স্বচ্ছতা, যার ফলে কাব্যের বক্তব্যে ঋজুতা এবং সরলতা এসেছিলো; (খ) রচনাভঙ্গীর স্বচ্ছতা, যার ফলে তাঁর কবিতার শব্দ ও উপমা রূপক তীক্ষ্ণ ও নিঃসংশয় ছিলো; (গ) দ্রুততা বা দ্রুতি; এবং (ঘ) মহৎ সত্যের উজ্জীবন।[১] এ সমস্ত গুণ হোমারের কাব্যকে বিশিষ্ট করেছে; কিন্তু এ সমস্ত কিছু অতিক্রম করে হোমারের একটি নিজস্ব তাপ আছে যা একান্তভাবে তাঁরই। তাঁর ভাষায় এবং বর্ণনায় একটি 'তুলনাহীন অগ্নিদাহন'[২] এবং অসম্ভব উৎসাহ আছে। তাঁর কাব্যে জীবনের একটি উৎসাহিত, প্রাণবন্ত এবং অগ্নিতাপিত চেতনা আছে।

সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতকের শেষ অথবা সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসি' রচিত হয়েছিলো।[৩] উভয় কাব্যের শিল্প-গত সুষমা এবং বর্ণিত বিষয়ের যুক্তি-নির্ভর গতি এবং ঐক্য প্রমাণ করে যে, যখনই রচিত হয়ে থাকুক না কেন, ইতিহাস-পূর্ব যুগের অন্যান্য মহাকাহিনীর সঙ্গে এ-গুলোর কোনও তুলনা হয় না। অন্যান্য কাহিনীতে একক শিল্পীর স্বাক্ষর নেই এবং অলিখিত ও শুধুমাত্র জনতার সম্মুখে উচ্চারিত শব্দ-সম্ভারের শ্লথ বিন্যাস আছে, কিন্তু পৃথিবীর কাব্যে হোমারই প্রথম কবি যিনি জীবন-সচেতন ছিলেন, যিনি সংগ্রাম ও সাধনার রহস্য নির্ণয় করেছিলেন এবং একটি বিপুলায়তন অধিকার নিয়ে মানুষের ভাগ্যের পরিমাপ করেছিলেন।[৪]

হোমার-সম্পর্কে আরিস্টটল যে-আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন সে আলোচনা থেকে নির্দেশ নিয়ে 'ইলিয়াড' এবং 'ওডেসির' স্বরূপ নির্ধারণ করা

যায়। আমার বর্তমান আলোচনায় প্রথমাংশে ব্যাখ্যাসহ আরিস্টটলের কয়েকটি উক্তি দেওয়া হল।

১. পদবন্ধে গম্ভীর দীর্ঘ বিষয়ের অনুকরণরূপে মহাকাব্য ট্রাজেডির ধারাকেই অনুসরণ করেছে; কিন্তু অবিমিশ্র ছন্দ এবং বর্ণনা-ব্যাপ্তিতে মহাকাব্যে ব্যতিক্রম এসেছে। অধিকন্তু উভয়ের পরিসরের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় ট্রাজেডিতে কাহিনী-সংঘটন একটি দিবালোকের পরিধির মধ্যে, মহাকাব্যে সময় এবং কাহিনী বিস্তারেব কোনও সীমাবন্ধন নেই। উভয় প্রকৃতির শিল্পে কোনও কোনও বিষয়ে আঙ্গিকগত সমান্তরালতা আছে। আবার ট্রাজেডির মধ্যে একান্ত বিষয়ভঙ্গীও কিছু আছে যা মহাকাব্যে নেই। সুতরাং যে-কেউ ট্রাজেডির ভালো ও মন্দ উভয় দিক-সম্বন্ধে অবহিত হবেন, মহাকাব্য-সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান স্পষ্ট হবে। মহাকাব্যে প্রধান প্রধান যে-সমস্ত অংশ আমরা পাই, ট্রাজেডিতেও তা আছে, কিন্তু ট্রাজেডির সমস্ত কৌশল এবং বিশিষ্টতা মহাকাব্যে বর্তমান নেই।'[৫]

আরিস্টটল ট্রাজেডি-সম্পর্কে যত কথা লিখেছেন, মহাকাব্য-সম্পর্কে লিখেছেন তার চেয়ে অনেক কম। তাঁর ধারণায় প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতিতে শিল্পের অনুক্রমণের ধারায় ট্রাজেডি মহাকাব্যের অগ্রবর্তী।[৬] তা ছাড়া উন্নততর শিল্প-বিন্যাসে উভয় শিল্পের মধ্যে ট্রাজেডি পূর্ণকাম এবং সম্পূর্ণ।

আরিস্টটলের মতে মহাকাব্য ও ট্রাজেডির মধ্যে সমান্তরালতা আছে চারটি ক্ষেত্রে: "(১) ছন্দের বন্ধনে, (২) একটি দীর্ঘ পরিসরে, (৩) অনুকৃতিতে, (৪) মূল্যবান বিষয়সম্ভারে।" পার্থক্য আবার সৃজিত হচ্ছে এইভাবে যে, মহাকাব্যে (১) ছন্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ভিন্নভাবে; (২) মহাকাব্য অনুকরণ বটে, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির; মহাকাব্যের দৈর্ঘ্যের ভিন্ন রীতি ও বিধান রয়েছে।

মহাকাব্য একটি সম্পূর্ণ কাহিনীর পরিচয় বহন করে যার মধ্য থেকে মূল ঘটনারেখার চিত্র উন্মোচিত হয়। সে কারণে মূল ঘটনার সমৃদ্ধি অথবা দুর্বলতা বিচার করে মহাকাব্যকে বিশ্লেষণ করা চলে না। সম্পূর্ণ উপাখ্যানের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড ঘটনাকে বিন্যাসের কৌশলে একটি ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ পরস্পর-সংলগ্ন রূপাভিব্যক্তি রূপেই মহাকাব্যের বিশ্লেষণ সম্ভবপর।

২. "যে অনুকৃত শিল্প বর্ণনামূলক এবং ছন্দে রচিত তার সংগঠনরূপে

ট্রাজেডির নির্মাণ-কৌশল অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ একটি একক কেন্দ্রায় ঘটনাকে আবর্তিত করে তা গতি পাবে ; যে-ঘটনা সম্পূর্ণ এবং পূর্ণাবয়ব এবং যার আরম্ভ আছে, মধ্যযাম আছে, শেষ আছে—যেন তা একটি অনন্য সম্পূর্ণ সৃষ্টির মত সকলকে আনন্দিত করতে পারে। মহাকাব্য ইতিহাসের মত রচিত হবে না, যেখানে অবধারিত রূপে একটি ঘটনার বিবরণ থাকে—একটি কর্মের বা আবেগের নয় কিন্তু একটি বিশেষ সময়কালের, যেখানে ঘটনাগুলি একটি মানুষ কিংবা অনেক মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে এবং প্রত্যেক ঘটনা অন্য অনেক ঘটনার সঙ্গে শুধুমাত্র ক্ষীণ ঐতিহাসিক সম্পর্কে বিজড়িত থাকে।[৭]

আরিস্টটল যে-প্রকৃতির মহাকাব্যের কথা ভেবেছেন সে মহাকাব্য ছন্দোবদ্ধ ইতিহাস নয়। অধিকাংশ মহাকাব্যে একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে একটি মানুষ বা অনেক মানুষের জীবনে কি ঘটলো তার বর্ণনা থাকে। তাতে আরম্ভ, মধ্যযাম এবং শেষ নিয়ে সম্মিলিত কর্মধারার যে-একক সত্তা তার পরিচয় থাকে না। অর্থাৎ তারা বিশেষকে দেয় কিন্তু নির্বিশেষকে উপস্থিত করে না। আরিস্টটল সেজন্য বলতে চান যে, মহাকাব্য তার গঠনপ্রকৃতিতে ট্রাজেডিকে অনুসরণ করবে, কিন্তু ইতিহাসকে নয়। মহাকাব্য ছন্দের সুসজ্জিত বর্ণনা হবে না অথবা গদ্য-উপাখ্যানও হবে না। মহাকাব্য হবে কাব্যভাবে বিপুল কর্মসমবায়ের একটি সম্পূর্ণ রসাবেশ। আরিস্টটল তার আলোচনায় মহাকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নি, কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যে তিনি কি আশা করেন তাই বলেছেন। আরিস্টটল মূলতঃ হোমারের মহাকাব্যগুলির উপর নির্ভর করে এ কথাগুলো বলেছিলেন, তাই হোমারের কাব্যে যে-সমস্ত মহৎ গুণ আছে তাকেই তিনি মহাকাব্যের প্রধান গুণ বলে বর্ণনা করেছেন। হোমারের কাব্যে নাটকীয় গুণ প্রচণ্ড, তাই হোমারের মধ্যে ট্রাজেডির কুশল-বিন্যাস আবিষ্কার করে আরিস্টটল আনন্দিত হয়েছেন। মহাকাব্যের নিজস্ব ধর্ম কি তা তিনি আবিষ্কার করতে চান নি। তিনি ট্রাজেডির সত্তায় মহাকাব্যকে আবিষ্কার করেছিলেন। নাটকের গঠন-প্রকৃতিতে সময় এবং ঘটনার যে-নির্মাণ-কৌশল আছে, হোমারের মহাকাব্যে তা আবিষ্কার করা যায়।

আরিস্টটল মহাকাব্য ও ইতিহাসের আলোচনায় সময়ের একটি নতুন

বোধকে বিজ্ঞাপিত করেছেন। কবি অনুকরণ করেন একটি একক ঘটনার, অর্থাৎ যে-ঘটনায় সমস্ত বক্তব্যের একটি একক তাৎপর্য থাকে। কিন্তু ঐতিহাসিক একটি একক সময়ের সংবাদ পরিবেশন করেন। এই কথা দুইটির মধ্যে একটি বিরোধাভাস আছে। সমস্ত কর্মই তো সময়ের মধ্যে সংঘটিত। তা হলে সময় এবং কর্মকে পৃথক করা যায় কি করে? এর সহজ উত্তর হচ্ছে যে, যে-কর্ম বা আবেগ সর্বকালের তা সর্বদাই সময়-অতিক্রান্ত। সুতরাং কবি যখন সর্বকালের জন্য গ্রাহ্য কোনও ঘটনাকে উন্মোচিত করেন তখন কোনও বিশেষ সময়ের পরিসরে তাকে বিধৃত রাখেন না; মনে হয় তা যেন সময়-অননুভূত একটি সত্তার স্মারক। তা হলে আমরা বলতে পারি, সর্বকালের জন্য গ্রাহ্য যে-ঘটনা এবং ইতিহাসের সময় এরা একে অন্যের বিপরীত। একটিতে আমরা পাই জীবনের প্রয়োজন এবং সত্য, অন্যটিতে আমরা পাই ঐতিহাসিক তথ্যের আকস্মিকতা। আকস্মিকতা এই অর্থে যে, ইতিহাসে কোনও ঘটনা মানবচিত্তের বেদনা, অভীপ্সা এবং আনন্দের উপর গড়ে ওঠে না। সময়ের দ্রুতগতির মধ্যে তা কতকগুলি রেখামাত্র।

সময় এবং ঘটনা-সম্পর্কে আরিস্টটলের বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়। কেননা, যাকে আমরা সময়-অতিক্রান্ত বলি সময়ের সঙ্গে তারও সম্পর্ক আছে। তা ছাড়া ট্রাজেডি-সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে আরিস্টটল সময়ের ঐক্য-তত্ত্ব বা Unity of time-এর কথাও বলেছেন। সেখানে সময়ের একটি সংজ্ঞা আছে, সেটা হল নাটকের উদ্‌ঘাটিত এবং পরিদৃশ্যমান কর্মের কালগত বিস্তার। তা হলে দেখা যায়, আরিস্টটলের কাছে সময়ের উভয় ব্যঞ্জনাই মূল্যবান ছিলো। রসাবেশের ক্ষেত্রে যে-বস্তু লোকোত্তীর্ণ কোনও বিশেষ সময়ের পরিসরে তা আবদ্ধ নয়। কিন্তু সে বস্তু সংঘটনের কোনও না কোনও কালনির্দেশ থাকবেই। অর্থাৎ কর্মসংঘটনের একটি সময়ক্ষেপণ আছে আবার কর্মের সময়বন্ধনও আছে। ইতিহাসে আমরা কর্মের সময়বন্ধনকে পাই, তাই ইতিহাস লোকোত্তীর্ণ ও সর্বজনীন নয়।[৮]

৩. "ট্রাজেডি এবং মহাকাব্য একই শ্রেণীর হবে (শ্রেণীর অর্থ Species বা প্রজাতি)। উভয় শিল্পই হয় সরল হবে অথবা জটিল হবে এবং মহাকাব্যের বিভিন্ন অংশ নীতিসম্মত হবে অথবা দুর্ভাগ্যসূচক হবে।

ট্রাজেডির সঙ্গীত এবং দৃশ্যমানতার কথা বাদ দিলে তার অন্যান্য যে-অংশ আছে তা মহাকাব্যের অনুরূপ। মহাকাব্যের চিন্তা এবং শব্দের উচ্চারণ তৃপ্তিজনক হবে। হোমার এ সমস্ত কৌশল ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুধু-যে প্রথম ছিলেন তাই নয়, তিনিই সর্বপ্রথম এগুলিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর দু'টি কাব্যের নির্মাণকৌশল-সম্পর্কে বলা যায় যে, ইলিয়াড হলো সরল কিন্তু আবেগে দুর্ভাগ্যসূচক বা fatal এবং ওডেসি নীতিপূর্ণ। এ উভয়কাব্যের ক্ষেত্রে হোমার তাঁর পূর্ববর্তী সকলকে শব্দে এবং চিন্তায় অতিক্রম করেছেন।"[৯]

ইংরেজীতে structure ও outcome দু'টি কথা আছে। আমাদের আলোচনায় যার অনুবাদ হবে গঠনপ্রকৃতি এবং ভাবপরিমাণ। আরিস্টটল যখন মহাকাব্য বা ট্রাজেডিকে সরল বা জটিল বলেন তখন তিনি গঠনপ্রকৃতির কথা বলেন, কিন্তু যখন তাকে নীতিপূর্ণ বা দুর্ভাগ্যসূচক বলেন তখন তিনি বাক্যটির ভাব-পরিণাম সম্পর্কে মন্তব্য করেন। তা ছাড়া কোনও একটি মহাকাব্য একক-রূপে শুধু-যে সরল বা জটিল, নীতিপূর্ণ অথবা দুর্ভাগ্যসূচক হবে তার কোনও অর্থ নেই। একই কাব্যে সরল ঘটনা-নির্দেশের সঙ্গে জটিলতার অনুপ্রবেশ অসম্ভব নয়। আবার নীতি উচ্চারণের সঙ্গে দুর্ভাগ্যের সূচনাও অসম্ভব নয়।

মহাকাব্যের বিভিন্ন অংশ বলতে আরিস্টটল বুঝেছেন প্লট বা ভাব-সঞ্চয় এবং ছন্দোবদ্ধ রচনা। হোমারের কাব্যে পূর্ণতর রূপে সমস্ত অংশের উপযুক্ত ব্যবহার, বিস্তার এবং উৎসাহিত বিকাশের পরিচয় আছে।

৪. "কবিতার দৈর্ঘ্য এবং ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মহাকাব্য ট্রাজেডি থেকে ব্যতিক্রম। আরম্ভ এবং শেষ সেখানে একই সঙ্গে উদ্ভাসিত হয়। সেখানে পরিসরের দৈর্ঘ্য মাপা সম্ভবপর কিন্তু মহাকাব্য আপন দীর্ঘতাকে আরও বিলম্বিত করতে পারে। ট্রাজেডিতে অনেক কয়টি ঘটনার অনুকরণ চলে না, কেননা মঞ্চে দৃশ্যমান রূপের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির একাধিক ঘটনা সংস্থানের সুযোগ নেই, কিন্তু মহাকাব্য বর্ণনামূলক বলেই একই সময়ের উৎসে বিভিন্ন ঘটনার নির্মাণ সম্ভবপর।"[১০]

হোমারের কাব্যের দীর্ঘ প্রসারকে আরিস্টটল মেনে নিয়েছেন। যেহেতু হোমারের কাব্য বর্ণনামূলক তাই সেখানে মূল ঘটনার সঙ্গে বিভিন্ন

উপকাহিনী সহজেই বিজড়িত হতে পেরেছে। কেন্দ্রীয় ঘটনার সঙ্গে গৌণ রূপে অথবা হয়তো প্রবলরূপে অনেক উপকাহিনীর সংযোজন ঘটেছে যা ব্যাপ্তি দিয়েছে ঘটনার আরম্ভ ও শেষের কালাতিক্রমকে। হোমারের কাব্যের দীর্ঘ প্রসারকে মেনে নিলেও আরিস্টটল মূলতঃ মহাকাব্যের সময়ক্ষেপণকে ট্রাজেডির ট্রিলজি বা ত্রয়ীর সমপরিমাপের বলে নির্দেশ করেছেন। দৃশ্যমান রূপে মঞ্চে উপস্থাপিত এবং এককালীন শ্রবণের জন্য নির্দিষ্ট ট্রিলজির তিনটি অংশের যে-সম্পর্কিত দৈর্ঘ্য আরিস্টটলের মতে মহাকাব্যের জন্য তাই হচ্ছে যথোপযুক্ত প্রসার। তিনটি ট্রাজেডিতে মোট ৪২টি চরণ থাকে যা ৫ থেকে ৭ ঘন্টার মধ্যে মঞ্চে উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।[১১] যদি হোমারের 'ইলিয়াড' বা 'ওডেসি' থেকে সমস্ত শাখা এবং উপকাহিনীকে অপসারিত করে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কাহিনীকে বিদ্যমান রাখা যায় তা হলে কাব্য দু'টির চরণ-সংখ্যা দাঁড়ায় গড়ে ৪ হাজার।[১২] মহাকাব্যের নিজস্ব একটি অতিরিক্ত প্রসার-ক্ষমতা আছে। ট্রিলজির প্রসারগত সীমাবন্ধনকে আদর্শ বলে স্বীকার করেও মহাকাব্য নতুন উপাখ্যান সংযোজন করে একই সঙ্গে কাব্যের গুণগত এবং পরিমাণগত বিস্তার ঘটাতে পারে।

মহাকাব্যে একই কালে বিভিন্ন ঘটনা বা কর্মের নির্বাহ ঘটতে পারে। কিন্তু ট্রাজেডিতে একটি বিশেষ সময়ে সংঘটিত একটি একক ঘটনারই অনুকৃতি পরিদৃশ্যমান হবে।[১৩] এ উক্তি সব সময়ের জন্য যথার্থ নয়, কেননা ট্রাজেডিতে মঞ্চে দৃশ্যমান ঘটনার বাইরের অনেক ঘটনা সংবাদ হিসেবে পরিবেশিত হয় এবং নাটকের গতি নির্ধারণের জন্য তার প্রয়োজন নিতান্ত কম নয়।

৫. "হোমার আমাদের প্রশংসা পাবার যোগ্য অনেক কারণে, কিন্তু বিশেষ করে এ কারণে যে, তিনি যথাযোগ্য ভাবে জানতেন তিনি কি লিখছেন এবং সে রচনার প্রকৃতিই বা কি। কবির নিজস্ব উক্তি কাব্যে খুবই কম থাকবে। মনে রাখতে হবে আত্মনিবেদনের দক্ষতা দ্বারা কারো কাব্য-কুশলতা প্রমাণিত হয় না। অন্যান্য সকলে যে-ক্ষেত্রে কোন মঞ্চে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ আপনাদের কথাই বলেন, হোমার সেক্ষেত্রে ভূমিকা স্বরূপ অতি অল্প শব্দ উচ্চারণ করে মঞ্চে কোনও পুরুষ বা রমণী বা অন্য কোনও চরিত্রকে উপস্থিত করেন। যারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।"[১৪]

আরিস্টটল প্রশংসা করেছেন হোমারের নাটকীয় কৌশলকে। তিনি

লিখেছেন যে, হোমারের কাব্যে বর্ণনাবৃত্তি অতিরিক্ত নেই, বরঞ্চ, পরিমিত এবং সংক্ষিপ্ত। এবং তাঁর মতে শুধু এই বিরল বর্ণনাবৃত্তির কারণেই হোমার একজন প্রধান কবি। হোমারের কাব্যে নাটকীয় আত্মনিরপেক্ষ সংলাপ[১৫] অত্যন্ত প্রবল এবং দীপ্ত। হোমার সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনায় বর্ণনার প্রয়োগ করেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন চরিত্র আপন আপন রূপসজ্জায় মঞ্চে[১৬] উপস্থিত হয় এবং সংলাপের মাধ্যমে কাহিনীকে ধারণ করে।

টীকা

১. Matthew Arnold : On Translating Homer—অক্সফোর্ডে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতা (১৮৬১); On Translating Homer : Last Words (১৮৬২)।

২. মন্তব্যটি কবি পোপের। তাঁর অনূদিত ইলিয়াডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। যে-কোনও সংস্করণেই পাওয়া যাবে। আমি এখানে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছি।

৩. The Homeric Question : J. A. Davidson (A Companion to Homer edited by Wall and Stubbings, Macmillan, London 1963, পৃষ্ঠা ২৫৯।

৪. হোমারের কাব্যের যৌক্তিক-বিন্যাস এবং শিল্প-সচেতনতা, অট্টালিকা-সদৃশ নির্মাণ-কৌশল বর্তমান কালে আর পরীক্ষার বিষয় নেই। এখন তা সর্ব-স্বীকৃত। এ সম্পর্কে যে-সমস্ত গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, The Unity of Homer : J. A. Scott, ১৯২১ এবং The Pattern of the Iliad : J. T. Sheppard ১৯২২।

৫. Gerald F. Else : Aristotle Poetics ; Leiden (E. J. Bill), 1957, পৃষ্ঠা ২০৩, উদ্ধৃতি 4969.

৬. অগ্রবর্তী অর্থবিশিষ্ট এবং অধিকতর মূল্যবান, ইতিবৃত্তের ধারায় পূর্ববর্তী নয়।

৭. Gerald F. Else : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬৯।

৮. উক্ত গ্রন্থের ৫৭৫ পৃষ্ঠায় লেখক আরিস্টটলের 'সময়ের' সংজ্ঞা নিয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি আরিস্টটলের ব্যবহৃত বিভিন্ন গ্রীক শব্দের তাৎপর্য পরীক্ষা করে ভাষাতত্ত্বের পরিধিতে একটি আলোচনা উপস্থিত করেছেন যা অত্যন্ত মূল্যবান।

৯. **Gerald F. Else** : পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা, ৫৪৯।

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬০১—৬০২। প্রদর্শিত অনুবাদটি মূলানুগ কিন্তু সংক্ষিপ্ত।

১১. পূর্বোক্ত, ৬০৩।

১২. **Alfred Gudeman** ; আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের আলোকে 'ওডেসি'র মূলকাহিনী এবং আনুষঙ্গিক শাখাগুলো পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬০৩)।

১৩. **Samuel H. Busher**-এর মন্তব্য (**Aristotle : Theory of Poetry and Fine Art, London, 1932**)।

১৪. **Gerald F. Else** : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১৯—৬২০, আরিস্টটলের উদ্ধৃতি সংখ্যা $60a^{5}$—11.।

১৫. অর্থাৎ সেখানে কবির নিজস্ব বক্তব্য বেশী নেই এবং যেখানে আছে সেখানে তা উপাখ্যানের গতি, নির্মিতি এবং নাটকীয় উপস্থাপনার সঙ্গে সংযোজিত।

১৬. দৃশ্যমান নাট্যাভিনয়ের 'মঞ্চ' অর্থে নয়। কিন্তু মঞ্চে যেমন বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ ছাড়া নাট্যকারের বস্তু-নির্ভর বর্ণনার সুযোগ নেই, হোমারের কাব্যেও তেমনি নাটকীয় সংলাপের প্রতিষ্ঠা অতিরিক্ত।